মাসুদ রানা

জন্মভূমি

কাজী আনোয়ার হোসেন

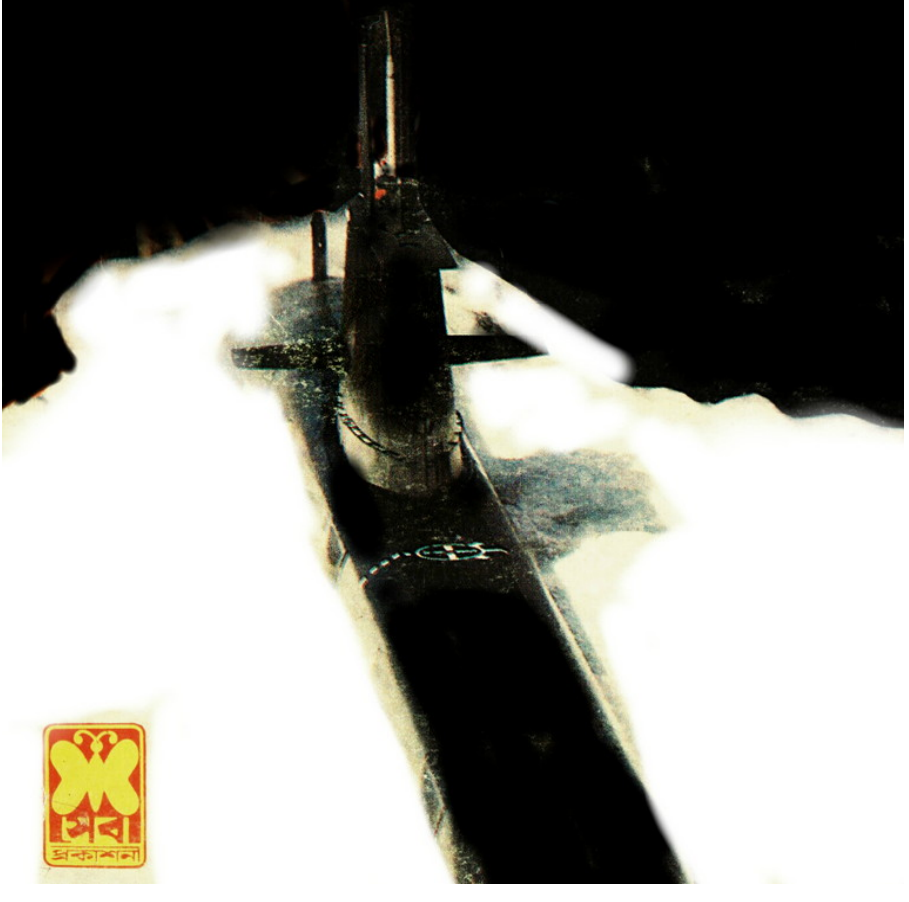

সেবা প্রকাশনী

জন্মভূমি

হঠাৎ রানার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, বুঝতে পারল সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা করে বসেছে। গুলি খেয়ে তারা আহত হয়নি, দু'জনের কারও বুক থেকেই রক্ত বেরুচ্ছে না—বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে। দু'জনের হাতেই এখন বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

জন্মভূমি

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7624-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮ ১৯০২০৩

Masud Rana

JANMOBHOOMI
Two Thriller novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একান্ন টাকা

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

জন্মভূমি

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯

এক

গায়ে ঘাসরঙা শাড়ি পেঁচিয়ে সরু পাহাড়ী ঢালটা যেন চিরযৌবনা বধূর সাজে সেজেছে; বিচিত্র বর্ণ আর নকশায় সমৃদ্ধ ঝাউ, দেবদারু, মেহগনি ইত্যাদির সারিগুলো তার গলায় জড়ানো সাতনরী হার, প্রকাণ্ড এক নীল-কান্তমণির মত সেই হারের লকেট হলো হর্সশূ লেক। ঘোড়ার খুর আকৃতির জলাশয় নীল পারদের মত ঝলমলে। সবুজবসনার ভাঁজে ভাঁজে বুঝি বা রঙ ঢেলে দেয়া হয়েছে—লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ; যেন এক পশলা পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসেছে মৌমাছি আর প্রজাপতিরা, সোনালি রোদ লাগা রঙিন ডানায় অস্থির চঞ্চলতা, বাতাসে তারই অস্পষ্ট গুঞ্জন। দীর্ঘ ও সুরেলা কুহুতান প্রবাসী বসন্তকেই ডাক দিয়ে যাচ্ছে। সময়টা নির্জন বিকেল। ঢালটার নিচে ভাঙা ও পরিত্যক্ত একটা মন্দির। মন্দিরের খোলা চত্বর থেকে লেকের দিকে নেমে গেছে কয়েকটা ধাপ, তারই একটায় পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর স্পাই মাসুদ রানা।

লেকের নিরিবিলি পাড় ধরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি আর নির্মল বায়ু সেবনই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রকৃতির ঘোমটা খোলার ঘটনাটা মনের চোখে ধরা পড়ে যাওয়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে অবশ একটা ভাব চলে এসেছে শরীরে, বসার পর আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

সাপ্তাহিক ছুটির দুটো দিন বন্দর নগরী চট্টগ্রাম আর কক্সবাজারে ভালই কাটল। আধুনিক একজন মানুষের জীবন কঠিন সমস্যা আর জটিল ঝামেলার সমষ্টি, মাঝে মধ্যে সব পিছনে ফেলে পালিয়ে আসতে না পারলে স্রেফ স্নায়বিক চাপেই মরে যেতে হবে। রানার ভেতর একজন নিঃসঙ্গ পুরুষ বাস করে, সুযোগ পেলে একা থাকতেই পছন্দ করে সে, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে দারুণ এক রোমান্টিকতা খুঁজে পায়। সেই নেশাতেই কাউকে কিছু না জানিয়ে বৃহস্পতিবার অফিস করে ঢাকা ছেড়েছিল। আজ শনিবার, রাতের প্লেনে আবার ফিরে যাবে। চট্টগ্রাম আর কক্সবাজারে বন্ধু-বান্ধব অনেকেই আছে, তবে কারও সঙ্গেই এবার দেখা করেনি ও; সেজন্যে মনে খানিকটা খুঁতখুঁতে ভাবও উঁকি দিচ্ছে। তবে নিজেকে সঙ্গ দেয়ার আর বঞ্চিত না করার উদ্দেশ্যটা পূরণ হয়েছে, ফেরার পথে তাই মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠল।

গাড়িটা অনেক দূরে, সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেটে রেখে এসেছে

রানা; হেঁটে গাড়ির কাছে পৌঁছুতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, টিকেট কাটাই আছে, সাড়ে দশটার ফ্লাইট ধরার জন্যে দশটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছুলেই চলবে। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে, কাজেই হোটেলে ফিরে প্রথম কাজ শাওয়ারের নিচে দাঁড়ানো। রাতের খাওয়াও সেরে নেবে, ঢাকায় নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেই যাতে ঘুমোবার জন্যে বিছানায় উঠতে পারে। কাল থেকে আবার শুরু হবে দশটা-পাঁচটা অফিস। টপ সিক্রেট ফাইলে চোখ বুলানো, রিপোর্ট লেখা, মীটিঙে বসা, ভুলভাল হলে বসের ধমক খাওয়া, কাজ ভাগাভাগি নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক—সেই পুরানো রুটিন ধরেই চলবে সব, অথচ একঘেয়ে লাগবে না। ভ্রমণ আসলে জাদুর মত কাজ করে, ফেরার পর সব কিছু নতুন লাগে, আগ্রহ আর উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি হওয়ায় কাজ হয়ে ওঠে মজার কোন খেলা।

আকাশে চাঁদ নেই। বনভূমির ভেতর নির্জন রাস্তা। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, ইচ্ছে করেই স্পীড বাড়াচ্ছে না। শহরে ঢোকার মুখে আবার সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা উঁকি দিল মনে। বিশেষ করে চট্টগ্রামে তো দেখা করার মত অনেক বন্ধুই আছে। অন্তত দু'একজনের সঙ্গে···না, থাক, এখন আর সময় নেই।

এক মিনিট পর নিজেকেই রানা প্রশ্ন করল, সোজা রাস্তা ছেড়ে ঘুরপথ ধরে হোটেলে ফিরছি কেন? আপনমনে হাসছে ও। একটা পাহাড়কে ঘিরে থাকা রাস্তা ধরে খানিক দূর এসে বাঁক নিল ডান দিকে, বামে পড়ল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা বড় একটা মাঠ। মাঠ নয়, লন বলা উচিত, মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে, মিশেছে ঝুলন্ত ছাদ দিয়ে ঢাকা বিশাল এক গাড়ি-বারান্দায়। তিনতলা বিল্ডিংটা লনের ঠিক মাঝখানে, ব্রিটিশ আমলের তৈরি, লাল রঙ করা। লনে একজোড়া ফ্লাডলাইট বসানো আছে, ওগুলোর আলোয় সারারাত উদ্ভাসিত হয়ে থাকে বিল্ডিঙের সম্মুখভাগ। কপালে নীল নিওন সাইন—'চিটাগং ইনভেস্টর'স ক্লাব'।

পুঁজি বিনিয়োগকারী, অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের ক্লাব ওটা, ব্যবসায়ী নয় এমন কাউকে ক্লাবের সদস্যপদ দেয়া হয় না। বড় মাপের ব্যবসায়ীদের যে-কোন ক্লাব বা সমিতিতেই ঋণখেলাপি আর স্মাগলারদের আসা-যাওয়া আছে। কথাটা 'চিটাগং ইনভেস্টর'স ক্লাব' সম্পর্কেও সত্যি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর 'বিপজ্জনক' শিরোনামে একটা তালিকায় বিভিন্ন সংগঠনের নাম আছে, তার মধ্যে চিটাগং ইনভেস্টর'স ক্লাব তিন নম্বরে। এর কারণ হলো, চট্টগ্রামের অনেক ব্যবসায়ীই হয় সরাসরি, নয়তো পরোক্ষভাবে আর্মস ও ড্রাগস চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। তারা বেশিরভাগই মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের সমর্থক, ক্যাডারদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাপ্লাই দেয় এই আর্মস আর ড্রাগস। 'বিপজ্জনক' তালিকায় যতগুলো সংগঠন আছে, ভুয়া কাগজ-পত্র জমা দিয়ে প্রায় সবগুলোরই সদস্য হয়েছে রানা। চট্টগ্রামে যখনই আসে, ইনভেস্টর'স ক্লাবের পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনতে ভোলে না। তবে গত দ'বছরে চার-পাঁচবার এলেও, একবারও ক্লাবটায় ঢোকেনি ও।

কারণটা হলো, বিসিআই-এর আরেকজন এজেন্ট এখানকার সদস্য, হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ অনুসারে সে-ই ক্লাবটার ওপর নজর রাখে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ী ছাড়াও বাছাই করা কিছু মেয়েকে পরিচয়-পত্র দেয়, বেশিরভাগই তারা উঁচুদরের কলগার্ল, নয়তো সোসাইটি গার্ল; তবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গিনী বা স্ত্রীরাও এই পরিচয়-পত্র পাবার অধিকার রাখে। বিসিআই এজেন্ট শায়লা শারমিন সোসাইটি গার্ল হিসেবেই নিয়মিত আসা-যাওয়া করে এখানে। ক্লাবের সদস্যরা প্রায় সবাই তাকে চেনে।

কাঁটাতারের বেড়ায় একটা গেট আছে, সেটাকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। গেটে ইউনিফর্ম পরা গার্ড দু'জনকে খুব আড়ষ্ট দেখাল। গার্ডদের সঙ্গে রয়েছে নীল স্যুট পরা পাঁচ-সাতজন লোক, সবাই খুব সুদর্শন আর লম্বা-চওড়া, নড়াচড়ায় অতি স্মার্ট একটা সতর্ক ভাব। এদেরকে ঠিক দেশী লোকজন বলে মনে হলো না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে, যেন কেউ আসবে।

কাঁটাতারের বেড়া বলেই গেটটাকে পিছনে ফেলে আসার পরও লাল ক্লাব বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছে রানা। দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল না কি ঘটছে, তবে গাড়ি-বারান্দায় একটা জটলা মত দেখা গেল। ওখানে লোকজন আছে, কিন্তু একটাও গাড়ি নেই; তবে বিশ-পঁচিশটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লনে। লনে কেন?

কোন ভিআইপি আসছেন? তবে রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী নন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই পুলিস থাকত। বিদেশী কোন বিনিয়োগকারী? বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং, ট্যুরিস্ট রিসর্ট, ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি, গ্যাস ফিল্ড, রেলওয়ে ইত্যাদি অনেক কিছুই বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, এ-সব প্রজেক্টে পুঁজি খাটাতে বিদেশী উদ্যোক্তরাও তো দলে দলে বাংলাদেশে আসছেন। হয়তো তাদের কাউকেই অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন চলছে, ক্লাব প্রাঙ্গণে খানিকটা উত্তেজনা সৃষ্টি হবার সেটাই কারণ। কিন্তু গেটে স্যুট পরা ওই লোকগুলো? কোন লোকের স্যুটের নিচে শোল্ডার-হোলস্টার থাকলে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি সামান্য হলেও বদলে যায়—বাম হাত শরীর থেকে খানিকটা দূরে থাকবে। প্রথমবার চোখ বুলিয়েই রানার সন্দেহ হয়েছে লোকগুলো সশস্ত্র।

একটু দেখা দরকার না? শারমিন ওখানে থাকলে মনের খুঁতখুঁতে ভাবটাও দূর হয়। আর তাছাড়া, প্রবাদ যখন আছেই যে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে···

ফাঁকা রাস্তা, গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা।

রানার টয়োটা স্টারলেটকে ফিরে আসতে দেখে স্যুট পরা লোকগুলো গেটের সামনে এক সারিতে দাঁড়িয়ে পাঁচিল তৈরি করল। বাধ্য হয়ে থামতে হলো রানাকে। লোকগুলো ঘিরে ফেলল গাড়িটাকে, একজন চলে এল জানালার পাশে। বোতাম চাপ দিয়ে জানালার কাচ নামাল রানা, লোকটা ঝুঁকে ওর দিকে তাকাল। 'কে আপনি, স্যার?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে জানতে চাইল সে। 'ক্লাবের সদস্য হলে পরিচয়-পত্র দেখাতে হবে, প্লীজ।'

পরিচয়-পত্র সঙ্গেই আছে, কিন্তু সেটা বের করার আগে লোকগুলোর পরিচয় জানতে হবে রানাকে। 'তোমরা কারা? ক্লাবের গার্ডরা কি করছে?'

'গার্ডরাও আছে, স্যার,' বলল লোকটা। 'তবে গেটে আপাতত আমরাই দায়িত্ব পালন করছি। আপনার মেম্বারশিপ কার্ড, প্লীজ, স্যার?'

'তোমরা সিভিল ড্রেসে সিআইডি পুলিস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জ্বী-না।'

'ডিবির লোক?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'সিকিউরিটি, স্যার। প্রাইভেট সিকিউরিটি। বোঝা গেল, আপনার কাছে মেম্বারশিপ কার্ড নেই। সেক্ষেত্রে আপনার গাড়িটা সার্চ করতে হবে, স্যার। তারপরও আপনাকে আমরা ভেতরে ঢুকতে দিতে পারব না...' দরজার হাতল ধরে চাপ দিল, নড়ল না দেখে হাত গলিয়ে দিল জানালার ভেতর, লক খুলবে।

রাগে পিত্তি জ্বলে গেলেও রানা সম্পূর্ণ শান্ত থাকল। হাসিমুখে হাত বাড়াল, যেন লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার ইচ্ছে। তবে মুঠোয় ভরল শুধু একটা আঙুল, তর্জনীটা; ভরেই উল্টোদিকে এত জোরে চাপ দিল যে আঙুলটা ভেঙে কব্জির নাগাল পেয়ে গেল। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা, ইংরেজি ভুলে গেছে, মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মার ডালা!' হাতটা পেটের সঙ্গে চেপে ধরে কুঁজো হয়ে লাফাচ্ছে।

'কিয়া হুয়া, কাসিম খান?' কে যেন অবাক হয়ে জানতে চাইল।

আহত কাসিম খান অক্ষত হাতটা কোটের ভেতরে ঢোকাচ্ছে, শোল্ডার-হোলস্টার থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে স্মল আর্মস।

গাড়ির পিছন থেকে আরেকজন জরুরী তাগাদার সুরে হঠাৎ বলল, উর্দুতে, 'ওঁরা পৌঁছে গেছেন! লীডার ও ম্যাডাম পৌঁছে গেছেন!'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, গেটের ভেতর ঢুকে পাকা রাস্তা ধরে সোজা গাড়ি-বারান্দার দিকে এগোচ্ছে। গেট থেকে সেটা পঞ্চান্ন কি ষাট গজ দূরে। রিয়ারভিউ মিররে তাকাল ও। মিথ্যে ভান নয়, সত্যি সত্যি কাসিম খানের অক্ষত হাতে একটা রিভলভার বেরিয়ে এসেছে। তবে টয়োটার দিকে গুলি করার সুযোগ পাচ্ছে না, সঙ্গীরা তাকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক পাশে।

সামনের দিকে মনোযোগ দিল রানা। গাড়ি-বারান্দায় একটাও গাড়ি নেই, সব ক'টা গাড়ি রাস্তার দু'পাশে লনে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর আশপাশে সামরিক কায়দায় টহল দেয়ার ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে নীল স্যুট পরা কয়েকজন লোক, কাউকেই গাড়ি থেকে নামতে দিচ্ছে না। গাড়ি-বারান্দায় ইউনিফর্ম পরা ক্লাব গার্ডদের দেখা যাচ্ছে, তবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে তারা। ওখানেও নীল স্যুট পরা দু'তিনজন লোক রয়েছে, তাদের মধ্যে একজন কানে মোবাইল ফোন ঠেকিয়ে দ্রুত কথা বলছে কারও সঙ্গে, তাকিয়ে আছে টয়োটার দিকে। কানে ফোন নিয়েই ছুটে এল সে, টয়োটার পথ আগলে দাঁড়াল। লোকটাকে চাপা দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই, কাজেই আবার বাধ্য হয়ে গাড়ি থামাতে হলো রানাকে। তবে একটু কৌশল করল ও। গাড়ির স্পীড একেবারে কমিয়ে আনল, পুরোপুরি থামছে না, ফলে এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল লোকটা। এভাবে গাড়ি-বারান্দার কিনারায় পৌঁছে গেল টয়োটা।

লোকটা রানার চালাকি বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। রানার আর এগোবার উপায় নেই।

'আপনার পরিচয়-পত্র, স্যার?' জানালার পাশে এসে ঝুঁকল লোকটা।

'পরিচয়-পত্র চাওয়ার তুমি কে হে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'গার্ডদের ডাকো।'

লোকটা জবাব দিল না, বলল, 'এসেই যখন পড়েছেন, গাড়ির ভেতরেই থাকুন, প্লীজ,' চট করে মুখ তুলে গেটের দিকে একবার তাকাল। 'মেহমানরা পৌঁছে গেছেন, তাঁরা ক্লাবের ভেতর ঢোকার পর নামতে পারবেন।' সিধে হলো লোকটা, মোবাইলে চাপা গলায় কথা বলছে, খালি হাতটা মাথার ওপর তুলে হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকছে।

রিয়ারভিউ মিররে তাকাতেই একটা মোটর শোভাযাত্রাকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। প্রথমে একজোড়া মোটর সাইকেল, তারপর একটা ক্রীম কালার পাজেরো জীপ, মাঝখানে একটা লেটেস্ট মডেলের সাদা মার্সিডিজ, পিছনে আরেকটা নীল পাজেরো, সবশেষে আরও একজোড়া মোটর সাইকেল। লোকটা এই শোভাযাত্রাকে সামনে বাড়ার সঙ্কেত দিচ্ছে। অবশ্য রানার ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে

গাড়ি তিনটে টয়োটাকে পাশ কাটিয়ে গেল। পাজেরো দুটোয় সশস্ত্র গার্ডদের দেখতে পেল রানা, সবাই নীল স্যুট পরা, চেহারায় বাঘের গাম্ভীর্য, চোখে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি। মার্সিডিজের জানালার কাচ রঙিন, ভেতরে কে বা কারা আছে দেখা গেল না।

টয়োটার পাশে দাঁড়ানো লোকটা স্যালুট করল মার্সিডিজের আরোহীদের। সামনে ও পিছনে পাজেরো, গাড়ি-বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। একে একে চারজন আরোহী নামল সেটা থেকে। প্রথমে নামল একটা মেয়ে, সম্ভবত বিশ্বসুন্দরী হবার যোগ্যতা রাখে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, একহারা গড়ন ঘাড়ে ও মাথায় স্তূপ হয়ে আছে কালো সিল্ক, সেই চুলে একটা হাত তুলল, গাড়ি থেকে নেমে দ্বিতীয় আরোহী কিছু একটা বলায় মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে হেসে উঠল খিলখিল করে। দেখামাত্র চিনে ফেলেছে রানা। বাংলাদেশী মেয়ে, সুপারমডেল হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে, কয়েক বছর ধরে প্যারিসেই বসবাস করে ইশরাত জাহান।

ইশরাতের পাশে দাঁড়ানো লোকটাও যথেষ্ট লম্বা, ছয় ফুট তো হবেই। ক্লিনশেভ, অত্যন্ত সুদর্শন, নড়াচড়ায় দৃঢ় ও ঋজু ভাবটুকু স্পষ্ট। কাঁধ থেকে ঝুলছে গাঢ় রঙের একটা কোট, কলারটা ভেলভেট। চুলের রঙ মরচে ধরা লোহা, তার সামান্য কাত করে বসানো একটা হ্যাট। নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করছে রানা। লোকটাকে চেনে ও, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না।

মোটর সাইকেল আরোহীদের মাথায় হেলমেট, চোখে গগলস, গায়ের কালো জ্যাকেট ফুলে আছে।

মার্সিডিজ থেকে আরও দু'জন লোক নামল। এরাও দামী কাপড়চোপড়

পরে আছে, তবে নড়াচড়ায় মনিবের মত আভিজাত্য নেই। একজনকে বস্তার হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়, মাথাটা একদিক থেকে আরেক দিকে ঘন ঘন ঘুরে যাচ্ছে। এরইমধ্যে দু'বার রানার টয়োটার ওপর চোখ বুলানো হয়ে গেছে। তার সঙ্গীটা সামান্য খাটো, পরনে ঢোলা আলখেল্লা, হাত দুটো আলখেল্লার ভেতর ঢোকানো।

পাজেরো দুটো থেকেও লোকজন নামছে। সবারই হোঁৎকা চেহারা, মারমুখো ভঙ্গিতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। একটা পাজেরো থেকে সালোয়ার-কামিজ পরা তিনটে মেয়েও নামল, মেইড সার্ভেন্ট অর্থাৎ চাকরানী বলেই মনে হলো একটা মেয়ে খুবই লম্বা, কালো সিল্কের মত ঘাড়ে-মাথায় স্তূপ হয়ে আছে চকচকে চুল। দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্রীম কালারের পাজেরোর ড্রাইভার দীর্ঘদেহী, তার পরনেও স্যুট, কাঠামোয় দৃঢ় আর ঋজু ভঙ্গি অ্যাথলেটদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ধাপ ক'টা পেরিয়ে ক্লাবের লবিতে ঢুকতে যাবে বিদেশী মেহমান, কাচ লাগানো দরজার হাতলে হাত। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল হাতটা। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল সে, তাকাল সরাসরি টয়োটার দিকে। ফ্লাডলাইটের আলোয় ক্লাব বিল্ডিঙের সামনের অংশ দিনের মত আলোকিত। রানা টয়োটার ভেতর বসে আছে, তাসত্ত্বেও দু'জোড়া চোখ এক হলো, দৃষ্টির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে সময় নিচ্ছে। মেহমানের চোখের পাতা একটু কেঁপে গেল, কিংবা হয়তো আকারে একটু বড় হলো রানা পরিষ্কার উপলব্ধি করল, লোকটা ওকে চিনতে পেরেছে।

পরস্পরকে আমরা চিনি। চিন্তা করছে রানা। কিন্তু মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছি।

বিদেশী মেহমান ক্লাব বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে পড়েছে হাতল ঘুরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল রানা, কিন্তু নিচে নামতে পারল না। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়ানো লোকটা রানার কাঁধ ছুঁলো। 'প্লীজ, স্যার, আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন...'

রানার প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। বন্ধ করার জন্যে অকস্মাৎ হ্যাঁচকা টান দিল দরজায়। শেষ মুহূর্তে হাতটা টেনে নিতে চাইল লোকটা, কিন্তু পারল না; ফ্রেম আর দরজার মাঝখানে আটকে গেল কব্জি। হাড় ভাঙার আওয়াজটা তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দিল রানার মনে। কোন চিৎকার নেই, শুধু ফোঁপানোর আওয়াজ হলো। 'এত স্পর্ধা, গাড়ি থেকে নামতে দাও না?' নিচে নেমে দরজা বন্ধ করল রানা। 'মার্সিডিজে কে এল? কারা তোমরা?'

লোকটা ব্যথায় কাতর, আহত হাতটা বাতাসে ঘন ঘন ঝাড়ছে। সরে এসে রানার পথ আগলাবার চেষ্টা করল। 'আপনি ভুল করছেন, স্যার। আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার বলব না...'

লোকটার বুকে হাত রেখে ধাক্কা দিল রানা, আঙুলে শোল্ডার-হোলস্টারের স্পর্শ পেল।

ধাক্কা খেয়ে সরে গেল লোকটা, মোবাইলটা পকেটে ভরে শোল্ডার-

হোলস্টারের দিকে হাত তুলছে। এই সময় মার্সিডিজের পাশ থেকে কে যেন ইংরেজিতে বলল, 'সব ঠিক আছে, নঈম খান। লীডার ও ম্যাডাম ওপরতলায় উঠে গেছেন।'

স্থির হয়ে গেল লোকটা, ঢিল পড়ল পেশীতে, তারপর ঘুরে মার্সিডিজের দিকে পা বাড়াল। এই সময় ছুটে এল একজন ক্লাব গার্ড। 'আসসালামালায়কুম, স্যার! স্যার, দুঃখিত—আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়া হলো। আপনাকে আমি চিনি, অনেক দিন পর এলেন, স্যার। আসুন...'

'মার্সিডিজে কে এল, জানো?'

মাথা নাড়ল প্রৌঢ় ক্লাব-গার্ড। 'না, স্যার। শুধু জানি পাকিস্তান থেকে এসেছেন। বহুত বড় কোন ব্যবসায়ী। কর্মকর্তারা সবাই ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন...'

'ব্যবসায়ী? তাহলে লোকটাকে লীডার বলা হচ্ছে কেন?'

'তা তো, স্যার, বলতে পারব না।'

গার্ডকে একশো টাকা বকশিশ দিল রানা। 'ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজ করোগে, যাও।'

গার্ড চলে যেতে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। গাড়ি-বারান্দা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে, অন্তত প্রাইভেট সিকিউরিটির কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। লনে অপেক্ষারত গাড়িগুলো গাড়ি-বারান্দায় চলে আসছে। চত্বরটা পেরিয়ে ধাপ বেয়ে উঠল রানা, হাতল ঘুরিয়ে কাচ লাগানো দরজা খুলে লবিতে ঢুকল।

লবিও প্রায় ফাঁকা। এক কোণার সোফায় তিন-চারটে মেয়ে বসে আছে শুধু। 'অনুসন্ধান' লেখা কাঁচঘেরা খুপরির ভেতরও কেউ নেই, অথচ দরজাটা খোলা। সেদিকে এগোল ও, কাগজ আর পেন্সিল দরকার।

ক্লাব-বিল্ডিঙের কোথায় কি আছে জানে রানা। কনফারেন্স রুমটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে, পিছন দিকে। অফিস সেক্রেটারির কামরাটা লবির ডান দিকে, এই মুহূর্তে সেটা অন্ধকার। বাম দিকের দরজা দিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকা যায়। একতলায় আরও অনেক কামরা আছে, নিভৃতে ব্যবসায়িক আলাপ করার জন্যে বুক করা যায় সেগুলো। দোতলাটা দু'ভাগে ভাগ করা—এক দিকে বিলিয়ার্ড আর টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা, আরেক দিকে তাস বা জুয়া খেলার আসর বসে, সঙ্গে একটা বার আছে। তিনতলাটা বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে আলাদা করা, পাঁচতারা হোটেল স্যুইটের মত দামী ও বিলাসবহুল ফার্নিচার দিয়ে সাজানো, এমন কি রাত্রি যাপনও সম্ভব। এখানে ক্যাটারিং সার্ভিস পাওয়া যায়, আলাদা একটা বারও আছে।

'অনুসন্ধান' থেকে সাদা এক শীট কাগজ আর একটা পেন্সিল নিয়ে বেরিয়ে এল রানা, লবির এক কোণে হেঁটে এসে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসল। ইতিমধ্যে লবিতে লোকজন ঢুকতে শুরু করেছে। কেউ থামছে না, বিভিন্ন দরজা দিয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। বেশিরভাগই তরুণ, স্মার্ট ব্যবসায়ী। দু'একজন বিদেশীকেও দেখল রানা অফিস সেক্রেটারির কামরার পাশের সিঁড়ি

বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। রানা যেখানে বসেছে তার পাশেই আরেকটা সিঁড়ি। সিঁড়ির আরেক পাশে এক সারিতে তিনটে টেলিফোন বুদ, দুটোর দরজা খোলা, একটার বন্ধ। বুদগুলো হার্ডবোর্ড দিয়ে ঘেরা, মাথার দিকটা খোলা।

কাগজে একটা স্কেচ আঁকছে রানা। ইশরাত জাহানের সঙ্গী, পাকিস্তানী লোকটাকে খানিক আগে যেমন দেখেছে। ওটার পাশেই আঁকল আরেকটা স্কেচ, তবে এটার মাথায় হ্যাট নেই। আঁকার দিকে মন, তবে লবির চারদিকেও নজর রাখছে। হ্যাটবিহীন চেহারায় গোঁফ আঁকল, জুলফি বড় করল, খাড়া নাকটা ছোট করল সামান্য।

আপনমনে মাথা নাড়ল রানা। তৃতীয় একটা স্কেচ আঁকছে। এটার গোঁফ থাকল না, হ্যাট থাকল না, জুলফি ছোট করল, নাক ঠিক রাখল, দাড়ি লাগাল। উত্তেজনা বোধ করছে ও। দাড়িটা পছন্দ না হলেও, চেহারাটা এখন আরও বেশি চেনা চেনা লাগছে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো, দাড়িটাই বাধা। এই দাড়ির জন্যেই পরিচিত একটা চেহারা ফুটছে না। রাবার দিয়ে দাড়ি মুছে ফেলল। হতাশায় ছেয়ে গেল মন, চেহারাটা এখন একেবারেই অচেনা লাগছে।

লবির ওপর চোখ বুলাল রানা। 'অনুসন্ধান'-এ একজন লোক এসে বসেছে। আরেক প্রান্তের সোফায় যে মেয়েগুলো ছিল তারা সংখ্যায় কমে একজন হয়ে গেছে। সর্বশেষ স্কেচটায় আবার দাড়ি আঁকছে ও—তবে এটা ছাগলদাড়ি। সেটাও মুছে ফেলতে হলো। আবার আঁকছে, এবার ফ্রেঞ্চকাট।

শিরদাঁড়া বেয়ে হিম একটা অনুভূতি উঠে আসছে। ইশরাত জাহানের সঙ্গী লোকটাকে চিনে ফেলেছে রানা। ইয়া আল্লাহ, কালসাপটা ঢাকায়! কেন এসেছে? কি চায়? নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র···

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, বন্ধ টেলিফোন বুদ খুলে বেরিয়ে আসছে কেউ। সরাসরি না তাকিয়েই বুঝতে পারল, একটা মেয়ে ত্রস্ত পায়ে চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রানা চোখ নামিয়ে রেখেছে, কাগজের ওপর দৃষ্টি, তবে বুঝতে পারছে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে মেয়েটা। আন্দাজ করতে পারছে কে সে।

পাশের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল মেয়েটা। 'মাসুদ ভাই! আপনি!' ফিসফিস করল।

'খোলা লাইনে এতক্ষণ ধরে কেউ কথা বলে?' রানার গলায় তিরস্কার। 'নিশ্চয়ই ঢাকা অফিসের কারও সঙ্গে কথা বললে?'

'জ্বী।' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল শারমিন। 'অফিসে এই সময় কারও থাকার কথা নয়, সোহেল ভাইয়ের বাড়িতে ফোন করেছিলাম···'

'সোহেল তোমাকে রিপোর্ট সংক্ষেপ করতে বলেনি?'

'আমি কোড করা মেসেজ পাঠিয়েছি, মাসুদ ভাই।'

'যে লোকটা একটু আগে ক্লাবে এল, সিকিউরিটির বহর দেখে বোঝোনি কতটুকু তার ক্ষমতা? সমস্ত টেলিফোন কল নিশ্চয়ই মনিটর করছে ওরা। কোড

করা মেসেজ তো আরও সন্দেহজনক। তুমি ফেঁসে গেছ, শারমিন। ওরা তোমাকে ক্লাব থেকে বেরুতে দেবে না…'

রানার কথা শেষ হলো না, দুই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল নীল স্যুট পরা ছ'জন হোঁৎকা সিকিউরিটি গার্ড। লবির মাঝখানে দাঁড়াল দু'জন, দু'জন পজিশন নিল লবি থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার পাশে, একজন বসল নিঃসঙ্গ মেয়েটার পাশের সোফায়, শেষ লোকটা লবি থেকে বেরিয়ে গেল। পাঁচজনই তারা অন্যমনস্কতার ভান করে রানা আর শারমিনের ওপর নজর রাখছে।

শারমিনের চেহারা সাদা হয়ে গেছে। 'এখন কি হবে, মাসুদ ভাই?'

'তোমার সঙ্গে আমিও ফেঁসে গেছি,' নিচু গলায় বলল রানা। 'এখন আর বাইরে থেকে কারও সাহায্য চাওয়ারও উপায় নেই। তবে ভয় পেয়ো না। দেখি কি করা যায়। আমাকে সব কথা বলো। যে এল, তাকে তুমি চেনো? হেডকোয়ার্টার তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিল?'

সংক্ষেপে রিপোর্ট করল শারমিন। ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও বিসিআই ঢাকা হেডকোয়ার্টার গতকাল তাকে জানায় যে 'কে.কে. কানেকশন' নামে একটা পাকিস্তানী কোম্পানীর কয়েকজন প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্যে চট্টগ্রামে আসছে। কোম্পানীটার কয়েকটা শাখা—পেট্রো-কেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন, ট্যুরিস্ট রিসর্ট নির্মাণ, পোর্ট ফ্যাসিলিটি মডার্নাইজেশন ইত্যাদি কাজে আন্তর্জাতিক সুনাম আছে তাদের। কিন্তু বিসিআই গোপনসূত্রে জানতে পেরেছে, কে.কে. কানেকশন আর্মস ও ড্রাগস স্মাগলিঙের সঙ্গেও জড়িত। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের কোথায় কাদের কাছে এ-সব তারা সাপ্লাই দিয়েছে, তার একটা তালিকাও শারমিনকে পাঠানো হয়।

স্কেচ আঁকা কাগজটার উল্টোপিঠে কিছু নোট নিল রানা।

শারমিন আবার শুরু করল। অনেকগুলো প্রজেক্টে টেন্ডার গ্রহণ শুরু হবে, তবে কোনটার টেন্ডার বক্সই পঁচিশ তারিখের আগে খোলা হবে না, অর্থাৎ প্রথম টেন্ডার বক্স খোলা হবে আজ থেকে এক হপ্তা পর। অনেক চেষ্টা করেও বিসিআই জানতে পারেনি 'কে.কে. কানেকশন'এর প্রতিনিধি কবে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছুবে, কিংবা প্রতিনিধি দলে কে কে থাকবে। শারমিন এয়ারপোর্টে খবর নিয়েছে। কিন্তু কে.কে. কানেকশন'-এর প্রতিনিধিরা পাকিস্তান থেকে প্লেনে করে আসেনি। শারমিনের ধারণা, বার্মা থেকে, নাফ নদী হয়ে ইয়ট নিয়ে এসেছে তারা। বন্দরে নিশ্চয়ই কাস্টমস চেকিং হয়েছে, তবে সম্ভবত পাসপোর্টগুলো বেশিরভাগই জাল।

শারমিন থামতে একসঙ্গে দুটো প্রশ্ন করল রানা, 'কে.কে. কানেকশনের মালিককে তুমি চিনতে পেরেছ? তোমার সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল শারমিন।

কাগজে আঁকা তৃতীয় স্কেচটা শারমিনকে দেখাল রানা। 'এ হলো খায়রুল কবির, কুখ্যাত সেই কবির চৌধুরীর ছেলে। সে যাক, সোহেল তোমাকে কি বলল?'

'ওদের ওপর নজর রাখতে বললেন,' জবাব দিল শারমিন। 'কাল সকালের প্লেনে হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েকজন এজেন্টকে পাঠাবেন, আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যে।'

'এরকম ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতিতে সোহেলের এই প্রতিক্রিয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা যে এখানে ফাঁদে পড়ে গেছি, হেডকোয়ার্টারকে এখন আর তা জানানোর উপায়ও নেই,' বলল রানা। আবার তিরস্কার করল শারমিনকে, 'তোমার উচিত ছিল বাইরে কোথাও থেকে ফোন করা।'

'মাসুদ ভাই, আমি যদি আবার টেলিফোন বুদে ঢুকি, ওরা কি বাধা দেবে?'

'মনে হয় না। সম্ভবত হাসবে। কারণ আমার ধারণা, তুমি যে নম্বরেই ডায়াল করো, ক্লাবের টেলিফোন অপারেটর বদলে গেছে, সে তোমার সঙ্গে খায়রুল কবিরের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে।'

'এখন তাহলে কি হবে?'

'এই জায়গা ছেড়ে নড়বে না তুমি,' বলে সোফা ছাড়ল রানা। লবির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দু'জনের মধ্যে একজন কাসিম খান, অপরজন নঈম খান—দু'জনকেই খানিক আগে জখম করেছে রানা, আঙুলে আর কব্জিতে সাদা ব্যান্ডেজ তার সাক্ষ্যও বহন করেছে। 'এই যে, কাসিম খান, এদিকে এসো,' ডাকল রানা, নিজেও অলস পায়ে ওদের দিকে এগোচ্ছে।

কাসিম খান আর নঈম খান চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করল। নঈম খান সরে গেল একপাশে, পরিষ্কার বোঝা গেল, উদ্দেশ্য কাসিম খানকে কাভার দেয়া। কাসিম খান অশ্লীল ভঙ্গিতে বুক চিতিয়ে রানার দিকে পা বাড়াল। রানার ওপর তার আক্রোশ গোপন থাকছে না।

মুখোমুখি দাঁড়াল ওরা। পরস্পরকে দেখছে।

'তোমার বসকে বলো, আমি সাঈদ সিদ্দিকী। সে আমাকে চেনে, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুবই জরুরী ব্যাপার, দেরি করলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে তার।'

'স্যার, আপনি সত্যি কথা বলছেন না!' কদর্য ভঙ্গিতে, বেসুরো গলায় হেসে উঠল কাসিম খান। 'আমাদের লীডার বহুরূপী, অনেক সময় আমরা নিজেরাই তাঁকে চিনতে ভুল করি।'

হাতের কাগজটা দেখাল রানা। 'যতই প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্য নিক, খায়রুল কবিরকে চিনতে আমার কোন অসুবিধে হয়নি।'

কাসিম খানের মুখ ঝুলে পড়ল। 'কি বলতে হবে আরেকবার রিপিট করুন, প্লীজ।'

'আমি সাঈদ সিদ্দিকী, অন্তত এই নামেই এখান থেকে মেম্বারশিপ কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ব্যস, এইটুকু বললেই হবে।'

'আপনি ওই সোফায় গিয়ে বসুন,' পকেট থেকে মোবাইল বের করে বলল কাসিম খান। 'আমি দেখি লীডারকে পাওয়া যায় কিনা।'

ফিরে এসে নিজের সোফায় বসল রানা, নিচুগলায় বলল, 'জানি না ভুল করতে যাচ্ছি কিনা।'

'আমাকে বলবেন না কি করতে চাইছেন?'

'চেষ্টা করব ব্লাফ দিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে। খায়রুল কবিরের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। তাকে একটা প্রস্তাব দেব।'

'কি প্রস্তাব?' ঢোক গিলে জানতে চাইল শারমিন।

রানা কিছু বলার আগেই কাসিম খান হাতছানি দিয়ে ডাকল। সোফা ছেড়ে এগোল রানা। ওর হাতে মোবাইলটা ধরিয়ে দিল কাসিম। 'কথা বলুন।'

মোবাইল কানে তুলে রানা বলল, 'হ্যালো?'

'মি. সাঈদ সিদ্দিকী?'

'বলছি।'

'ধন্যবাদ। আমি ওয়াসিম নকভি, মহামান্য হাজী মোহাম্মদ খায়রুল কবিরের স্টাফ ম্যানেজার।'

'ও।' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, ভাবছে—শালা আবার হাজী হলো কবে!

'মি. সিদ্দিকী,' বলল নকভি, 'আপনার জন্যে একটা সুখবর আছে। আমাদের লীডার আপনার অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি আপনাকে চিনতে রাজি হয়েছেন। এ-কথা কি সত্যি যে আপনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান?'

'ন্যাকামি বাদ দিয়ে জানাও যে আমি তাকে কয়েকটা দুঃসংবাদ দিতে চাই।'

'সেগুলো সম্পর্কে একটু আভাস দিতে পারেন, মি. সিদ্দিকী?'

'তোমরা সময় নষ্ট করে তার জন্যে বিপদ ডেকে আনছ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'যা বলার সরাসরি দেখা করে তাকেই বলব। সে দেখা করতে চায়, নাকি চায় না? ইয়েস, অর নো?'

পাঁচ-সাত সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর নকভি বলল, 'লীডার বলছেন, দুঃসংবাদকে তিনি ভয় পান না, কারণ ওগুলো তিনি সৃষ্টি করেন। তবে আপনি যখন এত করে বলছেন, আপনাকে তিনি দু'এক মিনিট সময় দিতে রাজি আছেন। তবে ভুলবেন না, এ তাঁর মহত্ত্ব আর উদারতারই পরিচয় বহন করে।'

'আবে যাহ্,' দাঁতে দাঁত পিষে বিড়বিড় করল রানা, কাসিম বা নকভি শুনে ফেললে ফেলল, গ্রাহ্য করছে না।

'আপনি তাহলে সরাসরি তিনতলায় উঠে আসতে পারেন, মি. সিদ্দিকী,' বলল নকভি। 'উনি তিন নম্বর স্যুইটে আছেন, আপনাকে পথ দেখাবে কাসিম খান।'

'সঙ্গে আমার বান্ধবী শায়লা শারমিনও থাকছেন,' বলল রানা।

এবার তিন সেকেন্ড বিরতি নিল নকভি। 'সেটা উচিত হবে না, মি.

সিদ্দিকী। লীডার একা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

মোবাইলটা কাসিম খানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে শারমিনের কাছে ফিরে এল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ব্যাকআপ কোথায়? কে সে?'

'প্রণব, মাসুদ ভাই। প্রণব চাকমা। ওরা এখানে পৌঁছুবার মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে হাসপাতাল থেকে একটা ফোন পাই আমি, এখানে আসার পথে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সে। মারাত্মক কিছু নয়, তবে অন্তত দুটো দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।'

'এর মানে হলো খায়রুল কবিরের এখানকার এজেন্টরা তোমাদের পরিচয় আগে থেকেই জানে, সম্ভবত তারাই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে প্রণবকে অচল করে দিয়েছে। এ যদি সত্যি হয়ে থাকে, হাসপাতালেও প্রণবের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। শোনো, আমি তিনতলায় কবিরের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। কতক্ষণ লাগবে বলতে পারছি না।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'লবি নিরাপদ নয়, তোমাকে রেস্তোরাঁয় বা বারে বসতে হবে, যেখানে লোকজন আছে। কোথায় বসতে চাও?'

'এই সময়টায় বারেই বেশি লোক থাকে, ওখানে আমার পরিচিত অনেককে পাওয়া যাবে।'

'এসো।' শারমিনকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল রানা।

পিছু নিয়ে কাসিম খান বলল, 'স্যার, আপনার একা যাবার কথা।'

'দোতলায় বসবে ও।' শারমিনকে নিয়ে দ্রুত উঠছে রানা, পিছন ফিরে তাকাল না।

শারমিনকে বারে বসিয়ে রেখে এসে তিনতলায় উঠছে রানা, এবার সামনে রয়েছে কাসিম। করিডরে উঠে এসে একটা কাঁচ লাগানো দরজার সামনে দাঁড়াল ওরা। ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে নঈম খান, আরেক সিঁড়ি দিয়ে কখন যেন উঠে এসেছে। দরজার তালা খুলে রানাকে দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে সার্চ করল, তারপর বলল, 'দুঃখিত, স্যার। বুঝতেই পারছেন, এ স্রেফ সাবধানতা। আমরা দু'জন স্যার আর ম্যাডামের বডিগার্ড।'

কাসিমের পিছু নিয়ে পেন্টহাউস স্যুইটের আলাদা করিডরে ঢুকল রানা। এরপর সেগুন কাঠের একটা দরজা। ভেতরে ছোট একটা লবি। লবির এক পাশে আরেকটা দরজা। সেটা খুলে সরে দাঁড়াল কাসিম, ইঙ্গিতে রানাকে ভেতরে ঢুকতে বলল। 'মি. সাঈদ সিদ্দিকী, স্যার।'

প্রথম ও শেষবার খায়রুল কবিরকে বছরখানেক আগে দেখেছে রানা, তখন তার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ছিল। পাগল বিজ্ঞানী কবির চৌধুরীর ছেলে, বাপের মতই সুপুরুষ, চেহারায় আভিজাত্যের ভাবটুকু কাছ থেকে আরও স্পষ্ট। এখন শুধু যে দাড়িটা নেই, তা নয়; প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে সে তার চেহারা খানিকটা বদলেছে। খোদার দেয়া চেহারা কোন কারণ ছাড়া কেউ বদলায় না, বিশেষ করে সুদর্শন কোন পুরুষ। খায়রুল কবিরের কারণটা কি হতে পারে? রানার সঙ্গে তার যখন দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তার আগেই টেকনো-টেরোরিস্ট হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে সে। বাপের মতই উচ্চশিক্ষিত,

বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছে, চিন্তা-ভাবনায় পাগলাটে একটা ভাবও আছে, তবে কবির চৌধুরীর সমান প্রতিভাবান কিনা সেটা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ।

'আসুন, মি. সিদ্দিকী, আসুন।' লিভিংরুমের মাঝখানে কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে খায়রুল কবির। মুখে অমায়িক হাসি। 'মেসেজ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আপনার সহৃদয়তার পরিচয় বহন করে। তো কিভাবে আপ্যায়ন করতে পারি? আমার যতদূর জানা আছে, চা-কফি-কোক ছাড়া অন্য কোন পানীয় ইদানীং আপনি পছন্দ করেন না। চা বলব?'

সাক্ষাৎ পর্বটা যতটা পারা যায় দীর্ঘ করতে চায় রানা। 'হ্যাঁ, চা চলতে পারে।'

'চীনা, নাকি বাংলাদেশী, প্লীজ?' জিজ্ঞেস করল খায়রুল কবির। 'আমি অবশ্য দার্জিলিঙের চা-ই পছন্দ করতাম, কিন্তু মৌলবাদী বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওখানকার চায়ে কেমন যেন একটা বাজে গন্ধ পাই, তাই আর খাই না। কি, ঠিক বলিনি, নকভি? খাই?' একটু দূরে দাঁড়ানো খাটো আকৃতির ওয়াসিম নকভির দিকে তাকাল সে।

নকভি কিছু বলার আগেই সাবধান করে দিল রানা, 'ভাষা ঠিক করো। আমি তোমার প্রলাপ শুনতে আসিনি।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল খায়রুল কবির। 'জানি, জানি— ইসলামী মৌলবাদ তোমাদের গাত্রদাহের কারণ ঘটায়, কিন্তু হিন্দু মৌলবাদ প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলো। কাসিম, বাংলাদেশী চা। তো, মাসুদ রানা, দাঁড়িয়ে কেন?' আবার হাসল সে। 'ভান-ভণিতা যথেষ্ট হয়েছে, তাই আসল নামেই সম্বোধন করলাম।'

একটা সোফায় বসে পায়ের ওপর পা তুলল রানা। 'নামের কথা যখন উঠল, যে পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছ, সেটা কি তোমার আসল নামে?'

হেসে উঠে কবির বলল, 'বোঝা গেল তুমি জানো যে আমার নাম আর পাসপোর্ট অনেকগুলো। তা, রানা, অপূরণীয় ক্ষতির ব্যাপারটা কি? কে আমার কি ক্ষতি করতে চায়?'

'বিসিআই তোমার বিরুদ্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে,' বলল রানা। 'আজ রাতেই তোমাকে অ্যারেস্ট করা হবে। তোমাকে একা না, মিসেস কবিরকেও। ইশরাত জাহানকে বিয়ে করার ব্যাপারটা তুমি গোপন রাখলেও, আমাদের কাছে গোপন নেই। তোমার সমস্ত অবৈধ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কবির।'

'রানা! ওহ, রানা!' যেন অবুঝ কোন শিশুকে শান্ত করতে চাইছে কবির। 'কথা বলার সময় একটু মাথা ঘামাও, প্লীজ। আমার ব্যবসা সম্পর্কে কি জানো তোমরা? গ্লোব দেখেছ তো? ওটার এমন কোন এলাকা নেই যেখানে আমি পৌঁছুতে পারিনি। আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, তাঁকে ধরে হোয়াইট হাউস মেরামতের কাজটা পেয়ে গেছে আমার কনস্ট্রাকশন ফার্ম। মস্কোয় নতুন একটা পার্লামেন্ট ভবন তৈরি করছি আমরা। রাশিয়ার পেট্রো-কেমিক্যাল প্ল্যান্টগুলো বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, সর্বনিম্ন

টেন্ডার জমা দিয়েছে কে.কে. কানেকশন-এর কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং শাখা। পাকিস্তানে সিন্ধু নদীর ওপর আরেকটা বাঁধ তৈরি করছি আমরা। দক্ষিণ আফ্রিকা আর জিম্বাবুয়ে-তে তৈরি করছি ট্যুরিস্ট রিসর্ট। এ-সবই তো বৈধ ব্যবসা, তাই না? ইন্টারপোল বা বিসিআই কেন আমার পিছনে লাগতে যাবে? কেন, কোন্ দোষে আমি অ্যারেস্ট হব?'

রানা বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

'ও, তাই?' জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লাব লনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াসিম নকভি।

'নকভির সামনে কথা বলা সম্পূর্ণ নিরাপদ, রানা,' বলল কবির। 'এই যে, কাসিম চা নিয়ে এসেছে।'

কাসিম চা পরিবেশন করছে, তার উপস্থিতিতে ওরা কেউ কথা বলছে না। কাজটা শেষ হতে কবির তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলল, তারপর বিদ্রূপাত্মক হেসে যোগ করল, 'মি. সিদ্দিকী প্রাইভেসী পছন্দ করেন। তুমি কিছু মনে কোরো না। উনি তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করতে চেয়েছেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

কাসিম রানার দিকে একবার তাকিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'আমি অপেক্ষা করছি, রানা,' নিস্তব্ধতা ভাঙল কবির চৌধুরী।

'আগেই শুনেছ, তোমার জন্যে কয়েকটা দুঃসংবাদ আছে,' বলল রানা। 'তোমাকে একটা প্রস্তাবও দেব আমি। দুঃসংবাদগুলো শুনলে বুঝতে পারবে কি মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছ তুমি। যতই ভান বা অস্বীকার করো, তাতে বিপদটা কমবে না। তবে আমার প্রস্তাবটা মেনে নিলে এ-যাত্রা অন্তত প্রাণে বেঁচে যাবে।'

'সার কথা, তুমি আমার উপকার করতে চাইছ!' হাসছে কবির। 'দুঃখিত, এ আমি বিশ্বাস করতে অপারগ।'

'আমার একটা স্বার্থ আছে, উপকার করতে চাওয়ার সেটাই কারণ,' বলল রানা।

'উপকার দরকার হয় বিপদগ্রস্ত লোকের।' হাসছে কবির, এখনও কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। 'আমার বিপদটা কি তাই তো আমি জানি না।'

'কে.কে. কানেকশন বৈধ ব্যবসার আড়ালে আর্মস আর ড্রাগস স্মাগলিং করছে,' বলল রানা। 'শুধু বিসিআই নয়, কবির; ইন্টারপোলের হাতেও তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।'

'যেমন?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল কবির, এতটুকু বিচলিত নয়।

'কক্সবাজারে গোলাম মাওলা ধরা পড়েছে,' বলল রানা। 'বিসিআই তার কাছ থেকে তোমার তিনটে গোপন আস্তানার কথা জানতে পেরেছে। তিনটেই এই চট্টগ্রামে। প্রতিটি আস্তানায় হানা দিয়ে বিপুল হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলাদেশে গোলাম মাওলাই নাকি তোমার ডান হাত। হেরোইন ব্যবসার সঙ্গে তোমার সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছে সে। আর, তোমার বাম হাত, কলিম চৌধুরী, ধরা পড়ার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। গোলাম মাওলা

জানিয়েছে, চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও গোপন আস্তানা আছে তোমার, কিন্তু সে সেগুলোর ঠিকানা জানে না, তবে কলিম চৌধুরী জানে। বিশ্বাস করো, বিসিআই-এর হাতে যে-সব তথ্য আছে, সে-ও দু'চারদিনের মধ্যে ধরা পড়তে বাধ্য।'

কথা না বলে নকভির দিকে তাকাল কবির, চেহারায় কোন ভাব নেই।

জবাবে নকভি শুধু মাথা নাড়ল।

হেসে উঠল রানা। 'গোলাম মাওলা ধরা পড়েছে, এ-খবর তোমার স্টাফ ম্যানেজার জানে না, কবির। জানার কথাও নয়। বিসিআই গোলাম মাওলাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিচ্ছে। তবে তার শরীরে একটা বোমা আর একটা ট্র্যান্সমিটার ফিট করা আছে। বোমাটা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো যাবে। আর ট্র্যান্সমিটারটা তার সমস্ত কথা বিশেষ একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রচার করবে, রিসিভ করা হবে কাছাকাছি কোন মাইক্রো রিসিভারে। বিসিআই-এর ফিল্ড অপারেটরদের একটা গ্রুপ সারাক্ষণ তার ওপর নজরও রাখছে, সে যাতে কাউকে চিঠি লিখতে বা সঙ্কেত পাঠাতে না পারে।'

আবার নকভির দিকে তাকাল কবির, জিজ্ঞেস করল, 'রানার কথা কিছু বুঝতে পারছ, নকভি? এই গোলাম মাওলা বা কলিম চৌধুরী, কারা এরা?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল নকভি। 'এদের নাম আগে কখনও আমি শুনিনি, বস্।'

'মিথ্যে ভান করে সময় নষ্ট করছ তোমরা,' বলল রানা। 'আবার বলছি, আমার সঙ্গে রফা করো, এ-যাত্রা বেঁচে যাবে।'

'কি ধরনের রফায় আসতে চাও? তোমার প্রস্তাবটা শুনি?' অবশেষে জানতে চাইল কবির।

'তার আগে দুঃসংবাদগুলো শোনো,' বলল রানা। 'আমার চেয়ে তোমার বিপদ যে বেশি, সেটা অন্তত ব্যাখ্যা করতে দাও।'

'গুলো?' জোর করে হাসল কবির।

'রোহিঙ্গাদের ট্রেনিং দিচ্ছে তোমার লোকজন,' বলল রানা। 'ওদেরকে দিয়ে বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে তুমি একটা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছ। কিন্তু তোমার প্ল্যান ব্যর্থ হতে যাচ্ছে, কবির। গত হপ্তায় অস্ত্র আর গোলাবারুদের যে চালানটা ওদের হাতে পৌঁছেছে, কাল রাতে হানা দিয়ে বিডিআর সেগুলো কেড়ে নিয়ে এসেছে। রোহিঙ্গাদের তিনজন গেরিলা কমান্ডার ধরা পড়েছে। নামগুলো বলব?'

'শুনতে আপত্তি নেই,' নির্লিপ্ত গলায় বলল কবির। 'তবে এদেরকেও আমরা কেউ চিনতে পারব বলে মনে হয় না।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' বলল রানা। 'চিনতে পারলে তো অপরাধ স্বীকার করা হয়ে যায়—সে সাহস তোমার নেই।'

'নামগুলো, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল নকভি।

নামগুলো উচ্চারণ করার পর রানা বলল, 'তোমাদের সঙ্গে তো

ওয়্যারলেস আছে, যোগাযোগ করে দেখতে পারো—একজনও সাড়া দেবে না।'

কবির ইঙ্গিত করতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল নকভি।

'বাকি দুঃসংবাদ এখুনি দেব, নাকি তোমার স্টাফ ম্যানেজার ফিরলে শুনবে?' জানতে চাইল রানা।

কথা না বলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কবির।

'আজ সারারাত ধরে তোমার ঢাকা আর খুলনার অফিসগুলোয় বিসিআই, সিআইডি আর ডিবি হানা দেবে।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ওদের অপারেশন আধ ঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে।'

স্থির দাঁড়িয়ে ছিল কবির, এবার নড়ে উঠল। পায়চারি করছে সে।

'আজ রাতেই বিসিআই ইন্টারপোলকে প্রচুর তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে,' বলল রানা। 'ইন্টারপোল বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সতর্ক করে দেবে। সারা দুনিয়ায় তোমার যত অফিস বিল্ডিং আর গোডাউন আছে, সব ক'টায় হানা দেবে পুলিস।'

'রানা! দ্যাট'স এনাফ!'

'কি? হজম শক্তিতে কুলাচ্ছে না?' হেসে উঠল রানা। 'এবার নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আমার চেয়ে তোমার বিপদটা অনেক বেশি মারাত্মক? তোমার ইন্টেলিজেন্স শাখা ব্যর্থ হয়েছে, কবির। তারা জানাতে পারেনি বিসিআই তোমাকে আজ রাতে অ্যারেস্ট করার জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি মেসেজ পাঠালেই চলে আসবে ওরা। মেসেজ না পাঠালেও আসবে...'

'এ-সব যদি মিথ্যে হয়, তোমাদের দু'জনকে আমি গুলি করে মারব!' বাঘের মত গর্জে উঠল কবির।

রানা হাসছে। 'আর সত্যি হলে?'

দরজা খুলে গেল। নকভি ভেতরে ঢুকল না, শুধু উঁকি দিয়ে মাথা ঝাঁকাল। ত্রস্ত পায়ে তার দিকে এগোল কবির। দু'জন ফিসফাস করল কিছুক্ষণ। নকভি চলে গেল, আবার পায়চারি শুরু করল কবির।

'কনফার্মেশন, তাই না? এবার কি আমার প্রস্তাবটা তুমি শুনতে রাজি আছ?'

কবির কথা বলছে না। থমথম করছে তার চেহারা।

তিন মিনিট পর নকভিকে আবার দেখা গেল। এবার ভেতরে ঢুকল সে। আবার কিছুক্ষণ ফিসফাস। 'দুঃখিত, রানা। হঠাৎ জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। এখুনি ফিরে আসব।' কামরা থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

রানা নার্ভাস বোধ করছে। কপালে কি আছে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কবির ঘাবড়ে গেছে, তবে তার পরিণতি শুভ না-ও হতে পারে। কবির অন্তত বিশজন সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে ক্লাবে ঢুকেছে, নিশ্চয়ই তারা শারমিনকেও জেরা করছে। সম্ভবত বার থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে তাকে—ক্লাবে খালি ঘরের

কোন অভাব নেই।

'আপনার কি ধারণা, আমার বস্ এ-সব গল্প বিশ্বাস করবেন?' হঠাৎ জানতে চাইল নকভি।

'গল্প নয়, নকভি। বাস্তব সত্য।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আমি মেসেজ পাঠাতে ব্যর্থ হলে আর এক ঘণ্টা পর বিসিআই এজেন্টদের সশস্ত্র একটা গ্রুপ ক্লাব ঘিরে ফেলবে। ভাল কথা, আমি ভাবছিলাম, এসেই যখন পড়েছি, সুপারমডেল ইশরাত জাহানের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা সুযোগ পাব।'

হেসে উঠল নকভি। 'শুধু আপনি কেন, সবাই তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে লালায়িত। প্রতিযোগিতায় নাম লেখালে উনি বিশ্বসুন্দরী হতে পারতেন। টাকা থাকলে মানুষ কি পেতে পারে, এটা তার একটা দৃষ্টান্ত, তাই না?'

'মানে বলতে চাইছ তোমার বস্ টাকা দিয়ে ইশরাত জাহানকে কিনে নিয়েছে?'

'আরে না, তা কখন বললাম! আমি শুধু বলতে চাইছি টাকা থাকলে সবই কেনা যায়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল কবির। 'নকভি, এক মিনিটের জন্যে বাইরে এসো।' রানার দিকে তাকাল। 'দুঃখিত, রানা। জরুরী কাজ, কিছু করার নেই। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা, বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সোফা ছেড়ে খোলা জানালার সামনে চলে এল রানা। ক্লাবের সামনের দিকটা দেখতে পাচ্ছে ও। ছাদ থাকায় গাড়ি-বারান্দা দেখা যাচ্ছে না, তবে গেটের সামনে অনেকগুলো গাড়ি, ভেতরে আরোহীরাও বসে আছে, কিন্তু নীল স্যুট পরা কবিরের সিকিউরিটি গার্ডরা ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে—ভাব দেখে মনে হলো, গাড়ি বা লোকজনকে ক্লাব থেকে বেরুতে সম্ভবত বাধা দিচ্ছে তারা।

জানালার দিকে পিছন ফিরছে রানা, এই সময় লিভিং রুমের দ্বিতীয় দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল ইশরাত জাহান। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ফটোয় বা দূর থেকে যেমন দেখেছে রানা, তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর মেয়েটা। ইশরাতের রূপে আগুন নেই, নিখুঁত দেহ-সৌষ্ঠবে মায়াময় কোমলতাই তার প্রধান আকর্ষণ। আঁখিপল্লবের ঘন ঘন উত্থান-পতনে কিসের যেন ভয় বাসা বেঁধে আছে। নড়াচড়ায় ইতস্তত ভাব, খুবই নার্ভাস। 'মি...মি. রানা। আমি আপনার আসল নাম জানি। তাড়াতাড়ি একটা কথা বলেই চলে যাব।' চট করে প্রথম দরজার দিকে একবার তাকাল। 'ভূমিকা করার সময় নেই, শুধু একটা কথা বলি—আমি এ-দেশের মেয়ে, আর সবার মত আমিও দেশকে ভালবাসি। সেজন্যেই ঝুঁকি নিয়ে আপনাকে সাবধান করতে চাইছি...'

'সাবধান করতে চাইছেন?'

'আমার স্বামী। দেখে তাকে যা-ই মনে হোক, সে আসলে অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ। প্লীজ, আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। আমি বলতে চাইছি, ওকে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আরেকটা কথা…'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'বাংলাদেশের ক্ষতি করার জন্যে ভয়ঙ্কর কোন প্ল্যান করেছে সে। প্ল্যানটা কি তা এখনও আমি জানি না…'

প্রথম দরজা খুলে দমকা বাতাসের মত কামরায় ঢুকল কবির। স্ত্রীকে দেখে যেন বাড়ি খেলো দেয়ালে। 'এখানে কি করছ তুমি?' কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল, চেহারায় কসাইসুলভ হিংস্র ভাব। তার পিছন থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে ওয়াসিম নকভি।

'আমি ভেবেছিলাম তোমরা সবাই চলে গেছ,' করুণ মিনতির সুরে বলল ইশরাত, যেন ভয় পাচ্ছে তার গায়ে হাত তোলা হবে। 'আমি শুধু…'

'যাও, বেডরূমে অপেক্ষা করো। এখানে আমাদের মীটিং এখনও শেষ হয়নি।'

ইশরাত কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই আবার রানার দিকে তাকিয়ে হাসল কবির। 'মূল্যবান তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা। তোমার আর শারমিনের তথ্য মিলে গেছে, সেজন্যে তোমাদের দু'জনের ওপরই খুশি আমি…'

'তোমার গরিলারা তাকে যদি একটা টোকাও দিয়ে থাকে, আমি…'

'রানা! ওহ্ রানা!' মাথা নাড়ল কবির। 'আমরা প্রফেশনাল, মেয়েদের ব্যাপারে ইমোশনাল হয়ে পড়া আমাদেরকে মানায় না। নিশ্চিত থাকো, শারমিনকে নির্যাতন করা হয়নি। তবে হবে না, এরকম কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। তুমি আমার উপকার করতে চাইছ কেন, এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চাই আমি। তোমার পরম শত্রু, আমার বাবা কবির চৌধুরী আমাকে বলে গেছেন—"আমার পিছনে লেগে থাকলে কি হবে, মাসুদ রানার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, কারণ তার দেশপ্রেমের কোন তুলনা হয় না"। সেই মাসুদ রানা খায়রুল কবিরের উপকার করতে চায়, এটা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না।'

'তুমি যে অপরাধী, ঐ-সব কথা বলে প্রকারান্তরে সেটা স্বীকার করে নিচ্ছ,' বলল রানা।

কবিরের চোখে অশুভ একটা আলো ফুটল। সামান্য একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, তাতেই উন্মাদ আর উদভ্রান্ত লাগছে তাকে। 'অপরাধের সংজ্ঞা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে, রানা? একটা খারাপ আইনকে শুদ্ধ করার জন্যে সেটাকে ভাঙতে হয়, এই আইন ভাঙার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। হ্যাঁ, আমি আইন ভাঙছি। আইন ভাঙছি একটা ভুলকে শোধরানোর জন্যে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে ভাগ করে গেল দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে, সেটা সঠিক ছিল। পাকিস্তানকে দু'টুকরো করে তোমরা দুর্বল একটা রাষ্ট্র গঠন করলে, সেটা ছিল মারাত্মক একটা ভুল। আমি সেই ভুল সংশোধন

করার চেষ্টা করছি। এটাই আমার আদর্শ।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তোমরা সেটাকে অপরাধ বলতে চাও? বলো, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

'আর আমার ব্যবসা প্রসঙ্গে যে-সব অভিযোগ তুলেছ, কোনটাই আমি আর অস্বীকার করব না, বিশেষ করে অনেক কথাই যখন জেনে ফেলেছ। কিন্তু আমার ব্যবসা সম্পর্কে কতটুকুই বা জানো তোমরা? একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী একটা দেশকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আর আমি নিয়ন্ত্রণ করি ওই রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি জানেন না, আমি তাঁর দেশের বিদ্রোহী গ্রুপ বা প্রতিপক্ষ গেলিরাদেরও অস্ত্র আর গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করি। আমার ব্যবসা বা আদর্শ সম্পর্কে কি জানো তুমি, রানা? এই খেলা আমি ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, ইয়ামেন, আয়ারল্যান্ড, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, সুদান, মিশর, চেচনিয়া, কসোভো—বলো কোথায় না খেলছি। এখন তুমিই বলো, ইন্টারপোল বা বিসিআই কিভাবে আমার ব্যবসার ক্ষতি করবে? আরও শুনতে চাও?' বাপের মতই, উত্তেজিত হয়ে পড়লে দীর্ঘ ভাষণ দেয়ার প্রবণতা রয়েছে তার। 'আমি রাশিয়া আর আমেরিকার সারপ্লাস আর্মসের খুব বড় একজন ক্রেতা, সবচেয়ে বড় যদি না-ও হই। রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, সুইডেন, জার্মানী—যারাই অস্ত্র বানিয়ে বিক্রি করে তাদের সঙ্গেই আমার ব্যবসা। তারা আমার স্বার্থ দেখে, আমি তাদের। এখন তুমিই বলো...'

'আর পঞ্চাশ মিনিট পর একটা বুলেট যদি তোমার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'তখন কি হবে, কার স্বার্থ দেখবে তারা?'

'রানা! ওহ্, রানা!' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কবির। 'বাবার মুখে আরও শুনেছি, তোমার মধ্যে এক ধরনের শিশুসুলভ সরলতা আছে। কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়। ওহ্হো, কি করে বোঝাই তোমাকে! ঠিক আছে, একটা ছোট প্রশ্নের জবাব দাও। একটা কেন, এক কোটি বুলেটও কি কোন আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারে, রানা? আমার যারা অনুসারী তারা সবাই জানে আমি একটা মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিশাল এক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছি। এই যে দুটো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটল, বিশ্বাস করবে দ্বিতীয়টার পিছনে আমার বিরাট অবদান আছে? শুধু টাকা নয়, রানা, আমি আমার মেধা দিয়ে সাহায্য করেছি ওদেরকে। আর এটা হলো আমার আদর্শ বাস্তবায়নের সূচনা-পর্ব, প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ...' কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল সে, '... সেটাও কম দর্শনীয় হবে না, রানা—কথা দিচ্ছি। আর বেশি দেরি নেই, নিজের চোখেই দেখতে পাবে ফলাফলটা...'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তোমার হাতে আর চল্লিশ মিনিট সময় আছে, কবির।'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল কবিরের মুখে। 'ব্লাফ দিতে চাইছ, তাই না? তোমাকে তো আগেই বলেছি, তুমি আমার উপকার করতে চাও, এ-কথা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না।'

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। বুদ্ধিতে কবিরের কাছে হেরে গেছে ও।

তবু মুখের হাসিটা ধরে রেখে কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, 'কেউ যদি সন্দেহবশত উপকার প্রত্যাখ্যান করে, আমার কিছু করার নেই।'

কবির শব্দ করে হেসে উঠল। 'তাহলে শোনো, আমার কি ধারণা বলি। প্রণব চাকমা অ্যাক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর শায়লা শারমিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ক্লাব থেকে বাইরে কোথাও যোগাযোগও করতে পারছে না। তার ধারণা ঢাকায়, সোহেল আহমেদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছে সে, কিন্তু তা সত্যি নয়। দু'জনেই ওরা বিসিআই এজেন্ট, আমরা জানি—শারমিন আর প্রণব। আর ক্লাবে তোমার আগমন স্রেফ কাকতালীয় ঘটনা। ঘটনাচক্রে তুমিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ, রানা। তোমার মনে ভয় ঢুকেছে, তোমাদেরকে আমরা প্রাণ নিয়ে ক্লাব থেকে বেরুতে দেব না। সেজন্যেই সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ, আমি যাতে তোমাদেরকে ছেড়ে দিই।'

ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, বুঝতে পেরে মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। খায়রুল কবিরকে এতটা ছোট করে দেখা উচিত হয়নি ওর। ও কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে বাধা দিল কবির।

'বলতে পারো স্রেফ দয়া করে তোমাকে আর শারমিনকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি,' বলল সে। 'ক্লাব ছেড়ে চলে যেতে দেয়া হবে তোমাদের, তবে এখুনি নয়, আধ ঘণ্টা পর। এই ঘরেই থাকছ তুমি, সময় হলে ক্লাব গার্ডদের একজন এসে দরজা খুলে দেবে। নিচতলার একটা কামরায় পাবে শারমিনকে।' নকভির দিকে তাকাল সে।

'কামরার নম্বর এ/ফাইভ, মি. রানা,' বলল নকভি।

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল কবির। 'জানতে ইচ্ছে করছে না, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তোমাকে খুন করছি না?'

রানা চুপ করে থাকল। জবাবে যদি বলে, তোমার সাহসের অভাব, সেটা মিথ্যে বলা হবে।

'তুমি খুন হয়ে গেলে আমি খেলব কার সঙ্গে, রানা?' ভুরু নাচাল কবির। 'বাবা স্বীকার করে গেছেন, তুমি তাঁর শত্রু হওয়ায় জীবনটা তাঁর কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তোমার শত্রুতা আমাকেও আনন্দ দেয় কিনা, আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। আমি যে দ্বিতীয় পদক্ষেপটা নিতে যাচ্ছি, সত্যি সেটা দারুণ দর্শনীয় একটা ব্যাপার হবে। আমি চাই সেটা তুমি চাক্ষুষ করো। শত্রুকে আমি খেপিয়ে তুলতে ভালবাসি।'

'আপাতত বিদায়, মি. রানা,' দরজার কাছ থেকে বলল নকভি।

'হ্যাঁ, বিদায়,' দরজার দিকে পিছু হটছে কবির। 'তবে আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

রানা স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। হিসেবে ভুল হয়ে গেছে ওর, সেজন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না। আবার, খায়রুল কবিরের মত প্রফেশনাল ক্রিমিনাল সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাকে বা শারমিনকে খুন না করে ফিরে যাচ্ছে, এটাও বিশ্বাস করতে পারছে না।

বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। রানা জানে চিৎকার করে বা দরজা

ভাঙার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, কারণ তিনতলায় এখন শুধু কবিরের লোকজনই আছে। খোলা জানালার সামনে চলে এল ও, উঁকি দিয়ে দেখল গাড়ি-বারান্দার ছাদে নামার কোন উপায় আছে কিনা। এদিকে পানির পাইপ নেই। তাছাড়া, জানালার কাঠের ফ্রেমে মোটা লোহার রডগুলো গভীরভাবে গাঁথা, টান দিয়ে বাঁকা করা বা খুলে আনা সম্ভব নয়।

ক্লাবের গেটের দিকে তাকাল রানা। ওখানে বেশ কয়েকটা গাড়ি আটকে রাখা হয়েছিল, কবিরের সিকিউরিটি গার্ডরা সেগুলোকে এখন বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে। বিশ-বাইশটা গাড়িকে ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখল ও, তার মধ্যে একাধিক পাজেরো জীপও আছে। এরপর গাড়ি-বারান্দা থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে এগোল একটা মার্সিডিজ আর একটা পাজেরো। দ্রুত কেটে পড়ছে কবির। কিন্তু পাজেরো একটা কেন? দ্বিতীয়টা কি আগেই বেরিয়ে গেছে?

জানালার কাছ থেকে সরে এসে দরজায় লাথি মারল রানা, সেই সঙ্গে চিৎকার করে ক্লাব গার্ডদের ডাকছে। গোটা ক্লাবে ভৌতিক একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। শারমিনকে নিয়ে ওরা কি করেছে, ভাবতে গিয়ে কাঁটা দিচ্ছে শরীরে।

দরজা ভাঙা সম্ভব নয়, কাজেই আবার জানালার সামনে চলে এল রানা। গেটে দু'জন গার্ডকে দেখা যাচ্ছে। কয়েকবার চিৎকার করেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলো ও। সন্দেহ হলো, গার্ডরা ইচ্ছে করে এদিকে তাকাচ্ছে না। জানালার দিকে পিছন ফিরে কামরাটার কোথায় কি আছে দ্রুত দেখে নিল একবার। জানালা দিয়ে নিচে ছুঁড়ে মারার মত অনেক জিনিসই আছে। প্রথমে টি-পট, কাপ আর পিরিচ ছুঁড়ল। গাড়ি-বারান্দার ছাদ পার হয়ে লনের মাঝখানে, পাকা রাস্তার ওপর পড়ল সেগুলো। এরপর ছুঁড়ল একজোড়া ফ্লাওয়ার ভাস। কোন কাজ হচ্ছে না। নিচু একটা টেবিল থেকে গ্লাস টপটা তুলে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল গাড়ি-বারান্দার ছাদে। কাচ ভাঙার আওয়াজটা রাতের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিল।

এতক্ষণে, যেন বাধ্য হয়েই, গেটের একজন গার্ড ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এদিকে।

'টাকা খেয়ে কানে তুলো দিয়েছ, না?' চিৎকার করল রানা। 'দাঁড়াও, সব ক'টাকে হাতকড়া পরাচ্ছি!'

পাকা রাস্তা ধরে ছুটে আসছে একজন গার্ড। নতুনই হবে, আগে কখনও দেখেছে বলে মনে হলো না। কবির তার দলবল নিয়ে চলে যাবার পর ইতিমধ্যে বারো কি তেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। গার্ড দরজা খুলল আরও দু'মিনিট পর। কথা না বলে হাতজোড় করে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। হাতে সময় নেই, রানা তাকে মাত্র দু'একটা প্রশ্ন করল। ছ'জন গার্ডের মধ্যে চারজনকেই মোটা টাকা বকশিশ দিয়ে আজ রাতের মত ডিউটি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বিদেশী মেহমান অর্থাৎ কবির চৌধুরী। বাকি দু'জনকেও বকশিশ দিয়ে বলে গেছে, ঠিক আধ ঘণ্টা পর তিনতলার তিন নম্বর স্যুইটের দরজা খুলে দিতে হবে, তার আগে নয়। গার্ডের

জানামতে, বিদেশী মেহমান তার লোকজনকে নিয়ে চলে গেছেন, কিন্তু কোথায় গেছে সে-সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এল রানা। কামরার নম্বরটা ভোলেনি ও—এ/ফাইভ। অফিস, অনুসন্ধান বা করিডরের কেউ নেই। এ/ফাইভ-এর দরজা সামান্য খোলা, রুম সার্ভিসের একটা ট্রলি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। দরজাটা পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা, 'শারমিন, তুমি…'

'দরজা বন্ধ করুন, জনাব।' একটা অটোমেটিক পিস্তলের কালো মাজলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, সেটা ডান হাতে ধরে আছে অপরিচিত এক লোক।

কামরার আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে নঈম খান। তার ডান হাতে ব্যান্ডেজ, তবে ওই হাতেই ছোট একটা পয়েন্ট টু-টু বেরেটা ধরে আছে সে। আর অক্ষত হাত দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে শারমিনের ঘাড়।

'বোকার মত কিছু করবেন না, জনাব,' বলল লোকটা। 'সাচ পুছিয়ে তো, আপনাদের দু'জনকে আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বস্ আসলে আমাদের একটা আবদার রক্ষা করেছেন। আঘাত পেলে পাল্টা আঘাত করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য, আর এই গুণটার জন্যেই আমরা বসের নওকর হতে পেরেছি। জরুরী একটা তলব পেয়ে চলে যেতে হয়েছে, তা না হলে বস্ আর ম্যাডামের দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আমরা আপনাদের নিয়ে কি করি। নকভি সাহাব আর কাসিম সাহাবও থাকতে পারলেন না বলে খুব আফসোস করলেন।'

দুই

রানা এক চুল নড়ছে না। হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লে কতটুকু ঝুঁকি নেয়া হয় হিসেব করছে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওর পিছনে চলে এল লোকটা, দরজাটা বন্ধ করে দিল। পরমুহূর্তে অটোমেটিকের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল রানা ঘাড়ের ওপর। সামনের টেবিলটা উল্টে দেয়ার প্ল্যান বাতিল করতে হলো।

'এখন আমরা ছোটা এক সফরে বের হব, জনাব,' সে যে বাংলা জানে তা প্রমাণ করার জন্যে জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলছে লোকটা। 'ধরে লিন পিকনিকে যাচ্ছেন।'

'শুধু আমাকে নিয়ে চলো,' রানার ভারী গলা বদ্ধ ঘরে গম গম করে উঠল। 'শারমিনকে ছেড়ে দাও।'

'বহুত খুব! লা জওয়াব!' নঈম খান সামান্য নড়ে উঠল, শারমিনের ঘাড়ে আরও একটু সেঁধিয়ে গেল পিস্তলের মাজল। 'আজকাল এরকম বাহাদুর আদমি দেখাই যায় না। বাট, আফসোস! আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করা মুমকিন নেহি,' প্রথম লোকটার দেখাদেখি নঈমও বিকৃত ভাষা ব্যবহার করছে, বলতে চাইছে রানার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

রানার পিছন থেকে লোকটা বলল, 'আমার দোস্ত নঈম খান আপনার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে সামনে থাকবে, আপনাকে নিয়ে আমি থাকব নও-দশ হাত পিছে। কেউ আপনাদের মদদ করবে না, বিকজ ক্লাব বিল্ডিং থেকে সব সালাকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্লাব থেকে বেরিয়ে গাড়িতে সওয়ার হব আমরা। দু'জনের একজনও যদি বেতমীজি করেন, শির নেহি তো সিনায় গোলি করা হোবে।'

'কিন্তু তোমাদের বস্ তো বলে গেল আমাদেরকে চলে যেতে দেয়া হবে...'

'সাচ,' বাধা দিয়ে বলল লোকটা। 'বাট, বস্ আমাদের আবদার ফেলতে পারলেন না। তখন কি বললাম? কেউ আমাদের জখম করলে আমরা তাকে পাল্টা জখম করি।'

'কিন্তু আমরা যদি তোমাদের সঙ্গে যেতে না চাই?'

'দুটো রাস্তা খোলা আছে, জনাব,' বলল নঈম। 'হয় আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যাবেন, তা না হলে বান্ধবীকে নিয়ে জাহান্নামে।' ডান হাতে ধরা পিস্তলটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আরও ভাল করে মুঠোয় ভরতে চেষ্টা করল সে। 'নেহি, জনাব, নেহি!' রানা আহত হাতটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সাবধান করে দিল, শারমিনকে নিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। 'লাফিয়ে পড়ার চিন্তা করে থাকলে ভুলে যান। আপনি নড়লেই ওর খুলি উড়িয়ে দেব। রিজভিও সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।'

'মাসুদ ভাই, প্লীজ, কোন ঝুঁকি নেবেন না,' শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে বলল শারমিন। সে খুব একটা ভয় পায়নি দেখে মনে মনে প্রশংসা করল রানা। 'বুঝতে পারছেন না, ওরা খুন করার অজুহাত খুঁজছে।'

'ঘুরুন,' নির্দেশ দিল রিজভি। 'একপাশে সরে আসুন। আমার দোস্ত মেয়েটাকে নিয়ে কামরা থেকে আগে বেরিয়ে যাক, তারপর আমরা বেরুব।'

শারমিনকে নিয়ে নঈম কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পনেরো সেকেন্ড পর রানাকে নিয়ে বেরুল রিজভি। করিডর ফাঁকা, দু'পাশের কয়েকটা দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, লবিতেও কাউকে দেখা গেল না। গাড়ি-বারান্দায় একটা মাত্র গাড়ি—নীল পাজেরো জীপ। ড্রাইভার স্টার্ট দিয়েই রেখেছে, ওরা উঠে বসতেই ছেড়ে দিল। চারজনই ওরা পিছনের সীটে বসেছে, রানা আর শারমিন পাশাপাশি, দুই প্রান্তে রিজভি আর নঈম।

'সাব কুছ ঠিক হ্যায়?' ক্লাব থেকে নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এসে জানতে চাইল ড্রাইভার, যদিও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল না।

'সাব ঠিক,' জবাব দিল রিজভি।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। এখনও আটটা বাজেনি। তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন, আজ আর ওর ঢাকায় ফেরা হচ্ছে না। এ-যাত্রা যদি প্রাণে বাঁচে, ঢাকায় ফিরলে বসের কড়া ধমক খেতে হবে। ছুটির দিনেও অফিসকে না জানিয়ে ঢাকার বাইরে যাওয়া নিষেধ। হঠাৎ মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিল। 'ডেইলি রিপোর্ট কখন পাঠাও?' শারমিনকে জিজ্ঞেস করল ও।

'খবরদার!' গর্জে উঠল রিজভি। 'একদম চুপ!'

'আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল শারমিন, ধমকটা গ্রাহ্য করল না। 'নিশ্চয়ই আটটা বাজে?'

শারমিনের গলায় পিস্তল চেপে ধরল নঈম। 'ফির?'

জবাবটা পেয়ে গেছে রানা। বিসিআই হেডকোয়ার্টারে শারমিন রাত আটটায় দৈনিক রিপোর্ট পাঠায়। আজ ওর রিপোর্ট না পেলে ডিউটি অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সতর্ক করে দেবে—এক্ষেত্রে সম্ভবত চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সোহেল আহমেদকে। সোয়া আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সোহেল, তারপর নিজেই শারমিনের নম্বরে ফোন করবে, অফিস আর বাড়ির নম্বরে। শারমিনকে পাবে না, না পেয়ে ফোন করবে প্রণবকে। তাকেও পাবে না। সাড়ে আটটায় রানা এজেন্সির চট্টগ্রাম শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করবে সে। দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে শারমিনের অফিস, বাড়ি আর ক্লাবে পৌঁছে যাবে রানা এজেন্সির অপারেটররা। কি ঘটেছে বিস্তারিত রিপোর্ট করা হবে সোহেলকে ন'টার মধ্যে।

ঢাকা থেকে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করবে সোহেল। রানা এজেন্সির এক দল অপারেটর ক্লাব কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের জেরা করবে, আরেক দল রানা আর শারমিনের খোঁজে ছড়িয়ে পড়বে শহরে, জানতে চেষ্টা করবে মার্সিডিজ আর পাজেরো জীপ দুটো কোন দিকে গেছে।

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। খায়রুল কবিরের লোকেরা ওদের চোখ বাঁধেনি। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও, যদিও রাস্তাটা চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। শহর ছাড়িয়ে আসার পর ঘণ্টায় সত্তর মাইল স্পীডে কক্সবাজারের দিকে ছুটছে পাজেরো। 'এ-কথা ভাবছ না যে রাস্তাটা আমরা চিনে রাখছি?'

'ওয়ান ওয়ে জার্নি,' বলল নঈম। 'চিনলেও ক্ষতি নেই।'

'কথাটা না জানালেও পারতে, দোস্ত,' তিরস্কার করল রিজভি। 'ওরা কাপড় নষ্ট করলে পাজেরো নাপাক হয়ে যাবে।'

দু'পাশে জঙ্গল শুরু হয়েছে, বাড়ি-ঘর খুবই কম। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রোডে রাতে ডাকাতি হয়, সেজন্যেই বোধহয় অনেকক্ষণ পরপর দু'একটা ট্রাক বা বাস দেখা যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা কোন কথা হলো না। ড্রাইভার লোকটাও সম্ভবত পাকিস্তানী, তাসত্ত্বেও এদিকের রাস্তা-ঘাট ভালই চেনে সে। কাসিম বা নঈমকে কিছু বলে দিতে হলো না, মেইন রোড ছেড়ে বাম দিকে বাঁক নিল। নতুন রাস্তাটা পীচ ঢালা, এঁকেবেঁকে বহুদূর এগিয়েছে। এখন আর রানা বুঝতে পারছে না কোথায় যাচ্ছে ওরা, তবে সময়ের একটা হিসাব রাখছে। রওনা হবার পর দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। শুরু হলো ইঁট বিছানো রাস্তা, পাজেরোর গতি কমল। এক দেড় মাইল পরপর বাঁক নিল গাড়ি। মাইল দশেক এভাবে এগোবার পর মেটো পথ শুরু হলো, গতি আরও কমল। আকাশে চাঁদ নেই, তবে তারার মেলা বসেছে। আকাশের গায়ে উটের কুঁজ দেখে পাহাড়গুলো চিনতে পারল রানা। এদিকে আগে কখনও এসেছে বলে স্মরণ

করতে পারল না। বিস্মিত হলো পাহাড়ের ওপর বাড়ি-ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলতে দেখে। পথের পাশে লাইটপোস্ট আছে, তবে কোনটাতেই আলো জ্বলছে না। একপাশে টেলিফোনের তারও ঝুলতে দেখল।

এদিকে খেত-খামার নেই, শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। গাড়ির ভেতর অন্ধকার, শারমিন রানার একটা হাত চেপে ধরেছে। পাল্টা একটু চাপ দিয়ে তাকে অভয় দিল রানা। নির্জন কোথাও নিয়ে এসে ওদেরকে মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে কাজটা আগেই সেরে ফেলত ওরা, পিছনে সেরকম জায়গা অনেকগুলো ফেলে এসেছে। হয়তো গুলিই করবে, তবে নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে পৌঁছুবার পর। সেখানে হয়তো লাশ লুকানোর ভাল ব্যবস্থা আছে।

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। দশটা বাজতে চলেছে। কোন সন্দেহ নেই, রানা এজেন্সির অপারেটররা ইতিমধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে তারা। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে চার্টার করা প্লেন বা সামরিক হেলিকপ্টার নিয়ে সোহেল নিজেও চলে আসতে পারে চট্টগ্রামে। অপারেটররা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খুঁজে বের করে ফেলেছে প্রণবকে। ক্লাব কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের জেরা করছে তারা। শেষ পাজেরোতে রানা আর শারমিনকে তোলা হয়েছে, এই তথ্য পাবার পর একটা দল গাড়িটার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। শহর থেকে বেরুবার সময় অনেকের চোখেই ধরা পড়েছে জীপটা, প্রশ্ন করা হলে তারা বলতে পারবে কোনদিকে যেতে দেখেছে।

নিজেদের কাজে রানা এজেন্সির অপারেটররা অত্যন্ত দক্ষ, তবু রানা জানে ওদেরকে খুঁজে বের করাটা সহজ কাজ হবে না। মেইন রোডে যানবাহন খুব কমই ছিল, কেউ ওদেরকে বাম দিকে বাঁক নিতে দেখেনি—বিশেষ করে ওই সময়টায় রাস্তায় কোন লোকজন বা যানবাহন ছিল না, এমনকি কোন বাড়ি-ঘরও রানার চোখে পড়েনি। বাঁক নেয়ার পরও দু'বার তিন রাস্তার মোড় পেয়েছে ওরা। ইঁট বিছানো রাস্তাটা বিভিন্ন শাখা বিস্তার করে নানা দিকে চলে গেছে। মেঠো পথটাও নিঃসঙ্গ নয়, ডানে-বাঁয়ে অনেক বাহু। মিছে আশা করছে ও, এজেন্সির ছেলেরা ওদেরকে আজ রাতে অন্তত খুঁজে বের করতে পারবে না।

দুই পাহাড়ের মাঝখানে হেডলাইটের আলো পড়তে একটা কাঁটাতারের দীর্ঘ বেড়া আর লোহার গেট দেখতে পেল রানা। চারদিকে শুধুই জঙ্গল, কোন বাড়ি-ঘর নেই। গেটের ভেতর সরু একটা পথ থাকলেও, পথের দু'পাশেও পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে ঘন গাছপালা। খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল পাজেরো, দু'পাশের ডালপালা গাড়ির গায়ে ঘষা খাচ্ছে। আরও প্রায় তিন মিনিট ছুটল জীপ। তারপর হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিশাল এক পোড়োবাড়ি।

বাড়িটা সম্ভবত কয়েকশো বছরের পুরানো। গোটা কাঠামো থেকে চুন-সুরকির সমস্ত প্লাস্টার কবেই খসে পড়েছে, সারা গায়ে খুদে আকৃতির লালচে ইঁট, তা-ও ক্ষতবিক্ষত। বাড়ির মাথার দিকটা ভাঙা। তিনতলার ছাদটা সম্ভবত

সবটুকুই ধসে পড়েছে। তবে দোতলায় জানালা দরজা আছে, সব ক'টা বন্ধ। উঠানটা আগাছায় ভর্তি।

বাড়িটার সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। হেডলাইটটা ঘন ঘন দু'তিনবার জ্বালল-নিভাল সে। বাড়ির একতলার বারান্দা থেকে টর্চ জ্বেলে কেউ একজন সঙ্কেত দিল।

কখন কি করতে হবে সবই আগে থেকে ঠিক করা আছে ওদের। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল পাজেরোর ভেতর। ড্রাইভার শরীর মুচড়ে পিছন দিকে ঘুরল, হাতের রিভলভার তাক করল রানার দু'চোখের মাঝখানে। 'হুঁশিয়ার!'

চোখের পলকে রানা আর শারমিনের একটা করে হাত খপ করে ধরে এক করল রিজভি, এক করা হাত দুটোয় দ্রুত একটা হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল নঈম। 'আমরা পৌঁছে গেছি। নামুন এবার।'

ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে থাকল ওরা। গাড়ি থেকে নিচে নামতেই পাহাড়ী শীতে কাঁপ ধরে গেল শরীরে। আকাশে কখন যেন মেঘ জমেছে, বাতাসে বৃষ্টির আভাস। ইতিমধ্যে ড্রাইভারও নেমে পড়েছে, বারান্দায় উঠে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সে।

'এই নির্জন জঙ্গলের ভেতর মেয়ে!' ফিসফিস করল শারমিন। রানাও শুনতে পাচ্ছে, একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে ড্রাইভার।

শারমিনের কথা শেষ হতেই বারান্দা থেকে বড় আকৃতির একটা ইলেকট্রিক টর্চ জ্বলে উঠল। মেয়েটাই জ্বেলেছে। তার অপর হাতে একটা হেলমেট। ওটা মাথায় থাকলে তাকে মেয়ে বলে চেনাই যেত না। লম্বা-চওড়া গড়ন, পরনে জিনস, গায়ে লেদার জ্যাকেট। বারান্দা থেকে ড্রাইভার বলল, 'চিন্তার কিছু নেই, দোস্ত। ফিরোজা সঙ্গে করে খাবার আর পানি নিয়ে এসেছে।'

রিজভি আর নঈম রানা আর শারমিনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। 'মোটরসাইকেলটা দেখছি না যে?'

বারান্দা থেকে ফিরোজা জবাব দিল, 'পিছন দিকে।' তারপর বলল, 'তোমরা পৌঁছুতে দেরি করছ দেখে আমার চিন্তা হচ্ছিল।'

'একা একটা মেয়ে এই পাহাড়ী এলাকায়...'

শারমিনকে থামিয়ে দিয়ে রিজভি বলল, 'ঢাকার জেনেভা ক্যাম্পের নাম শুনেছেন? পাকিস্তান দো-টুকরা হবার পর যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরতে চেয়েছিল তাদেরকে ওই ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। ফিরোজা ওই ক্যাম্পের লেডি মাস্তান। হিন্দুস্থান হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও আসা-যাওয়া করে। কওমী মুভমেন্টের নাম তো নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, ফিরোজা ওই পলিটিকাল পার্টির একজন ক্যাডার, করাচীতে বোমা ফাটিয়ে বহুত নাম কিনেছে। এবার বুঝে লিন কেন ফিরোজা এখানে একা আসতে ভয় পেল না।'

শারমিন হঠাৎ বলল, 'আমাকে বাথরুমে যেতে হবে।'

'নো প্রবলেম, তবে ফিরোজা আপনার সঙ্গে থাকবে,' বলল নঈম।

বাড়ির ভেতরটা একদম খালি. ইলেকট্রিসিটি নেই, ফার্নিচারও না থাকার

মত। প্রথম যে ঘরটায় ঢুকল ওরা সেটায় তিন-চারটে মোমবাতি জ্বলছে। ওদের হ্যান্ডকাফ খোলার সময় তিন পাকিস্তানীই খুব সতর্ক থাকল। দু'তিনটে খালি ঘরের ভেতর দিয়ে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হলো শারমিনকে। বাথরুমের দরজা নেই, তাই মোম না নিয়েই ভেতরে ঢুকল শারমিন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ফিরোজা, এখন তার হাতেও একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

কাঠের সিঁড়িটা প্রথম ঘর থেকেই উঠে গেছে। শারমিন ফিরে আসতে আবার হ্যান্ডকাফ পরানো হলো ওদেরকে। ফিরোজা পথ দেখাল, তার পিছনে থাকল রানা আর শারমিন, সবশেষে নঈম আর রিজভি। ড্রাইভার নিচতলায় থেকে গেল।

কাঠের সিঁড়ি ক্যাঁচক্যাঁচ করছে। দোতলায় না থেমে তিনতলায় উঠে এল ওরা। দোতলার ঘরগুলোকে পাশ কাটাবার সময় গুমোট আর ভ্যাপসা গন্ধ ঢুকল নাকে। অন্ধকার, ভেতরে কিছু আছে কিনা বোঝা গেল না। তিনতলার যে ঘরটায় ঢুকল ওরা সেটার ছাদ খসে পড়েনি। কোন ফার্নিচার নেই, শুধু বিরাট এক লোহার সিন্দুক পড়ে আছে এক কোণে। সিন্দুকটা এত বড় যে ঢাকনি তোলার জন্যে দুই প্রান্তে একটা করে আঙটা আকৃতির লোহার হাতল রাখতে হয়েছে। দুটো জানালা আর একটা দরজা, সবগুলোতেই কবাট আর গরাদ আছে। এবার ওদের দু'জনকে একটা করে আলাদা হ্যান্ডকাফ পরানো হলো। যার যার হ্যান্ডকাফের অপর অংশটা আটকে দেয়া হলো সিন্দুকের দুই হাতলের সঙ্গে। ঘরের মাঝখানে, ওদের নাগালের বাইরে, একটা এক ফুটা মোমবাতি জ্বেলে রেখে বেরিয়ে গেল সবাই। বাইরে থেকে দরজায় তালা দেয়ার শব্দ পেল ওরা।

দশ মিনিট পর তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ফিরোজা। এক বোতল মিনারেল ওয়াটার আর একজোড়া চিকেন বার্গার নিয়ে এসেছে। শারমিন তাকে ধন্যবাদ দিল, কিন্তু ফিরোজা কথা না বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আবার দরজায় তালা দেয়ার আওয়াজ পেল ওরা।

'আমাদের করণীয় কি, মাসুদ ভাই?' ফিসফিস করল শারমিন।

'হাতকড়া খুলতে না পারলে কিছুই করা সম্ভব নয়,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল শারমিন। 'সিন্দুকের হাতল এরইমধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছি। নিরেট লোহা।'

'আমারটা মরচে ধরা, কাজেই চেষ্টা করে দেখতে চাই।' খালি হাতটা দিয়ে সিন্দুকের হাতলটা স্পর্শ করল রানা।

'আপনার কি মনে হয়, ওরা আমাদেরকে খুন করবে? মানে, খায়রুল কবির কি ওদেরকে সেরকম কোন নির্দেশ দিয়েছে?'

'এখনও দেয়নি বলেই আমার ধারণা। ওরা সম্ভবত নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় আছে। তা না হলে এতক্ষণে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলত।'

'আপাতত স্বস্তিবোধ করছি।'

'নঈম আর রিজভি, দু'জনেই সাইকোপ্যাথ। খুন করা পেশা, নিজেদের পেশা নিয়ে গর্বিত।' সিন্দুকের হাতলে হ্যান্ডকাফটা মোচড়াচ্ছে ও, ডান হাত

বারবার ঘুরিয়ে ছোট্ট চেইনটা টান টান করে তুলছে। এক সময় হাতটা আর নাড়ার উপায় থাকল না। এবার বাম হাতটা কাজে লাগাল, ডান হাতের হ্যান্ডকাফে চাপ বাড়িয়ে পরীক্ষা করছে হাতলটা ভেঙে ফেলা যায় কিনা, কিংবা দুই কাফের মাঝখানের চেইন ছেঁড়া সম্ভব কিনা।

আধ ঘণ্টা পর থামল রানা। বোতল থেকে দু'ঢোক পানি খেলো, বার্গারেও কামড় দিল দু'বার। নিজেকে মিথ্যে আশ্বাস দিতে রাজি নয়, তবে সিন্দুকের হাতলটা স্টীল কাফ-এর চাপ খেয়ে সামান্য বেঁকে গেছে। কব্জি কেটে রক্ত গড়ালেও ব্যাপারটা গ্রাহ্য করছে না, মরচে ধরা লোহা হার মানছে বুঝতে পেরে উত্তেজিত।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করল রানা। নিচতলা থেকে অস্পষ্ট ভাবে তিনজন পুরুষ আর একটা মেয়ের গলা ভেসে আসছে মাঝে মধ্যে।

'গেটের দু'পাশে যতদূর চোখ যায়,' হঠাৎ বলল শারমিন, 'শুধু কাঁটাতারের বেড়া দেখেছি। বিরাট এলাকা জুড়ে এটা নিশ্চয়ই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আশপাশে আর কোন বাড়ি বা লোকবসতি আছে বলে মনে হয় না। ওদের আচরণ দেখেও মনে হচ্ছে, এটা সম্ভবত খায়রুল কবিরের একটা সেফ হাউস।'

'হতে পারে,' বলল রানা। তারপর শারমিনকে পরামর্শ দিল, 'চেষ্টা করে দেখো ঘুমাতে পারো কিনা।'

সিন্দুকের হাতলের ওপর কাজ করে যাচ্ছে রানা, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই। হাতে পরানো স্টীল কাফ-এর ঘষা আর চাপ দিয়ে লোহা বাঁকা করা হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ। অনেকক্ষণ ঘাম ঝরানোর পরও বোঝা গেল না আদৌ কোন অগ্রগতি হচ্ছে কিনা। খানিক পরই শারমিনের নাক ডাকার মৃদু আওয়াজ পেল রানা।

কাজ যতই ধীরগতিতে এগোক, হাল ছাড়তে রাজি নয় ও। কব্জির মাংস ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, ব্যথায় বিকৃত চেহারা এই হিম শীতের রাতেও চকচক করছে ঘামে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে সময় দেখার কোন আগ্রহ বোধ করছে না, কাজেই সময়ের হিসাবটা এক সময় ভুলে গেল। হ্যান্ডকাফের কঠিন ইস্পাতের চাপে হাতলটার মরচে মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আরও বাঁকা হচ্ছে। মিনিটগুলো ঘণ্টায় পরিণত হলো, ঘণ্টার সমষ্টি পরিণত হলো শেষ প্রহরে। হঠাৎ মট করে আওয়াজ করে ভেঙে গেল আঙটা আকৃতির হাতলটা। ধীরে ধীরে মুক্ত হাতটা পিছন থেকে সামনে নিয়ে এল রানা।

মোমবাতিটা গলে প্রায় শেষ, আলোটা নিভু নিভু। তবে খোলা জানালার বাইরে কালো আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে।

শারমিনকে মুক্ত করা আপাতত সম্ভব নয়। কব্জির চারধারে রক্তাক্ত ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। সারা রাত প্রায় একই ভঙ্গিতে মেঝেতে আড়ষ্ট আর টান টান হয়ে ছিল ও, ব্যথায় অবশ লাগছে শরীরটা। হাত আর পা ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে

কোন রকমে দাঁড়িয়েছে, এই সময় হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ল জানালায়। আওয়াজ শুনে মনে হলো নিচে, বাড়িটার সামনে, একটা গাড়ি থামল।

দেয়ালে হাত রেখে ধীরে ধীরে জানালার দিকে এগোল রানা। জানালার সামনে না দাঁড়িয়ে এক পাশ থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। সরাসরি নিচে বাড়ির সামনের দিকটা নয়, একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। মোটরসাইকেল, পাজেরো বা সদ্য আসা গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। তবে নিচতলার যে ঘরে ওরা রয়েছে সেটা সম্ভবত সরাসরি ওর নিচে, প্রায় সবারই গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কি নিয়ে যেন তর্ক করছে ওরা।

রিজভির গলা বেশ চড়া, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রানা। 'কিন্তু ওদেরকে বাঁচিয়ে রেখে যাওয়াটা একদম উচিত হবে না!'

কর্তৃত্বের সুরে কেউ একজন জবাব দিল, 'উচিত হবে কি হবে না, সেটা আমরা বুঝব। আমাদের নেতা এখুনি আর কারও হাতে রক্ত দেখতে চান না। আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ।' পুরোপুরি নিশ্চিত নয় রানা, তবে সন্দেহ হলো গলাটা খায়রুল কবিরের স্টাফ ম্যানেজার ওয়াসিম নকভির।

'কিন্তু জনাব, শত্রুর জড় রাখতে নেই,' প্রতিবাদের সুরে বলল নঈম।

'তোমরা দানব হয়ে গেছ! তোমাদেরকে খুনের নেশায় পেয়েছে! যা বলছি শোনো—যাও, গাড়িতে ওঠো!'

'আমি দানব নই। আমাকে খুনের নেশাতেও পায়নি,' বলল নঈম, 'মহামান্য লীডার সরাসরি মানা না করলে আপনার হুকুম আমি শুনছি না। রিজভি, এসো আমার সঙ্গে। তিনতলায় উঠে ওদের দু'জনকে খতম করে দিয়ে আসি।' একটা ঢোক গিলল রানা, নঈমকে সত্যি খুনের নেশায় পেয়েছে।

রিজভি ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু লীডার কি বলেন শোনা দরকার না?'

এবার নতুন একটা গলা ভেসে এল রানার কানে, যেন অনেকটা দূর থেকে। 'গাড়িতে এসো তোমরা। আমার সঙ্গে কথা বলো।' পুরোপুরি নিশ্চিত নয় ও, তবে গলার আওয়াজটা খায়রুল কবিরের বলে সন্দেহ করল।

আর কোন কথা হচ্ছে না। একটু পরই গাড়ি স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ ভেসে এল। প্রথমে স্টার্ট নিল মোটরসাইকেল, তারপর পাজেরো, সবশেষে আরেকটা গাড়ি। আরও একটু পর গাছপালার আড়ালে ওগুলোর হেডলাইটও দেখতে পেল রানা। চলে যাচ্ছে ওরা।

জানালার পাশে আরও তিন মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, কান পেতে আছে। কোন নড়াচড়া বা আওয়াজ পেল না। সম্ভবত কেউ রয়ে যায়নি, সবাই চলে গেছে।

'শারমিন,' নরম সুরে ডাকল রানা। 'শারমিন। ওরা চলে গেছে...'

'আপনিও নিজেকে মুক্ত করেছেন। হ্যাঁ, ওদের চলে যাবার আওয়াজ পেলাম। কি ঘটছে, মাসুদ ভাই।'

'এখনও জানি না কি ঘটছে, তবে আমরা বেঁচে আছি। নিচে থেকে ঘুরে আসি দেখি ওরা কাউকে রেখে গেছে কিনা।'

'মাসুদ ভাই, আমার দিকে তাকান,' বলল শারমিন। 'দেয়াল আলমিরায় কি বলুন তো ওটা? বাড়িটায় ইলেকট্রিসিটি নেই, তাহলে ওয়্যারিং কেন?'

শারমিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার পাশে কবাটবিহীন দেয়াল আলমিরার দিকে তাকাল রানা। কাঠের একটা শেলফে প্লাস্টিক শীট দিয়ে ঢাকা কি যেন রয়েছে। আলমিরার ওপর, ছাদের কাছাকাছি, ওয়্যারিংও চোখে পড়ল—ঘরের মাঝখানে একটা নগ্ন বালবও জ্বলছে।

এগিয়ে এসে শেলফের সামনে দাঁড়াল রানা। প্লাস্টিক শীটটা সরাতেই একটা টেলিফোন সেট বেরিয়ে পড়ল। তবে শুধু সেটই, ওটা থেকে কোন তার বেরোয়নি। সুইচ টিপতে বালবটা অবশ্য জ্বলে উঠল। 'তারমানে কেউ দেখে ফেলার ভয়ে আলো জ্বালেনি ওরা।'

'সেক্ষেত্রে আশপাশের পাহাড়ে লোকজন আছে, সাহায্য পাওয়া যেতে পারে,' বলল শারমিন।

'আগে আমি নিচটা দেখে আসি।' পুরানো দরজা, তিন-চারটে লাথি মারতেই ভেঙে পড়ল। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে চলে এল রানা, বালব আর সুইচ দেখলে আলো জ্বালল। সিঁড়িটা অন্ধকার, নামার সময় কোন শব্দ করছে না। নিচে নেমে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, কান পেতে আছে। ভোরের আলো উজ্জ্বল হতে সময় নিচ্ছে। কোথাও কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই। ঘরটার এক ধারে একটা দেয়াল আলমিরা, সেটারও কবাট নেই। দুটো শেলফ, তার একটায় আরও এক সেট টেলিফোন, খানিকটা তার মেঝেতে ঝুলে আছে।

এগিয়ে এসে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল রানা। কিছুই আশা করছে না, তাই কানে ডায়াল টোন পেতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। নিজেকে কিছু চিন্তা করারও অবকাশ দিল না, রানা এজেন্সির চট্টগ্রাম শাখার নম্বরে ডায়াল করল।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ, জিজ্ঞেস করল, 'জরুরী কল আসবে, যা বলার তাড়াতাড়ি বলে কানেকশন কেটে দিন।'

পরম স্বস্তিবোধ করল রানা, অপরপ্রান্ত থেকে ওর প্রাণপ্রিয় বন্ধু সোহেল কথা বলছে। সরল একটা বাক্য আওড়ালেও, ওটা একটা কোড বা সঙ্কেত। অর্থাৎ সোহেল কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। নিজের পরিচয় দিতে হলে রানাকেও নির্দিষ্ট একটা বাক্য মুখস্থ বলতে হবে। 'আপনি কানেকশন কাটুন, আমি আবার ডায়াল করি।'

'রানা, তুই! কোথায় ছিলি? কেমন আছিস? শারমিন কোথায়?'

'বেঁচে আছি। শারমিন ভাল আছে। তবে কোথায় আছি জানি না। যতটুকু পারি রাস্তার বর্ণনা দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি লোক পাঠা।' দীর্ঘ বর্ণনা দেয়ার পর দম নিল রানা, তারপর বলল, 'এটা সম্ভবত খায়রুল কবিরের নিজস্ব সম্পত্তি, নিশ্চয়ই বেনামে কেনা। ওরা এই খানিক আগে এখান থেকে চলে গেল।'

'ওরা মানে?'

'খায়রুল কবির আর তার সঙ্গী-সাথীরা।'

'তুই সুস্থ তো?' গলার আওয়াজই বলে দেয় বিস্ময়ের একটা ধাক্কা

খেয়েছে সোহেল। 'প্রলাপ বকছিস কেন?'

'প্রলাপ বকছি? মানে? ঠাট্টা-ইয়ার্কি বাদ দিয়ে ফোন নম্বরটা ট্রেস করতে বল, নম্বরটা তো দিলামই।'

'ট্রেস করার নির্দেশ এরইমধ্যে দিয়েছি,' বলল সোহেল। 'শোন, ঠাট্টা করছি না। সত্যি তুই প্রলাপ বকছিস। খায়রুল কবির সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে খানিক আগে ওখান থেকে রওনা হয়েছে, এ স্রেফ অসম্ভব।'

'কেন?'

'কারণ,' ধীরে ধীরে বলল সোহেল, 'কাল রাতে চট্টগ্রাম থেকে পতেঙ্গায় যাবার পথে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওরা। লাশগুলো আমি নিজে দেখে এসেছি। খায়রুল কবির, ইশরাত জাহান আর ড্রাইভার।'

'তুই নিজের চোখে ওদের লাশ দেখেছিস?'

'হ্যাঁ, নিজের চোখে। সে এক বীভৎস দৃশ্য, রানা, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে লাশগুলো যে ওদেরই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

তিনতলা থেকে শারমিনের গলা ভেসে এল, 'মাসুদ ভাই, একা আমার ভয় করছে!'

তিন

'তারমানে, স্যার, অ্যাক্সিডেন্টটা কেউ ঘটতে দেখেনি?' ডেস্কে ছড়িয়ে থাকা বীভৎস ফটোগুলোর ওপর থেকে চোখ তুলে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের দিকে তাকাল রানা। জানালা গলে শেষ বিকেলের এক ফালি নিস্তেজ রোদ ঢুকেছে ভেতরে, ওর কাঁধ ছুঁয়ে নেমে এসেছে ডেস্কের ওপর।

রানা টেলিফোনে সোহেলের সঙ্গে কথা বলার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর রানা এজেন্সির কয়েকজন অপারেটর দুটো জীপ নিয়ে পৌঁছে যায়। ক্লাব গার্ডদের জিজ্ঞেস করে আগেই তারা জেনে নিয়েছিল নীল একটা পাজেরোয় তোলা হয়েছে রানা আর শারমিনকে। শহরের ট্রাফিক পুলিস আর কয়েকজন দোকানদার জানায়, নীল একটা পাজেরোকে শহর ছেড়ে কক্সবাজারের দিকে যেতে দেখেছে তারা। ওয়্যারলেসে সোহেল যখন রাস্তার বর্ণনা দিল, বাড়িটা থেকে মাত্র দশ-বারো মাইল দূরে ছিল ওরা।

শহরে ফিরিয়ে এনে রানা আর শারমিনকে প্রথমে একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়, ওখানে ওদের জন্যে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল সোহেল। রানার কব্জিতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়েছে। শারমিনের কোন চিকিৎসা দরকার হয়নি। ডাক্তার শুধু ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। ক্লিনিক থেকে একটা সেফ-হাউসে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে, হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করার পর প্রণব চাকমাকে আগেই সেখানে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল।

সন্ধের ফ্লাইটে সোহেলের সঙ্গে ঢাকায় ফিরে এসেছে রানা। তার আগে 'ইনভেস্টর'স ক্লাব'-এর কয়েকজন কর্মকর্তা, কর্মচারী আর গার্ডদের ইন্টারোগেট করে ওরা। তাদের মধ্যে সাতজন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের বিনিময়ে খায়রুল কবিরকে সাহায্য করেছে বলে স্বীকারোক্তি দেয়। সিআইডি পুলিস তাদেরকে কোর্টে চালান দিয়ে সাত দিনের রিমান্ড চেয়েছে।

প্লেনে ঢাকায় ফেরার পথে সোহেলের সঙ্গে কথা হলো রানার। বন্দী অবস্থায় যেমনটি কল্পনা করেছিল বাস্তবে ঘটেছেও ঠিক তাই। শারমিন আটটায় ডেইলি রিপোর্ট না করায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সোহেল, তারপর শারমিন আর প্রণবের অফিস ও বাসায় টেলিফোন করে। ওদের সাড়া না পেয়ে রানা এজেন্সির চট্টগ্রাম অফিসকে সতর্ক করে দেয় সে। ন'টার দিকে ঢাকায় রিপোর্ট পৌঁছায়, নীল একটা পাজেরো রানা আর শারমিনকে 'ইনভেস্টর'স ক্লাব' থেকে তুলে নিয়ে গেছে। সাদা মার্সিডিজ আর ক্রীম কালারের আরেকটা পাজেরোর কথাও ছিল রিপোর্টে, এ-ও জানানো হয় যে প্রণবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকা থেকে সোহেল নির্দেশ দেয়, প্রথমে রানা আর শারমিনকে উদ্ধার করতে হবে, অর্থাৎ নীল পাজেরোটাকে খুঁজে বের করাটাই সবচেয়ে জরুরী। হাসপাতালে খবর নিতে প্রণবের খোঁজ পাওয়া যায়, রোড অ্যাক্সিডেন্টে তার পায়ের হাড় ভেঙে গেছে, রাস্তা থেকে তুলে কয়েকজন লোক তাকে হাসপাতালে রেখে আসে। সম্ভবত এই লোকগুলোই হাসপাতালে আনার পথে তাকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, ফলে সারারাত তার আর ঘুম ভাঙেনি।

রাত দশটায় চার্টার করা একটা প্লেন নিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে, রানা এজেন্সির শাখা অফিসে চলে আসে সোহেল। রাত দেড়টার দিকে প্রথম তথ্য আসে অফিসে—সাদা একটা মার্সিডিজকে পতেঙ্গার দিকে যেতে দেখা গেছে। অপারেটরদের একটা গ্রুপ জীপ নিয়ে রওনা হয় সেদিকে। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে মার্সিডিজ আর একটা অয়েল ট্যাঙ্কার দেখতে পায় ওরা, অ্যাক্সিডেন্ট করার পর দুটোতেই আগুন ধরে গেছে। দমকল কর্মীদের খবর দেয়া হয়, তারা এসে আগুন নেভায়। ক্রীম কালারের পাজেরোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে আসে রানা, শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়ে খাওয়া দাওয়া সারে, তারপর একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে দুপুরের দিকে অফিসে এসেছে।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে প্রচুর ফটো আর তথ্য এসে পৌঁছেছে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে। লাঞ্চের পর বসের চেম্বারে ডাক পড়ল রানার। অপরাধীর শুকনো মুখ নিয়ে, মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল রানা। টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন বস্, রানাকে দেখে ছোট করে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন শুধু। চেম্বারে আগেই পৌঁছেছে সোহেল, তার পাশের খালি চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বসল রানা।

আরও মিনিট দুয়েক কথা বলার পর ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন

রাহাত খান। রানার দিকে না তাকিয়ে সোহেলকে বললেন, 'ঘটনার সূত্রপাত কোত্থেকে হলো, ওকে একটা ধারণা দাও।'

প্রথমেই আবীর হাসান সম্পর্কে বলল সোহেল। অঙ্কশাস্ত্রে রীতিমত বিরল প্রতিভা, লন্ডনের একটা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে চার্টারড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছে। রাহাত খান তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, কারণ তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে সে। দিন দশেক আগে এই আবীর হাসান জার্মানীর বন থেকে রাহাত খানের বাড়িতে ফোন করে জানতে চায়, লাইনটা নিরাপদ কিনা। তারপর সে জানায়, প্রায় ছ'মাস হলো 'কে.কে. কানেকশন' নামে বিখ্যাত একটা কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে চাকরি করছে সে, সেই সূত্রে কোম্পানীর বিভিন্ন শাখায় আসা-যাওয়া করতে হয় তাকে—আজ প্যারিসে তো কাল স্টকহোমে। কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে তার চোখে। কে.কে. কানেকশন বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, প্রতিটি ব্যবসার আলাদা খাতা-পত্র আছে, কোন ব্যবসা থেকে কত আয় হচ্ছে সবই সে-সব খাতায় লেখা আছে। যেখান থেকে যত টাকা আসে সবই পাকিস্তানী একটা ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় জমা হয়। কিন্তু কে.কে. কানেকশনের একটা সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আছে। সেই অ্যাকাউন্টে যে টাকা জমা হচ্ছে তা পাকিস্তানী ব্যাংকে জমা করা টাকার চেয়ে প্রায় বিশ গুণ বেশি। স্বভাবতই হাসানের মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোত্থেকে আসছে। সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব এবং সেখানে জমা হওয়া টাকার পরিমাণ কোম্পানীর অন্য কোন কর্মচারীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়, হাসান চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলেই জানার সুযোগ পেয়েছে। এ-ব্যাপারে কাউকে কোন প্রশ্ন না করে গোপনে খবর নিতে শুরু করে সে। ধীরে ধীরে রহস্যটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর কে.কে. কানেকশনের অন্যতম ডিরেক্টর খায়রুল কবির নিজেও কথা প্রসঙ্গে তার এই আয়ের উৎস সম্পর্কে খানিকটা আভাস দেয় তাকে। আমদানি ও রফতানি ব্যবসার আড়ালে কে.কে. কানেকশন আসলে আর্মস আর ড্রাগস স্মাগলিং করছে। বিভিন্ন উৎস থেকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ সংগ্রহ করে সারা দুনিয়ার ক্রাইম সিন্ডিকেটে সাপ্লাই দেয়া হয়। বার্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, আফগানিস্তান আর কলম্বোয় পপি চাষ করে কে.কে. কানেকশন, বেশিরভাগই বিভিন্ন চোরাপথে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠানো হয়। এই দুই অবৈধ ব্যবসা থেকে যে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় হয় তা খরচ করা হচ্ছে পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক দলকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে। দলটির নাম রাখা হয়েছে 'ভাই ভাই পার্টি'। দলীয় মেনিফেস্টোর প্রথম দফায় বলা হয়েছে, মূল লক্ষ্য বাংলাদেশকে আবার পূর্ব-পাকিস্তান বানানো। আরেক দফায় বলা হয়েছে, মুসলিম প্রধান এলাকাগুলোকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহ যোগানো, প্রয়োজনে অস্ত্র আর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক অর্থাৎ গেরিলাবাহিনী পাঠিয়ে সাহায্য করা।

এরপর হাসান জানতে পারে কে.কে. কানেকশন বাংলাদেশে প্রচুর ড্রাগস

আর আর্মস পাঠাচ্ছে। এসব পাঠানো হয় কক্সবাজারের দুই বড় মাপের ব্যবসায়ীর নামে—গোলাম মাওলা ও কলিম চৌধুরী।

এ-সব জানার পর রীতিমত ঘাবড়ে যায় হাসান। কোম্পানীর অনেক গোপন তথ্য জেনে ফেলেছে সে, কাজেই এখন চাকরি ছেড়ে দিতে চাইলে স্রেফ খুন করা হবে তাকে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। প্রশ্ন হলো, এখন তার কি করা উচিত?

রাহাত খান তাকে দুটো প্রস্তাব দিলেন। প্রথম প্রস্তাবে বললেন, বিসিআই এজেন্টরা তাকে দুনিয়ার যে-কোন শহর থেকে তুলে এনে নিরাপদে ঢাকায় পৌঁছে দিতে পারে। উত্তরে হাসান জানাল, তাতে তার ক্যারিয়ারের ক্ষতি হবে। কে.কে. কানেকশন নামকরা কোম্পানী, সেই কোম্পানীর এত বড় একটা পদে থাকা অবস্থায় বিনা নোটিশে গায়েব হয়ে গেলে পরে অন্য কোন বড় বিদেশী কোম্পানীতে সে আর ঢুকতেই পারবে না। আর তাছাড়া, ঢাকা বা বাংলাদেশ তার জন্যে কতটা নিরাপদ তাও প্রশ্নসাপেক্ষ, কারণ—খায়রুল কবির ইচ্ছে করলেই তার নাগাল পেয়ে যাবে।

রাহাত খান তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বললেন, সেক্ষেত্রে চাকরি ছাড়ার দরকার নেই। বরং খায়রুল কবিরের আরও বিশ্বস্ত হবার চেষ্টা করুক সে। তাতে করে কোম্পানীর অবৈধ ব্যবসা সম্পর্কিত আরও অনেক গোপন তথ্য জানতে পারা যাবে। তবে হাসানকে তিনি বারবার সাবধান করে দিলেন, 'এমন কিছু ভুলেও করবে না যাতে তোমার ওপর সন্দেহ হয় ওদের। কোন রকম ঝুঁকি নেবে না। এমনকি নিরাপদ বলে মনে না হলে আমাকে ফোন করারও দরকার নেই।' তারপর তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমার সাহায্য ছাড়াই কে.কে. কানেকশন সম্পর্কে তদন্ত শুরু করবে বিসিআই, যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে খায়রুল কবিরের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে, তখন আর তোমার ভয় পাবার কোন কারণ থাকবে না।'

বারণ করা সত্ত্বেও গত তরশু অর্থাৎ শুক্রবার সকালে আবার রাহাত খানের বাড়িতে টেলিফোন করে আবীর হাসান। দ্রুত কয়েকটা তথ্য দিয়েই যোগাযোগ কেটে দেয় সে, এদিক থেকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। তথ্যগুলো ছিল —কে.কে. কানেকশনের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রজেক্টে টেন্ডার জমা ও কাজগুলো পাবার সুপারিশ করার জন্যে চট্টগ্রামে আসছে। ক'জন প্রতিনিধি আসছে, কোন পথে আসছে, তাদের সঙ্গে খায়রুল কবির থাকবে কিনা ইত্যাদি কিছুই সে জানাতে পারেনি। তবে জানায়, তার সন্দেহ যে শুধু টেন্ডারে অংশগ্রহণই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, কে.কে. কানেকশনের প্রতিনিধিরা মৌলবাদী কয়েকটা জঙ্গী সংগঠন আর রোহিঙ্গা গেরিলা গ্রুপগুলোর সঙ্গে আর্মস ও ড্রাগস বিক্রির চুক্তিও করবে।

টেলিফোন পেয়েই সোহেলকে সব কথা জানান রাহাত খান, সোহেল সেদিনই চট্টগ্রামে ফোন করে শারমিনকে সতর্ক করে দেয়।

রানার প্রশ্নের উত্তরে রাহাত খান বললেন, 'না, অ্যাক্সিডেন্ট কেউ নিজের চোখে ঘটতে দেখেনি। রাত দটোর ঘটনা, আশেপাশে কোন বাড়ি-ঘর নেই

অত রাতে রাস্তায় কারও থাকার কথাও নয়।'

সোহেল বলল, 'তোকে তো আগেই বলেছি, ট্যাংকারটায় পেট্রল ছিল। অ্যাক্সিডেন্টে সেটাই বিস্ফোরিত হয়। সম্ভবত দু'চার সেকেন্ডের মধ্যে আগুনে ঢাকা পড়ে যায় মার্সিডিজ।'

রঙিন ফটোগুলোর দিকে আবার তাকাল রানা। দুমড়েমুচড়ে, পুড়ে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা পেয়েছে মার্সিডিজটা, নাকটা ঢুকে গেছে ট্যাংকারের ক্যাব-এ। ট্যাংকারটারও একই অবস্থা, চ্যাপ্টা হয়ে আকারে ছোট হয়ে গেছে। সোহেল বলল, 'ছ'ঘণ্টা বন্ধ ছিল রাস্তাটা।'

আরেক সেট ফটোয় চারটে লাশ দেখা যাচ্ছে, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালে মর্গে ফেলে রাখা হয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অবশিষ্ট মাত্র, সনাক্তকরণের প্রশ্নই ওঠে না, প্রতিটি লাশ আড়ষ্ট বক্সার-এর ভঙ্গি নিয়ে আছে—পুড়ে মারা যাওয়া লাশ সব সময় এই রকমই দেখায়। একটা প্রমাণই শুধু স্পষ্ট, কালো স্তূপগুলোর মধ্যে তিনটে এক সময় পুরুষ ছিল, শেষটা ছিল নারী।

'আইডেনটিফিকেশন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডেন্টাল রেকর্ড তো আসলে শুধু থ্রিলার লেখকদের কাজে লাগে,' বলল সোহেল। 'আর তাছাড়া, পোড়া মানুষের দাঁত অক্ষত অবস্থায় পাওয়াও যায় না। তবে চারটে লাশেরই ডিএনএ টেস্ট করা হবে, টেস্টের জন্যে ব্যবহার করা হবে চুল, নখ ইত্যাদি। সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, রানা। কারণ প্রত্যেকের বাড়ি থেকে অক্ষত চুল আর নখ সংগ্রহ করতে হবে। নিরেট প্রমাণ পেতে এক দেড় মাস লেগে যেতে পারে। তবে মার্সিডিজের ভেতর থেকে একটা নেকলেস পাওয়া গেছে, সেটা ইশরাত জাহানের বলেই মনে হয়। দামী হীরে বসানো, এক ব্যারনেস-এর সম্পত্তি, তিনি মারা যাবার পর লন্ডনে ওটা নিলাম হয়। ফ্যাশন ম্যাগাজিনে ছবি সহ খবরটা ছাপা হয়, কেনার পর ওটা গলায় পরে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছিল ইশরাত। আর পাওয়া গেছে একটা রোলেক্স ঘড়ি, সম্ভবত কবিরের হাতে ছিল।'

'কিন্তু এই লাশগুলো ওদের হতে পারে না,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল রানা। 'কারণ কাল ভোরে খায়রুল কবিরের গলা শুনেছি আমি।'

'একই কথা বারবার বলছ তুমি,' রাহাত খান বললেন। 'ভাল করে ভেবে দেখো, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো?'

'খায়রুল কবিরের গলা চিনতে আমার ভুল যদি হয়ও,' বলল রানা, 'রিজভি, নঈম আর নকভির গলা স্পষ্টই শুনেছি। নিজেদের মধ্যে তখন তর্ক করছিল ওরা—নঈম আর রিজভি চাইছিল তিনতলায় উঠে আমাকে আর শারমিনকে খুন করবে, কিন্তু নকভি বলছিল তাদের লীডার এখুনি আর কারও হাতে রক্ত দেখতে চায় না। আর কারও হাতে রক্ত দেখতে চায় না, এর মানে কি? অর্থাৎ খানিক আগে রক্তপাত ঘটিয়েছে তারা। আমার প্রশ্ন, খায়রুল কবির খানিক আগে কাকে বা কাদেরকে খুন করল? তারপর নঈমের গলা পেলাম আমি। সে বলল. মহামান্য লীডার সরাসরি মানা করলে তবেই সে

আমাদেরকে খুন করবে না। রিজভিও তাকে সমর্থন করল। তারপরই একটু দূর থেকে নতুন একটা গলা শুনতে পেলাম—"গাড়িতে এসো তোমরা। আমার সঙ্গে কথা বলো"। গাড়িটা বা গাড়িতে বসা লোকটাকে আমি দেখতে পাইনি, ধরা যাক তার গলার আওয়াজও আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু বাক্য দুটোই তো বলে দেয় নির্দেশটা স্বয়ং খায়রুল কবিরের।'

রানা থামতেই ইন্টারকমের সুইচ অন করে কাকে যেন নির্দেশ দিলেন রাহাত খান, 'একটা টিভি আর ভিসিআর পাঠাও।'

টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের লোকজন যেন নির্দেশ পাবার অপেক্ষাতেই ছিল, এক মিনিটের মধ্যে হাজির হলো তারা। দেরাজ থেকে একটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে তাদের একজনের হাতে ধরিয়ে দিলেন রাহাত খান। তারপর রানাকে বললেন, 'ক্যাসেটের ছবি দেখে বলো, কাউকে তুমি চিনতে পারছ কিনা।'

সোহেল ব্যাখ্যা করল, 'ইনভেস্টর'স ক্লাব-এর লবিতে গোপনে একটা ভিডিও ক্যামেরা ফিট করা হয়েছিল কিছুদিন আগে, এমন কি শারমিন বা প্রণবকেও কথাটা জানানো হয়নি।'

ভিডিওর ছবিতে দেখা গেল দলবল নিয়ে ক্লাবের লবিতে ঢুকছে খায়রুল কবির। নকভিকে চিনতে পারল রানা। সালোয়ার কামিজ পরা একটা মেয়েকেও চিনতে পারল, মাথায় স্তূপ হয়ে আছে কালো সিল্কের মত চুল, দৈর্ঘ্য ও কাঠামো ইশরাতের সঙ্গে মেলে। ক্রীম কালারের পাজেরোর ড্রাইভারকেও চিনতে অসুবিধে হলো না, কালো স্যুট পরে আছে, কাঠামোর দৃঢ় আর ঋজু ভঙ্গি অ্যাথলেটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কাছ থেকে তোলা পরিষ্কার ছবি। ক্লাবে এদেরকে দূর থেকে দেখেছিল রানা, ফলে এদের পরিচয় জানা সত্ত্বেও চিনতে পারেনি, এখন পারছে। 'নীল সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটা আসমা, আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন ইনফর্মার,' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও। 'ঢাকার জেনেভা ক্যাম্পের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ওকে। আর কালো স্যুট পরা ড্রাইভার লোকটা আসমার স্বামী, জাহাঙ্গীর। সে-ও আমাদের ইনফর্মার। ওরা খায়রুল কবিরের সঙ্গে কি করছে?'

রাহাত খানের ইঙ্গিতে ভিসিআর আর টিভি নিয়ে টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো চেম্বার ছেড়ে চলে গেল। 'আমরা শুধু জানি গোলাম মাওলা ওদের দু'জনকে রিক্রুট করেছিল মাস ছয়েক আগে। নিয়মিত বেতন দিচ্ছিল, কিন্তু কোন কাজ করায়নি। তারপর হঠাৎ গত হপ্তায় চট্টগ্রামে ডেকে পাঠায় ওদেরকে। কথা ছিল স্বামী-স্ত্রীর অন্তত একজন নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে, কিন্তু রাখেনি—সম্ভবত কক্সবাজার হয়ে টেকনাফে চলে যেতে হয়েছিল ওদেরকে, যোগাযোগ করাটা নিরাপদ বলে মনে করেনি।'

রানা জানতে চাইল, 'খায়রুল কবির বাংলাদেশে কোন পথে ঢুকছিল, সেটা কি জানা গেছে?'

জবাব দিল সোহেল. 'কে.কে. কানেকশনের বেশিরভাগ অফিসার বৈধ

পাসপোর্ট নিয়ে একটা পাকিস্তানী জাহাজে চড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়। বন্দর থেকে ওরা টেকনাফ চলে গিয়েছিল। আমরা সন্দেহ করছি, খায়রুল কবির মায়ানমার থেকে নাফ নদী হয়ে বিনা পাসপোর্টে বাংলাদেশে আসে একটা ইয়ট নিয়ে। কোম্পানীর অফিসাররা টেকনাফে তার সঙ্গে মিলিত হয়, নতুন রিক্রুট হিসেবে আসমা আর জাহাঙ্গীরও ওখানে যায়। গোটা ব্যাপারটাই নিখুঁত একটা প্ল্যানের অংশ, রানা। জেনেভা ক্যাম্পে খায়রুল কবিরের অনেক ক্যাডার আছে, যেভাবেই হোক তারা আসমা আর জাহাঙ্গীরের আসল পরিচয় জেনে ফেলে।'

'তাহলে আমার ধারণাই সত্যি,' বলল রানা। 'খায়রুল কবির বা ইশরাত খুন হয়নি। লাশগুলো আসমা আর জাহাঙ্গীরের। আসমাকে ওরা চাকরানী হিসেবে রিক্রুট করেছিল, জাহাঙ্গীরকে ড্রাইভার হিসেবে। ওদেরকে খুন করে খায়রুল আর ইশরাত বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে! শুধু ওদেরকেই নয়, খায়রুল কবির আরও দু'জনকে খুন করেছে! তারা তার দলেরই লোক, হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এই সন্দেহ আগে থেকেই ছিল, প্রয়োজনের সময় মেরে ফেলেছে।'

এই সময় লাল একটা ফোন মৃদু শব্দে জ্যান্ত হয়ে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন রাহাত খান। কয়েক সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নিশ্চিত, মেসেজটা পিনহেড পাঠিয়েছে?...হ্যাঁ, এখুনি পাঠিয়ে দাও...না, তুমি নিজেই ওটা নিয়ে এসো, সঙ্গে একজন সশস্ত্র গার্ড রাখো।...ইয়েস, অফকোর্স, আই য়্যাম সিরিয়াস। আমাদের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিচের রিসেপশনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন, ওটা শুধু তাঁর হাতেই দেবে তুমি।'

ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে সোহেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'আবীর হোসেন আমার বাড়ির নম্বরে আরও একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। ফোনে রেকর্ডিং মেশিন ফিট করা আছে, অডিও ক্যাসেটে মেসেজটা রেকর্ড হয়ে গেছে। আমার এক ভাইপো নিয়ে আসছে ওটা।'

বিনাবাক্যব্যয়ে চেয়ার ছেড়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল সোহেল।

রাহাত খান একটা ফাইল টেনে নিয়ে পড়ায় মন দিলেন। অদ্ভুত এক ধরনের অসহায় বোধ গ্রাস করছে রানাকে। অফিসকে না জানিয়ে দু'দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে যে নিয়মটা ভেঙেছে ও, সেটা গুরুতর অপরাধের পর্যায়েই পড়ে। ফলে রানা সঙ্গত কারণেই ভয় পাচ্ছিল বস্ তাকে কড়া ধমক দেবেন। সেটা হজম করার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়েই চেম্বারে ঢুকেছে ও। সোহেলের সামনে অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটছে না দেখে মনে মনে বসের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। কিন্তু সোহেল চলে যাবার পরও বস্ কিছু বলছেন না। তাঁর আচরণই বলে দিচ্ছে, ওর প্রতি তিনি এক ধরনের অবহেলা দেখাচ্ছেন। মৌনব্রত অবলম্বন করে তিনি যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তুমি আর আমার প্রিয়পাত্র নও।

ধমক খেতে হচ্ছে না, সেজন্যে রানার খুশি হবার কথা, অথচ ঘটছে

উল্টোটা—নিজেকে অসহায় আর বঞ্চিত লাগছে ওর। একবার ভাবল প্রসঙ্গটা তুলে নিজেই ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু অদ্ভুত একটা অভিমান বাধা হয়ে দাঁড়াল।

শুধু ক্যাসেটটা নয়, সঙ্গে করে একটা রেকর্ড প্লেয়ারও নিয়ে এল সোহেল।

টেপ বাজতে শুরু করল।

'আমি পিনহেড,' আবীর হোসেনের গলা। 'জানি খুব বিপদের মধ্যে আছি, হাতে সময়ও খুব কম, কিন্তু মেসেজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে ফোনটা করতে হচ্ছে। আপনি হয়তো খবর নিয়েছেন আমাদের বন্ধু নটবর সিং মারা গেছেন। কিন্তু না, তিনি বা তাঁর স্ত্রী বেঁচে আছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে তুরস্কে রয়েছি। মাফ নদী থেকে রবিবারে একটা সী প্লেন আমাদেরকে তুলে নেয়, সেখান থেকে রেঙ্গুন এয়ারপোর্টে আসি আমরা, নটবর সিং-এর ব্যক্তিগত জেট প্লেনে চড়ে পাকিস্তান হয়ে তুরস্কে আসি। কোথায় কি ভুল করেছি জানি না, ওদের দু'জন লোক আমার ওপর নজর রাখছে। তবে ওদেরকে ফাঁকি দেয়াটা কঠিন নয়। টেলিফোনে বেশিক্ষণ কথা বলা সম্ভব নয়, তাই কোন তথ্যই আমি দিতে পারছি না। কিন্তু আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সব তথ্য রয়েছে। কাল বা পরশু আমরা স্পেনে চলে যাচ্ছি, উঠব সেভাইল শহরে, পাহাড়ের ওপর নটবর সিং-এর একটা ভিলায়। ঢাকা থেকে কাউকে পাঠানো সহজ কাজ নয়, তবু আমি চাই কেউ একজন এসে তথ্যগুলো সহ নিয়ে যাক আমাকে। আশা করছি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দু'একদিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে পারব। সবদিক চিন্তা করে পঁচিশ তারিখটা বেছে নিচ্ছি। ভিলা থেকে বেরিয়ে যেভাবে হোক ঠিক দুপুর একটায় জার্ডিনেস ডেল আলকাজার-এ পৌঁছুব আমি। পরনে জিনস, ডেনিম শার্ট আর জ্যাকেট থাকবে। পরিস্থিতি যদি নিরাপদ মনে হয়, আমার কাঁধে থাকবে স্ট্র্যাপ সহ কাপড়ের একটা ব্যাগ। পরিস্থিতি ঘোলাটে মনে হলে ব্যাগটা থাকবে বাম কাঁধে। আমার ইচ্ছে, আপনারা আমাকে একটা গাড়ি বা মোটরসাইকেলে তুলে নেবেন সান ফার্নান্ডো স্ট্রীট থেকে। যে-ই আসুক, তার হাতে যেন একটা ফাইন্যানশিয়াল টাইমস থাকে— ডান হাতে থাকলে মনে করব পরিস্থিতি নিরাপদ, বাম হাতে থাকলে ধরে নেব পরিস্থিতি অনিশ্চিত। আমাকে যদি আপনারা তুলে নিতে পারেন, তাহলে তো ভালই। কিন্তু যদি কোন ঝামেলা বা বিপদ দেখা দেয়, যে-কোন মূল্যে ব্যাগটা আপনারা নিজেদের দখলে নিতে চেষ্টা করবেন। যতটুকু জানতে পেরেছি, সেভাইলেও মাত্র দু'দিন থাকব আমরা, কাজেই ব্যাগ হস্তান্তর করার সুযোগ এই একবারই পাব আমি। নটবর সিং-এর ভিলা অর্থাৎ ঘাঁটিটা ঠিক কোথায় তা আমি আপনাদের জানাচ্ছি না, কারণ সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া ওই ঘাঁটির পতন ঘটানো সম্ভব নয়। ভিলায় দুনিয়ার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে রাখা হয়, প্রয়োজনে তাঁদেরকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। এই মুহূর্তে সেখানে অন্তত পাঁচটা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে অবস্থান করছে। আবার বলছি নটবর সিং-এর ব্যবসায়িক রহস্য জানতে হলে ব্যাগটা আপনাদের

হাতে পৌঁছুনো দরকার। পঁচিশ তারিখ। বেলা একটা। পিনহেড।'

রেকর্ডার অফ করল সোহেল। রাহাত খান রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কোন সাজেশন আছে, সেভাইলে কাকে পাঠানো যায়?'

রানা কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না, ইতস্তত করছে। এ-ধরনের পরামর্শ আগে কখনও তার কাছ থেকে চাওয়া হয়নি।

রাহাত খান আবার বললেন, 'তুমি নিজের নাম প্রস্তাব করছ না কেন? আমার তো ধারণা, বিসিআই-এর প্রথম সারির এগারোজন এজেন্টের মধ্যে বেড়ানোর শখ তোমারই সবচেয়ে বেশি।'

খোঁচাটা মুখ বুজে হজম করল রানা। তারপর বলল, 'কাকে পাঠানো হবে, সে প্রসঙ্গ আলোচনার আগে কি নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়, গলার আওয়াজটা আবীর হোসেনের কিনা, স্যার?'

'এ-ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে,' বললেন রাহাত খান। 'আবীর আমার বন্ধুর ছেলে, তার গলা আমি চিনি। তাছাড়া, মেসেজটায় কয়েকটা কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করছে সে, ওগুলো তারই শুধু জানার কথা।'

'নটবর সিং, পিনহেড ইত্যাদি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিন্তু স্যার, আবীরকে যদি অস্ত্রের মুখে মেসেজটা পাঠাতে বাধ্য করা হয়ে থাকে?'

'সে সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না,' সামান্য হলেও চিন্তিত দেখাল রাহাত খানকে। 'সেজন্যেই কি তুমি যেতে ভয় পাচ্ছ?'

শিরদাঁড়া খাড়া করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে রাখল রানা। 'ভয় আমি পাচ্ছি, তবে নিজের জন্যে নয়, স্যার। আমি ভয় পাচ্ছি হাসানের জন্যে। এই কাজে সে একেবারেই অ্যামেচার। বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছে।'

'হ্যাঁ, ছেলেটা খুব বিপদের মধ্যে আছে,' সায় দিলেন রাহাত খান। 'সেজন্যেই তাকে আমাদের সরিয়ে আনা দরকার। তাহলে তুমিই যাচ্ছ?'

বুড়া ব্যাটা সরাসরি হুকুম না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন? 'জ্বী,' বসকে খুশি করার জন্যে বলল রানা। 'আপনি যদি অনুমতি দেন।'

'একা তোমার যাওয়া চলবে না,' রাহাত খান বলবেন। 'বিশেষ করে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাচ্ছ যখন। সঙ্গে কাকে নিতে চাও?'

'সঙ্গে...'

'নিশ্চয়ই কোন মেয়ের কথা ভাবছ?' এটা রাহাত খানের আরেকটা খোঁচা, সরাসরি রানার চরিত্রের ওপর আক্রমণ বা স্যাবোটাজ।

মনে মনে রানা বলল, এতই যদি সন্দেহ আমাকে, আমার সঙ্গে নিজে গেলেই তো পারো।

রানা কিছু বলছে না দেখে রাহাত খানই আবার নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের প্রথম দায়িত্ব হাসানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে আমার বন্ধুর ছেলে বলেই নয় শুধু, তাকে না পেলে খায়রুল কবির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে কয়েক মাস লেগে যাবে আমাদের। তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি পাবভিনকে নিয়ে যাও। স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে

ওর ভাল সম্পর্ক আছে, সেভাইল শহরটাও চেনে সে।'

পারভিনকেই সঙ্গে নিতে বলে রাহাত খান আসলে রানাকে কঠিন একটা শাস্তি দিচ্ছেন। কোন মেয়েকে যদি দুর্ভেদ্য দুর্গ নামে অভিহিত করতে হয়, বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে একমাত্র পারভিনকেই বেছে নিতে হবে। রানার মত সুদর্শন পুরুষকে সে প্রশ্রয় দেয়, প্ররোচিত করে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে দেখলেই শামুকের মত গুটিয়ে নেয় নিজেকে—তার আত্মরক্ষার পদ্ধতিটা ভারি অদ্ভুত, নিজেকে বরফের একটা টুকরোয় পরিণত করে। সেটা খুব কাজেও দেয়।

চার

সেভাইল ফ্ল্যামেনকো স্কুলের মেয়েরা প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে মঞ্চের ওপর, তাদের বহুরঙা স্কার্ট নাচের তালে ফুলে ফুলে উঠছে। আলকাজার গার্ডেন-এর পঞ্চাশ গজ ভেতরে তৈরি করা হয়েছে মঞ্চটা। দু'জন গিটারিস্ট, তাদের গিটারে তোলা ঝঙ্কারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচছে চারটে মেয়ে। শীতের শেষদিকে এই নৃত্যানুষ্ঠান সেভাইলের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা উৎসব। মাঠের পিছন দিকে আলকাজার প্রাসাদ, আরও পিছনে প্রকাণ্ড ক্যাথেড্রাল, মঞ্চের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তবে সেদিকে কারও খেয়াল নেই, হাজার হাজার দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত টিনেজ ছাত্রীদের নাচ আর বিখ্যাত গিটারিস্টদের বাজনা শুনছে।

আলকাজার প্রাসাদের কাছাকাছি বিশাল এক তোরণ আছে, তাতে কয়েকটা লাইন খোদাই করা রয়েছে—'হারকিউলিস আমাকে তৈরি করে, কাইজার আমাকে পাঁচিল আর টাওয়ার দিয়ে বেঁধে রাখে, আর কিং সেইন্ট আমাকে দখল করে নেয়।' আজ পঁচিশ তারিখ, সকালেই একবার এখান থেকে ঘুরে গেছে রানা আর পারভিন। বলা যায় ক্যাথেড্রাল আর প্রাসাদের সৌন্দর্য শুধু চোখ দিয়ে নয়, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে পান করেছে ওরা। এই দুই স্থাপত্য কর্মে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম সভ্যতা অর্থাৎ মূর ঐতিহ্যের প্রতিফলন সহজেই চোখে পড়ে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা না হলেও, ইতিহাস-সচেতন দু'জনেই ওরা এ-ব্যাপারে মনে মনে গর্ব অনুভব করেছে।

দুপুরের আকাশ নির্মেঘ নীল, রোদে তেমন আঁচ নেই, বাতাসে হিম ভাব। একটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলো শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পার করে দিচ্ছে ওরা, কিন্তু সময়ের গতি এত অলস যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম। আলকাজার গার্ডেন-এর উল্টোদিকে ছোট একটা বার-এর বাইরে ফেলা টেবিলে বসে আছে রানা, সামনে গ্লাস ভর্তি স্প্যানিশ ব্র্যান্ডি। মোটরসাইকেল লেদার পরে থাকায় শীতটা ওকে কাবু করতে পারছে না।

লন্ডন থেকে জিব্রালটার আসে ওরা, সেখান থেকে গতকাল সন্ধ্যায়

পৌঁছেছে সেভাইলে। কৃষ্ণকায় দু'জন কালো তরুণ গাড়িতে তুলে নিয়ে সীমান্ত পার করিয়ে আনে ওদেরকে। স্প্যানিশ বাচনভঙ্গিতে আন্দালুসিয়ার টান থাকলেও, এত ভাল ইংরেজি বলে তারা যে জাতীয়তা আন্দাজ করা কঠিন। তারা যদি বিসিআই এজেন্ট বা ইনফর্মার হয়ও, এ-প্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স না থাকায় শুধু কোড-এর সাহায্যে পরিচয় বিনিময় হয়েছে, নাম বা এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। সেভাইলের একটা অ্যাপার্টমেন্টে ওদেরকে তুলে দিয়ে ফিরে গেছে তারা। অ্যাপার্টমেন্টে তৃতীয় এক লোককে পেয়েছে ওরা, সঙ্গে প্রায় বোবা এক মহিলা। মহিলার হাবভাব একটু সন্দেহজনক। দু'জনেই তারা ওদের খাওয়াদাওয়া আর আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করবে, কিছু দরকার হলে কিনে এনেও দেবে।

প্লেনে থাকতেই সেভাইলের স্ট্রীট ম্যাপে চোখ বুলিয়েছে রানা আর পারভিন, চিহ্নিত করেছে আবীর হাসানকে তুলে নিতে পারলে কোন পথ ধরে তাকে সরিয়ে আনবে। অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছানোর পর ব্যাপারটা চূড়ান্ত করা হয়েছে—আবীর হাসানকে ওদের এই অ্যাপার্টমেন্টেই আনা হবে প্রথমে।

অ্যাপার্টমেন্টটা বিসিআই-এর একটা সেফ হাউস। পুরুষ কেয়ারটেকার আর তার সঙ্গিনী মহিলাই মোটরসাইকেলের ব্যবস্থা করেছে। অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে তিন মিনিট হাঁটলে তালা মারা একটা গ্যারেজ পাওয়া যাবে, সেখানেই লুকানো আছে বড়সড় ট্রায়াম্ফ ডেইটোনা মোটরসাইকেলটা। রানার জন্যে মোটরসাইকেল লেদার আর হেলমেটও তারা বাছাই করে দিয়েছে। আজ দুপুরে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুবার আগে প্ল্যানটা মুখস্থ করে নিয়েছে ওরা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি সেকেন্ডে কি ঘটবে সব ওদের নখদর্পণে এখন। ঢাকা ছাড়ার আগে রানা আর পারভিনকে নিয়ে আরেকবার বসেছিলেন রাহাত খান, ওদেরকে জানিয়েছেন যে ব্যাক-আপ হিসেবে একটা গ্রুপ ওদের কাছাকাছিই থাকবে।

ব্যাক-আপ টীমের সদস্যদের কাউকে রানা চেনে না, তবে তাদের টাইপ সম্পর্কে একটা ধারণা আছে ওর। এরা গোপনীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে নিজেদের প্রাণ হারাতেও রাজি, তবু মুখ খুলবে না। বিপজ্জনক একটা কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে নিবেদিত প্রাণ তারা। এই অপারেশনের জন্যে রানা আর পারভিনকে যেমন রাহাত খান নিজে বাছাই করেছেন, সংশ্লিষ্ট বাকি সবাইও সরাসরি তাঁর নির্দেশে দায়িত্ব পেয়েছে। এদের কেউ বেঈমানী করবে না, এ-ব্যাপারে রাহাত খান শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত।

অথচ তারপরও রানার মনে হয়েছে, আবীর হাসানের নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই শঙ্কিত বোধ করছেন বস্। রানা আর পারভিন চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার সময় অনেকটা তিরস্কার বা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন, 'ছেলেটা বোকার মত বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। জানেই যখন যে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে, ফোনগুলো না করলেই পারত।'

সেফ হাউস থেকে একটা নাইন এমএম এএসপি আর অ্যামুনিশনের ছ'টা ম্যাগাজিন দেয়া হয়েছে রানাকে। পারভিনকে দেয়া হয়েছে ছোট একটা

আগ্নেয়াস্ত্র, তবে সেটাও কম মারাত্মক নয়—বেরেটা অটোমেটিক। সকালে বাইরে বেরুবার আগে অস্ত্রগুলো খুলে চেক-রিচেক করেছে ওরা। সান ফার্নানডো স্ট্রীট ঘুরেফিরে দেখেছে ওরা, এস্কেপ রুট ধরে হেঁটে ফিরে এসেছে গ্যারেজে, সেখান থেকে অ্যাপার্টমেন্টে।

দ্বিতীয়বার বেরিয়েছে বেলা সাড়ে বারোটায়, দু'জন একসঙ্গে নয়।

এখন একটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি।

টেবিলে একটা কয়েন ফেলে বার ছাড়ল রানা, ফুটপাথ ধরে খানিক দূর এগিয়ে বাঁক নিল বাম দিকে। ঠিক সময় মতই বার ছেড়েছে ও, বার থেকে ডেইটোনার কাছে পৌঁছুতে দুই মিনিটের বেশি লাগবে না।

গ্যারেজ খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। হাতে গ্লাভস পরল, মাথায় পরল হেলমেট আর ভাইযর। সীটে বসে স্টার্ট দিল এঞ্জিনে। হাতে থ্রটল, সারা শরীরে যান্ত্রিক দানবটার প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করতে পারছে। থ্রটল ঘুরিয়ে এঞ্জিনের ছোট ছোট বিস্ফোরণ ঘটাল, গর্জে উঠতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে দৈত্যটা। সবশেষে অটোমেটিক পিস্তলটা জায়গা মত আছে কিনা দেখে নিল। প্রয়োজনে বাইক স্ট্যান্ড পা দিয়ে নিচু করার আগেই ওটার নাগাল পেয়ে যাবে ও।

গ্যারেজ থেকে ধীরে ধীরে রাস্তায় বেরিয়ে এল মোটর সাইকেল। এই রাস্তাই ওকে সান ফার্নানডো স্ট্রীটে পৌঁছে দেবে।

সেখানে পৌঁছে বাম দিকে পারভিনকে দেখতে পেল রানা, কৌতূহলী ও অলস ট্যুরিস্টের মত আপন মনে হাঁটছে, শোল্ডারব্যাগটা ডান হাতে ধরা, ওই একই হাতে এক কপি ফিন্যানশাল টাইমস। তারমানে আবীর হাসান পৌঁছেছে।

যানবাহনের মিছিল থেকে না বেরিয়ে ডান দিকে এগোচ্ছে রানা। বিশ গজ সামনে বিরাট রাউন্ডঅ্যাবাউট থাকায় পুরো একটা বৃত্ত রচনা করার সুযোগ পেয়ে গেছে ও, আরেক রাস্তার মুখ হয়ে ফিরে আসতে পারছে সান ফার্নানডো স্ট্রীটে। ফলে রাস্তার ডান দিকে থামতে পারা যাবে, পারভিনের কয়েক ফুটের মধ্যে। রাউন্ডঅ্যাবাউট অনায়াসে ঘুরে এল। ত্রিশ গজ দূরে দেখতে পেল আবীর হাসানকে, লোকে লোকারণ্য গার্ডেন থেকে বেরিয়ে আসছে, হেঁটে আসছে সোজা পারভিনের দিকে। পরনের কাপড়চোপড় তার দেয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—ব্লু জিনস, ডেনিম শার্ট আর জ্যাকেট। ভারী কাপড়ের ব্যাগটা প্রায় অবহেলার সঙ্গে ডান কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে।

ফুটপাথের পাশে মোটরসাইকেল থামাল রানা, মিররে চোখ রেখে প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে তাকাল। বাম দিকের মিররে চোখ পড়তেই আরেকটা বাইক দেখতে পেল ও। ওটা একটা হার্লি ডেভিডসন, পিছনের সীটে একজন অতিরিক্ত আরোহী আছে। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চোখের পলকে তৎপর হয়ে উঠল রানা।

বাইকটা সগর্জনে রানার পিছন থেকে ছুটে আসছে। লেদার জ্যাকেটের পকেট থেকে এএসপি বের করে আনছে রানা, মুখ তুলে সামনে তাকাল হাসান আর পারভিন কি করছে দেখার জন্যে। ভাগ্যিস তাকিয়েছিল. তা না হলে ওর

ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।

পারভিন বা হাসান পাশাপাশি চলে এসেছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। জানে না কি ঘটতে যাচ্ছে।

হঠাৎ লাল আর সবুজ জ্যাকেট পরা দুই তরুণ পারভিনকে পাশ কাটিয়ে এল। সোজা রানার দিকে হেঁটে আসছে তারা, হাত তুলে ডেইটোনাটা দেখাচ্ছে পরস্পরকে, মুখে প্রশংসাসূচক হাসি। পারভিনকে তারা ছাড়িয়ে আসতেই রানা এখন শুধু তাদেরকেই দেখতে পাচ্ছে, লাল আর সবুজ জ্যাকেটের পিছনে পারভিন আর হাসান হারিয়ে গেছে। হাসতে হাসতেই লাল আর সবুজ জ্যাকেটে হাত ভরল দুই তরুণ। সেই মুহূর্তে দুই আরোহীকে নিয়ে রানাকে পাশ কাটাল হার্লি, গতি এত বেশি যে বাতাসের ধাক্কায় নিজের বাইক থেকে পড়ে যাচ্ছিল রানা।

ফুটপাথে প্রচুর লোকজন, গোলাগুলি শুরু হলে নিরীহ মানুষ মারা যেতে পারে। তবু রানা নিজেদের খুন হবার ঝুঁকি নিতে পারে না। লাল আর সবুজ জ্যাকেট থেকে পিস্তলের অংশবিশেষ মাত্র বেরিয়েছে, পর পর দুটো গুলি করল ও। গুলি করার সময়ও চিন্তা করছে রানা, লাল আর সবুজ জ্যাকেট পরা তরুণ দু'জন ভুলেও একবার পারভিন বা হাসানের দিকে তাকায়নি, এমন কি পাশ কাটাবার সময়ও। এর মানে হলো, প্রতিপক্ষ নিজেদের কাজ ভাগ করে রেখেছে। ফুটপাথের দুই তরুণকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রানাকে খুন করার। ওখানে পারভিন আর হাসানের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদেরকে হয়তো কিছু জানানোই হয়নি।

অব্যর্থ লক্ষ্য। দুই তরুণের বাম বুকে গুলি লেগেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে টলে উঠল দুজনেই, কিন্তু রানার দুর্ভাগ্য যে এক পা করে পিছিয়ে গিয়ে তাল সামলে নিল, পড়ে গেল না। ইতিমধ্যে দশ গজ দূরে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়ানো পারভিন আর হাসানের কাছে পৌঁছে গেছে হার্লি, কিন্তু তাদের কাউকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রানা। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, বুঝতে পারল সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা করে বসেছে সে। গুলি খেয়েও পড়ে যায়নি দুই তরুণ, রানার সামনে থেকে সরেও যায়নি, কারণ তাদের উদ্দেশ্যই হলো পিছনে কি ঘটছে রানাকে তা দেখতে না দেয়া। গুলি খেয়ে তারা আহতও হয়নি, দু'জনের কারও বুক থেকেই রক্ত বেরুচ্ছে না—বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে। দু'জনের হাতেই এখন পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। হাসছে তারা, রানাকে বোকা বানিয়ে মজা পাচ্ছে। আর এই মজা পেতে গিয়েই সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করে ফেলল।

রানা সুযোগ খুঁজছিল হার্লির আরোহীদের দৃষ্টিপথে পেলেই গুলি করবে। পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করাই ছিল। সেটা আবার ঘোরাতে হলো সামান্য, ট্রিগারে টান দিতে আবার বেরিয়ে গেল একজোড়া বুলেট। দুই তরুণ প্রথমে গুলি করল, রানা করল এক নিমেষ পরে। তিনজনই তিনজনের মাথা লক্ষ্য করে।

একজোড়া বুলেট রানার কপাল ফুটো করে দিত। তরুণরা একই সঙ্গে

ট্রিগারে টান দিয়েছিল। কিন্তু রানা প্রথমে মাথা নিচু করে, তারপর গুলি ছোঁড়ে। আগে-পরে হলেও, সময়ের ব্যবধান এত কম যে চারটে গুলির শব্দ একটা শব্দ হয়েই বাজল কানে। দুই তরুণ ছিটকে পড়ে গেল পিছন দিকে, দু'জনেরই খুলি উড়ে গেছে।

তারা পড়ে যেতেই সামনের দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। পারভিন আর হাসানের পাশে থামার উপক্রম করছে হার্লি, পিছনের আরোহী হাত লম্বা করে দিয়েছে, গ্লাভস পরা হাতে কালো আগ্নেয়াস্ত্র। পরপর তিনটে বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ড্রাইভারও হাত বাড়িয়েছে, গুলি খেয়ে পিছন দিকে ছিটকে পড়ছে হাসান, নাগালের বাইরে সরে যাবার আগেই তার হাত থেকে সুতী কাপড়ের ব্যাগটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল সে। হাসান দূরে সরে যাচ্ছে, মাথাটা ঢাকা পড়ে আছে মিহি ও লাল কুয়াশায়—তিনটে বুলেটই গলার ওপর মুখে আর মাথায় লেগেছে। পারভিনের মুখ আর চোখ বিস্ফারিত হতে দেখল রানা, আতঙ্কে দিশেহারা। অকস্মাৎ চার-পাঁচজন লোক কোত্থেকে ছুটে এসে ঘিরে ফেলল তাকে, যেন সাহায্য করতে চায়, আরেক দল ঘিরে ফেলল ফুটপাথে ছিটকে পড়া হাসানকে। হার্লির গতি শ্লথ হয়েছিল, পুরোপুরি থামেনি, আবার সেটা গতি বাড়িয়ে যানবাহনের মিছিলে হারিয়ে যাচ্ছে।

রানা অসহায় বোধ করছে, সেই সঙ্গে দিশেহারাও বটে। পারভিনের মুখে রক্ত আর হলুদ মগজ দেখতে পেল ও, জানে না ওগুলো হাসানের ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে ওখানে লেপ্টে গেছে কিনা। তবে যেইমাত্র দেখল শোল্ডারব্যাগ থেকে অস্ত্র বের করছে পারভিন, মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়ে যানবাহনের মিছিলে ঢুকে পড়ল ও। হার্লির চেয়ে ডেইটোনা অনেক বেশি শক্তিশালী। যাই ঘটে গিয়ে থাকুক, ওর মাথায় এখন একটাই চিন্তা—হাসানের ব্যাগটা উদ্ধার করতে হবে।

যানবাহনের দীর্ঘ মিছিলের মাথার দিকে রয়েছে হার্লি, সীট থেকে নিতম্ব তুলে উঁচু হলে আরোহী দু'জনকে পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে রানা। সামনের বহু গাড়ি ডানে বাঁয়ে বাঁক নিচ্ছে, হালকা হয়ে যাচ্ছে মিছিল, ফলে স্পীড বাড়াতে পারছে ও। হার্লির আরোহীরা বোকামি করছে। ওরা বিসিআই এজেন্ট হলে পিছনের আরোহী ব্যাগটা নিয়ে বাইক থেকে নেমে পড়ত, ছুটে ঢুকে পড়ত কোন গলির ভেতর। এখন অবশ্য সে সুযোগ নেই ওদের, কারণ রানার ডেইটোনা হার্লির কাছাকাছি চলে এসেছে। শহরের মাঝখানটা পিছনে ফেলে শহরতলির দিকে ছুটছে হার্লি। শহরকে ঘিরে থাকা প্রাচীন পাঁচিলটাকে পাশ কাটাল খুনীরা। পনেরো মিনিট পর শহরতলিও ছাড়িয়ে এল, রাস্তার দু'ধারে এখন ফাঁকা খেত বা মাঠ।

হার্লির আধ মাইল পিছনে রয়েছে রানা। অনেক পিছন থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছে। ডেইটোনার স্পীড এখন ঘণ্টায় একশো মাইল। দুই মোটরসাইকেলের ব্যবধান একইরকম থাকছে, কমবেশি হচ্ছে না। এর মানে হলো হার্লি টপ স্পীডে ছুটছে। পিছনে প্যাসেঞ্জার থাকায় টপ স্পীডে বাইক চালানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ. জানে রানা।

রাস্তার লম্বা এক বিস্তৃতি পড়ল সামনে। এই সুযোগে স্পীড আরও বাড়াল রানা। ধীরে ধীরে দুই বাইকের মধ্যবর্তী ব্যবধান কমে আসছে। বিস্তৃতিটুকু শেষ হয়ে এল, ব্যবধান এখন সিকি মাইলও নয়। ডান দিকে বাঁক নিল হার্লি, ফলে স্পীড কমাতে হলো ড্রাইভারকে। ব্যবধান আরও কমল। রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ল রানা, তির্যকভাবে ছুটল ডেইটোনা। আবার যখন রাস্তায় উঠল, হার্লি তখন আর মাত্র ত্রিশ গজ দূরে।

এদিকে রাস্তায় যানবাহন নেই। আশপাশে কোন জনবসতিও দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল রোমান সাম্রাজ্যের গর্ভে প্রবেশ করছে ওরা। রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড, সাদার ওপর সবুজ হরফে লেখা 'ইটালিকা'। বিশাল রোমান শহরের অবশিষ্ট বা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে সামনে, ওখানে দুই সম্রাট হাড্রিয়ান ও ট্রাজান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খানিক পরই টিকেট কাউন্টার দেখা গেল, চারটে ভাষায় লেখা নোটিশে বলা হয়েছে—'ধ্বংসাবশেষের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ'। হার্লির ব্রেক লাইটও জ্বলে উঠতে দেখল রানা, প্রবেশমুখ পেরোবার সময় স্পীড কমাতে হয়েছে ড্রাইভারকে। ভেতরে ঢোকার পর দু'পাশে পাহাড়, পাহাড়ের নিচে ও ওপরে প্রাচীন বিল্ডিঙের সারি সারি কঙ্কাল। খানিকটা সামনে ও ডান দিকে একটা ঢাল, নেমে গেছে ইটালিকার অ্যাম্ফিথিয়েটারে।

ব্যবধান কমাবার জন্যে স্পীড আবার বাড়াল রানা, তবে দ্রুত কিছু চালানোর উপযোগী জায়গা নয় এটা। হঠাৎ বাম দিকে কাত হতে দেখল রানা হার্লিকে, পাথর দিয়ে বাঁধানো সরু একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। কিন্তু ডেইটোনা বাঁক ঘোরার পর সামনে হার্লিকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

থ্রটল ঢিল দিল রানা, বাইক গতি হারিয়ে ফেলল, সচল এঞ্জিন থেকে মৃদু আওয়াজ বেরুচ্ছে শুধু। কান পেতে হার্লির আওয়াজ শুনতে চাইছে ও। কিন্তু কোথাও থেকে কোন শব্দ আসছে না। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথার ভেতর—আগেই হয়তো ঠিক করা ছিল হার্লির আরোহীরা এখানে গাঢ় ছায়ার ভেতর কোথাও থামবে, এখানে তাদের আরও লোকজনও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদেরকে হারিয়ে ফেলেছে ও, আক্রান্ত না হলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ধাওয়া করে এসে ফিরে যাবে, প্রতিশোধ না নিয়েই? লেদার জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে এএসপি ও একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন বের করল রানা। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল, ভাঙা একটা বিল্ডিঙের গা ঘেঁষে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। কাউকে দেখতে না পেলেও, অনুভব করল ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

রাস্তার শেষ মাথাটা বিশ গজ দূরে। পাথর বাঁধানো রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই ভাঙা বিল্ডিঙের কোণটা মিলিত হয়েছে একটা টি-জাংশনে। বিল্ডিঙের কোণে পৌঁছতেই প্রথম গুলিটা হলো। আওয়াজটা শুনল পাথরে বুলেট লাগার সময়, লাগল ঠিক ওর মাথার বাম পাশে। বিল্ডিঙের গায়ে ছোট একটা গর্ত তৈরি হলো, ধুলো উড়ল বাতাসে, খানিকটা ধুলো পড়ল ওর

ভাইযরের ওপর।

স্যাঁৎ করে ডান দিকে সরে এল রানা, এক ঝটকায় ভাইযর ওপরে তুলল, লাফ দিয়ে বিধ্বস্ত রাস্তায় বেরিয়ে এল—টি-জাংশনের ক্রসপীস তৈরি করেছে এটা—লম্বা করা হাত বড় আকৃতির বৃত্ত তৈরি করছে, পিস্তলের বাঁট ধরে আছে প্রয়োজনের চেয়ে কঠিন মুঠোয়।

বাম দিকে নড়াচড়া লক্ষ করে পা দুটো স্থির রেখেই সেদিকে ঘুরে গেল রানা, পরপর দুটো গুলি করল। মূর্তিটা ক্ষিপ্রবেগে গলির মুখ থেকে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল, প্রথম বুলেট দেয়ালে লাগার আগেই। ওখানেই ছিল লোকটা, সরে না গেলে বুলেটটা দেয়ালে লাগত না।

আবার ঘুরল রানা, জানে লোক দু'জন ওকে একটা বৃত্তের মধ্যে আটকাতে চেষ্টা করছে। পিস্তল ধরা হাত বাম থেকে ডানে ঘোরাচ্ছে, পিঠটা ঠেকে আছে শক্ত পাথরে। গলির মুখে সেঁধিয়ে গেছে আততায়ী, কাজেই সেদিক রানার মনোযোগ না থাকারই কথা।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। টার্গেটকে দেখেনি, জানেও না গলির মুখে কেউ আছে কিনা, তবু প্রথমবার যেখানে গুলি করেছিল ঠিক সেখানেই গুলি করল দু'বার কোন বিরতি ছাড়াই। কৌশলটা ষোলো আনা কাজে লাগল। রানার মনোযোগ অন্য দিকে, লক্ষ্য করে আবার গলির মুখ থেকে উঁকি দিচ্ছিল লোকটা। বুদ্ধিতে হেরে যাওয়ার খেসারত দিতে হলো তাকে। দুটো বুলেটই লেগেছে, একটা কানে, আরেকটা গলায়। গলির মুখেই পড়ল সে, পড়ার পর আর নড়ছে না। মাথায় হেলমেট না থাকায় লোকটাকে চেনা চেনা লাগল রানার।

রানা একা। এখন ওর প্রতিপক্ষও একা।

ডানে বাঁয়ে চোখ রেখে রাস্তাটা পেরিয়ে এল। স্রেফ কৌতূহল মেটাবার জন্যে নিহত লোকটাকে কাছ থেকে একবার দেখতে চায়।

লাশটা টপকে গলির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা।

এ সেই কাসিম-খান। চিনতে পেরে সন্তুষ্টবোধ করল রানা।

আবার রাস্তা পেরিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। ধীরে ধীরে, সাবধানে, আবার বাম দিকে ঘুরল। এক পা এক পা করে হাঁটছে। জাংশনে পৌঁছুল। রাস্তার আরেক বাহুর দু'পাশে বিধ্বস্ত বিল্ডিং। যে রাস্তায় ডেইটোনা রেখে এসেছে, এই রাস্তাটা সেটার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা তৈরি করেছে। ফায়ারিং পজিশন নিয়ে রয়েছে রানা, সামনে কিছু পড়লেই উড়িয়ে দেবে।

রাস্তাটা ফাঁকা, তবে দু'পাশের বিল্ডিঙের আড়ালে কোথাও প্রতিপক্ষ লুকিয়ে থাকতে পারে। পায়ের নিচে ঢালু হতে শুরু করল রাস্তা, সেই সঙ্গে তির্যকভাবে ধনুকের আকৃতি নিচ্ছে। প্রাচীন রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখার লোভটা সামলানো কঠিন। ঠিক এখানে কখনও না এলেও, প্রাচীন রোমান ধ্বংসাবশেষ আগেও দেখেছে রানা; তাকাবার লোভটা সেজন্যে আরও বেশি। তবে এক সেকেন্ডের বেশি তাকায়নি। মনোযোগের এই নগণ্য অভাবই মৃত্যু ডেকে

আনছিল। বুলেটগুলো ছুটে এল ওর বাম দিক থেকে, পর পর দুটো। নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল, প্রাচীন পাথরের দেয়ালে লেগে ফেরত এল বুলেট, এক কি আধ ইঞ্চির জন্যে রানার মুখে লাগল না।

লক্ষ্যস্থির করেনি, শব্দের উৎস আন্দাজ করে পাল্টা গুলি করল রানা। গুলির শব্দ মিলিয়ে যেতে নিস্তব্ধতা ফিরল না, পাথুরে রাস্তা থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ভেসে এল।

বাকি রাস্তাটুকু ছুটে পেরিয়ে এল রানা, এই ফাঁকে ম্যাগাজিন বদল করল। মোটর সাইকেল স্টার্ট মিচ্ছে শুনতে পেয়ে হতাশায় ছেয়ে গেল মন। দ্বিতীয় আততায়ী ডেইটোনা নিয়ে পালাচ্ছে। ঢাল বেয়ে ছুটল ও, ধ্বংসাবশেষের কিনারায় পৌঁছুল দু'হাতে ধরা পিস্তল নিয়ে। বাম দিকে ডেইটোনাকে দেখা গেল, দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওদিকটায়, অনেক নিচে, খোলা প্রান্তর।

খোলা জায়গায় পৌঁছে আবার ডেইটোনাকে দেখতে পেল রানা। ঘাস ঢাকা ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে, নাক বরাবর সোজা প্রাচীন অ্যাম্ফিথিয়েটারে পৌঁছানোটাই উদ্দেশ্য। কাঠামোটা গোলাকার, পাথুরে বেঞ্চগুলো কোথাও ভাঙা, কোথাও অস্তিত্বহীন। আরও অনেক নিচে অ্যাকটিং এরিয়া। বিধ্বস্ত বসার আয়োজনের মাঝখানে আইল, সেটা ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে ডেইটোনা, ড্রাইভার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে স্পীড বাড়াতে, কিন্তু পথটা ঢালু হওয়ায় ভারসাম্য রক্ষার জন্যে বারবার ব্রেক করতে হচ্ছে।

পিস্তলের জন্যে দূরত্বটা বেশি হয়ে যায়, তবে লক্ষ্যস্থির করার সময় রানার হাত এতটুকু কাঁপছে না। অনুভব করল দু'হাতে ধরা অস্ত্রটা বিরতিহীন লাফাচ্ছে, যতক্ষণ না অ্যামুনিশনের পুরো ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। মোটর বাইকের চারপাশে ধুলোর ছোট ছোট বিস্ফোরণ ঘটতে দেখল ও। তারপর দেখল পিঠে একজোড়া বুলেট লাগায় সীট থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ড্রাইভার, তারপর আবার বসে পড়ল, শরীরটা নেতিয়ে পড়েছে হ্যান্ডেলবারের ওপর। ডেইটোনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়ছে। আরও দুটো গুলি করল রানা।

বাইক উল্টে যাবার সময় রাইডার সীটেই থাকল। কাপড়ের ব্যাগটা তার ডান কাঁধে স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝুলছে। বাইক আর লাশ ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে গেল অ্যাম্ফিথিয়েটারের অ্যাকটিং এরিয়ায়।

রানার শেষ গুলিটা লেগেছে পেট্রল ট্যাঙ্কে।

বাইক থেকে নাচতে নাচতে মাথাচাড়া দিল শিখাটা। বিস্ফোরণের আওয়াজটা হলো এক সেকেন্ড পরে। শিখাগুলো নিভু নিভু হলো, তারপর আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়ল—বাইক, আরোহী আর ব্যাগটাকে ঢেকে ফেলছে।

লাফ দিল রানা, আইল ধরে তীরবেগে নামছে। আগুনটার কাছে পৌঁছে দেখল সর্বনাশ যা হবার তা এরই মধ্যে হয়ে গেছে। একা শুধু রাইডার বা বাইক পুড়ছে না. কাপড়ের ব্যাগটাও পুড়ে গেছে। রানার মনে হলো কারা যেন

চিৎকার করছে। ঘাড় ফেরাতেই দেখল, স্প্যানিশ পুলিসদের একটা দল অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেল ওর, তাসত্ত্বেও গ্লাভস পরা হাতটা ঢুকিয়ে দিল আগুনে। জ্বলন্ত ব্যাগটা নাগালের মধ্যে পেল ও, বের করেও আনল, তবে জানে যে ভেতরের কোন কাগজই ছাই হতে বাকি নেই।

পাঁচ

সেভাইলে কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটা আভাস বিসিআই-এর তরফ থেকে আগেই স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্সকে জানানো হয়েছিল, তাসত্ত্বেও দু'ঘণ্টা জেরা করা হলো ওদেরকে।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাথায় তিনটে পুলিস কার, একজোড়া মোটর সাইকেল আর দুটো অ্যামবুলেন্স এসে থামে। পুলিস রানাকে কোন রকম সম্মান দেখায়নি, মৌলবাদী ইসলামিক টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য সন্দেহে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্স-এর সিনিয়র কয়েকজন অফিসারের নাম ঢাকা থেকে মুখস্থ করে এসেছে রানা, পুলিসকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানায় ও। ইতিমধ্যে অপরাধ প্রমাণের কাজে লাগবে ভেবে কাপড়ের পোড়া ব্যাগটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে এএসপিটার সঙ্গে।

সেভাইলের প্রধান পুলিস স্টেশনে আনা হলো ওকে। এখানেই, ইন্টারোগেশন রুমে, পারভিনকে দেখতে পেল ও। সাদা পোশাক পরা পুলিস অফিসাররা ঠোঁটের কোণে সিগারেট গুঁজে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল দু'জনকে। অবশেষে রানার অনুরোধে স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে রাজি হলো তারা, ওদেরকে একা রেখে বেরিয়ে গেল ইন্টারোগেশন চেম্বার থেকে।

দু'জনেই ওরা জানে, চেম্বারে লিসনিং ডিভাইস লুকানো আছে, কাজেই কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করল। পারভিন হতাশ, বিশেষ করে আবীর হাসানকে বাঁচাতে না পারায় অপরাধ বোধে ভুগছে। রানা কোন সান্ত্বনা দিল না, কারণ এই ব্যর্থতার জন্যে পারভিনের চেয়ে সে-ই বেশি দায়ী। শুধু জানাল, হাসানের ব্যাগটা উদ্ধার করেছে ও। 'তবে ভেতরে ছাই ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। পুলিস ওটা নাড়াচাড়া না করলেই হয়, তা করলে ছাই থেকেও কিছু উদ্ধার করা যাবে না।'

পারভিন জানতে চাইল, 'কি ঘটল, রানা? কোথাও কি লিক আছে? আমরা ব্যর্থ হলাম কেন?'

'বসের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো,' বলল রানা। 'অ্যামেচার হলে যা হয়, হাসান নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। প্রথমবার ঢাকার সঙ্গে

গোপনে যোগাযোগ করার পর যখন সে বুঝতে পারল তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার ফোন করার ঝুঁকি কেন সে নেবে?'

বিশ মিনিট পর পরিস্থিতি বদলে গেল। প্রথমে হাসি মুখে একজন পুলিস অফিসার ঢুকল ট্রে হাতে, তাতে স্যান্ডউইচ আর কফি। পিছু নিয়ে এলেন সিনিয়র একজন অফিসার, কেতাদুরস্ত আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। আরও দশ মিনিট পর স্প্যানিশ ইন্টেলিজেন্স-এর অফিসাররা পৌঁছুল। সমীহ আর সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করা হলো না, ফিরিয়ে দেয়া হলো অস্ত্র আর ব্যাগটা—প্লাস্টিকের একটা কাভারে মুড়ে। ওদেরকে বলা হলো, বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভারকে বললেই যেখানে খুশি পৌঁছে দেবে।

গাড়িতে উঠে জিব্রাল্টারে যেতে চাইল রানা। ড্রাইভার শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। গাড়ি ছুটছে, প্লাস্টিকের মোড়ক খুলে ব্যাগটা বের করল রানা, ধৈর্য ধরতে মন চাইছে না। যা আশঙ্কা করেছিল তাই, ভেতরে ছাই ছাড়া কিছু নেই। সেই ছাইও এমনভাবে নাড়াচাড়া করা হয়েছে, পরীক্ষা করার উপযুক্ততাও নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ছাইয়ের গাদা থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া আর সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা এক টুকরো কাগজ বেরুল।

পারভিনের হাতব্যাগে একটা পেন্সিল টর্চ পাওয়া গেল, সেটা জ্বেলে রানাকে সাহায্য করল সে। কাগজের লেখাটা একটা চিঠির অংশ বলে মনে হলো, তবে বোঝা গেল না কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে—সম্ভবত রাহাত খানকে। আবীর হাসানের হাতের লেখা রানা বা পারভিন চেনে না, তবে চিঠির শেষে 'পিনহেড' শব্দটা দেখে ওরা ধরে নিল হাসানেরই লেখা। চিঠিটা এরকম···

'···যদি কোন কারণে আমি ঢাকায় ফিরতে না পারি, তাই এই তথ্যটা ব্যাগে ভরে রাখছি। কথাটা খানিক আগে জানতে পারলাম। আমারই মত ইশরাত জাহানও নটবর সিংকে ভয় পাচ্ছেন। নটবর সিং যা করছেন তাতে তাঁর কোন সমর্থন নেই। তিনি বিশ্বস্ত বলে মনে করেন এমন একজন বডিগার্ডকে বলেছেন, বিসিআই-এর সাহায্য পেলে পালাতে চান তিনি। আর পালিয়ে যদি ঢাকায় যেতে পারেন, নটবর সিং সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন কর্তৃপক্ষকে। আজ সকালে নিজের ব্যক্তিগত সী প্লেন নিয়ে প্যারিসে চলে গেছেন তিনি, তবে সেখানে তিনি কোথায় উঠবেন সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। শুধু জানি ওখানে একজন ডাক্তার আছেন, চিকিৎসার জন্যে প্রায়ই তাঁর কাছে যান। প্যারিসে তাঁর নিজস্ব একটা অ্যাপার্টমেন্টও আছে, তবে প্যারিসে গেলেই যে সেখানে ওঠেন, তা নয়। আশা করি শিগগির আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। পিনহেড।'

জিব্রাল্টারে পৌঁছে একটা হোটেল স্যুইট বুক করল রানা। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল, ডিনার সেরে রাত একটার দিকে পারভিনকে সাবধানে থাকতে বলে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পে-বুদ থেকে সরাসরি ঢাকায় ফোন করল ও। ঢাকায় এখন দপর. সোহেলকে অফিসেই পাওয়া গেল। প্রথমে পে-

ফোনের নম্বর জানাল, তারপর কি ঘটেছে রিপোর্ট করে যোগাযোগ কেটে দিল। বুদ থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে পায়চারি করছে, তবে বেশিদূর যাচ্ছে না। বুদে ঢুকে দু'জন লোক ফোন করল, বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে। তারা চলে যেতে রিঙ হলো। ভেতরে ঢুকে বিসিভার তুলল রানা।

সরাসরি রাহাত খান কথা বলছেন। কোন তিরস্কার নয়, হুমকি নয়, এমন কি কোন প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না, শুধু জানালেন, 'যাও, আগে চেষ্টা করে দেখো মেয়েটাকে উদ্ধার করা যায় কিনা।'

'স্যার, নটবর সিং? প্রথমে তাকে খুঁজে বের করা উচিত নয়?'

'আগে মেয়েটাকে বাঁচাও,' কঠিন সুরে বললেন রাহাত খান। 'দেন কিল হিম। দ্যাট'স মাই অর্ডার। কিল হিম!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রানার হাতের লোম দাঁড়িয়ে গেল। ওর দীর্ঘ কর্মজীবনে এ সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এত সংক্ষিপ্ত নির্দেশ আগে কখনও পায়নি ও। বসের নির্দেশে এতটা চরম আক্রোশ আর ঘৃণাও কখনও প্রকাশ পায়নি।

পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামল ওরা। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল বিসিআই এজেন্ট জুলহাস আবদেল লাফা। আলজিরিয়ার আলজিয়ার্সে জন্ম তার, ফ্রান্সের নাগরিক, প্যারিসে বিসিআই-এর গোপন দায়িত্ব পালন করে। ওদেরকে সে নিজের গাড়িতে তুলে নিল, নিজেই চালাচ্ছে। 'বস্ আমাকে কাল রাতেই নির্দেশ দিয়েছেন,' রানাকে জানাল সে। 'ইশরাত সুপারমডেল তো, কাজেই সবাই জানে কোথায় উঠেছেন তিনি। ফ্যাশন ম্যাগাজিনের এক সাংবাদিক বন্ধুকে ফোন করতেই হোটেলটার নাম বলে দিল। তোমাদের জন্যে সেখানেই একটা স্যুইট বুক করেছি আমি—হোটেল ললি দ্যুফো ইন্টারন্যাশনালে। ফাইভ স্টার, বলাই বাহুল্য।' হুইল থেকে হাত তুলে গোঁফ ছুঁলো সে।

'ইশরাতের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করেছ?'

'ফোন করি,' বলল লাফা। 'উদ্দেশ্য ছিল আভাসে জানাব তাকে সাহায্য করার জন্যে ঢাকা থেকে লোকজন আসছে, তিনি যেন তৈরি থাকেন। কিন্তু তিনি সরাসরি সব কথা খুলে বলার অনুরোধ করলেন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তার সঙ্গে যে দু'জন বডিগার্ড আছে তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আরও জানালেন, নটবর সিং তাঁর ওপর গোপনে নজর রাখছে না, রাখলে তিনি জানতে পারতেন।'

'বডিগার্ড দু'জন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সময় পেলাম কোথায়? তবে ইশরাত বললেন, দু'জনকেই তিনি বীমা কোম্পানী থেকে পেয়েছেন।' আবার একবার গোঁফে হাত বুলাল লাফা।

কথা না বলে গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

পারভিন জানতে চাইল, 'তারা কোথাকার লোক, কেমন দেখতে, অতীত ইতিহাস, কিছুই জানতে পারোনি?'

'ইশরাত যতটুকু জানিয়েছেন,' বলল লাফা। 'দু'জনেই ভারতীয়

মুসলমান, নটবর সিং-এর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে থেকে ইশরাতের বডিগার্ড হিসেবে কাজ করছে।'

রানাকে পারভিন জিজ্ঞেস করল, 'ইশরাতের সঙ্গে আমরা তাহলে কখন দেখা করব? সরাসরি, নাকি…'

'হ্যাঁ, সরাসরি,' বলল রানা। 'নিজেদের স্যুইটে ঢোকার আগেই।'

হোটেলের রিসেপশনে পৌঁছে খাতায় নাম লেখাল ওরা, নিজেদের ব্যাগ পোর্টারের হাতে গছিয়ে দিয়ে স্যুইটে রেখে আসতে বলে চলে এল দোতলার রেস্তোরাঁয়। ওদেরকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিয়েছে লাফা। আসলে বিদায় নেয়ার ভান করেছে। অন্য একটা গাড়ি নিয়ে হোটেলের পার্কিং লটে ফিরবে সে, অপেক্ষা করবে লবিতে।

রেস্তোরাঁয় হাত চালিয়ে ডিনার সারল ওরা। তারপর এলিভেটরে চড়ে উঠে এল ছ'তলায়। একশো সাতাশ নম্বর স্যুইটটা করিডরের শেষ মাথায়, লাফা ওদেরকে আগেই জানিয়েছে। আরও এক ফ্লোর ওপরে ওদের নিজেদের স্যুইট।

দরজায় নক করতে সুদর্শন এক যুবক দরজা খুলে দিল। চেইন লাগানো থাকায় কবাট পুরোপুরি খোলেনি। যুবকের একটা হাত দেখা যাচ্ছে, আরেকটা হাত পিছনে, রানা ধরে নিল ওই হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। 'ইয়েস?' মার্জিত সুরে জানতে চাইল যুবক।

'ইশরাতকে বলুন আমরা ঢাকা থেকে এসেছি, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ব্যাপারটা জরুরী।'

'কে, সজীব?' যুবকের পিছনে আরেকজনকে দেখা গেল। এ-ও দীর্ঘদেহী সুপুরুষ।

'কি নাম বলব, প্লীজ?' জানতে চাইল সজীব। তার দাঁড়ানো ও নড়াচড়ার মধ্যে ঋজু ও দৃঢ় একটা ভাব আছে, চেহারায় ভদ্র ভাবটুকু মুখোশ বলে মনে হলো না।

'মাসুদ রানা।'

সজীব তার পিছনে দাঁড়ানো যুবকের দিকে তাকাল না, শুধু বলল, 'গোমেজ, যাও, ম্যাডামকে বলো ঢাকা থেকে মাসুদ রানা এসেছেন, সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা আছেন—ওঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'সরো তোমরা,' দুই যুবকের পিছন থেকে মিষ্টি নারীকণ্ঠের নির্দেশ ভেসে এল। দুই যুবক দরজার সামনে থেকে সরে গেল দ্রুত, ইশরাত জাহান এগিয়ে এসে চেইন সরিয়ে কবাটটা পুরোপুরি খুলে দিল। 'আসুন, ভাই।' পারভিনের দিকে তাকাল। 'দাঁড়িয়ে থাকতে হলো, সেজন্যে দুঃখিত, ঢুকে পড়ো।'

পারভিন নিজেও কম সুন্দরী নয়, তবে ইশরাত জাহানের সামনে নিজেকে তার নিষ্প্রভ লাগছে। ওরা ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল গোমেজ।

ইশরাত পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা। সুপারমডেল হিসেবে তার যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়, তা হলো তার অস্বাভাবিক লম্বা পা আর

ক্ষীণ তনু। তনু ক্ষীণ হলেও নারীর যে-সব সম্পদ পুরুষজাতিকে জাদু করে তার সবই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক মাত্রায় বিধাতা তাকে দান করেছেন। কিন্তু বিধাতার সেই দানকে অসম্মান করা হয়েছে, অন্তত এক জায়গায় তো বটেই।

ইশরাতের মুখে তিন-চারটে আঁচড়ের দাগ কুৎসিত ভাবে ফুটে আছে।

'এই ভদ্রলোকের কথাই তোমাদের বলেছিলাম,' সজীব আর গোমেজকে বলল ইশরাত। 'মাসুদ রানা। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এঁদের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবে না। অন্তত মাসুদ রানা সম্পর্কে জানি আমি। ওঁর সঙ্গে আমার একবার কথাও হয়েছে।' পারভিনের দিকে তাকাল সে। 'তোমাকে অবশ্য আজই প্রথম দেখছি।'

পারভিন কিছু বলার আগে রানা বলল, 'ইশরাত, আমরা আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই। আপনার আপত্তি না থাকলে সাততলায় বসতে পারি আমরা, তিনশো বারো নম্বর স্যুইটটা আমরা বুক করেছি।'

হেসে উঠল ইশরাত। 'গোমেজ আর সজীব নিজেদের প্রাণ দিয়ে হলেও আমাকে রক্ষা করবে। মানে, বলতে চাইছি, ওদেরকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ওদের সামনে কথা বলতে কোন অসুবিধে নেই।'

রানা তারপরও ইতস্তত করছে দেখে ইশরাতকে বিস্মিত দেখাল। 'আপনারা তো সরাসরি ঢাকা থেকে নয়, স্পেনের সেভাইল থেকে আসছেন, তাই না? আবীর হাসান গোমেজ সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেননি?'

রানা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তার কি কিছু বলার কথা ছিল? আপনি কি সরাসরি তাকে কোন মেসেজ দিয়েছিলেন?'

'না, সরাসরি তাকে আমি কিছু বলিনি,' বলল ইশরাত। 'তবে গোমেজকে বলি, হাসান সাহেবকে যেন আভাস দেয়া হয়, বিসিআই আমাকে উদ্ধার করে ঢাকায় নিয়ে যেতে পারলে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারব।'

মনে মনে চমকে উঠল রানা, তবে চেহারায় নির্লিপ্ত ভাবটুকু ধরে রেখে জানতে চাইল, 'কেন? হাসানকে কেন আভাস দেয়ার ইচ্ছে হলো আপনার?'

'কারণ গোমেজ আমাকে জানিয়েছিল, কবির, আমার স্বামী, হাসান পালাবেন বলে সন্দেহ করছেন।'

গোমেজের দিকে তাকাল রানা।

গোমেজ সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল! 'সাহেব, মানে মি. কবির, আমাকে নির্দেশ দেন আমি যেন ম্যাডাম আর হাসান সাহেবের ওপর নজর রাখি। আমি অবাক হয়েছি দেখে তিনি বলেন, "চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্টকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তার আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক। আর ইশরাত আমার স্ত্রী হলে কি হবে, তাকেও আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না"। আরও বললেন, "যদি প্রমাণ করতে পারো এরা দু'জন আমার বিরুদ্ধে কিছু করছে, তোমাকে অনেক টাকা এনাম দেয়া হবে"।'

'আচ্ছা! তারপর?' রানাকে আগ্রহী দেখাল।

'তারপর আর কি, ম্যাডামকে সব কথা আমি বলে দিলাম,' জবাব দিল গোমেজ। 'তার আগে অবশ্য সজীবের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি। দু'জনেই একমত হই, আমরা ম্যাডামের পুরানো বডিগার্ড, কাজেই তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত না থাকলে পাপ হবে।'

ইশরাতের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি জানলেন কিভাবে আমরা স্পেনের সেভাইল থেকে আসছি?'

'হাসান সাহেব চলে যাবার পর আমার স্বামীই আমাকে জানাল,' বলল ইশরাত। 'বলল, সে পালিয়েছে বটে, কিন্তু বাঁচতে পারবে না। তারপর জিজ্ঞেস করল, আমি তাকে কোন মেসেজ দিয়েছি কিনা। কিছুই আমি স্বীকার করিনি।'

'আপনি স্বীকার করলে আমি ফেঁসে যেতাম, ম্যাডাম,' বিড়বিড় করে বলল গোমেজ।

সজীব বলল, 'ম্যাডাম মুখ খোলেননি বলেই তো কবির সাহেব ওনাকে টরচার করেন।'

ইশরাতের চেহারা লালচে হয়ে উঠল। 'ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গ থাক। তোমরা বরং করিডরে পাহারা দাও, সজীব।'

'ঠিক,' সায় দেয়ার সুরে বলল গোমেজ। 'আপনার ব্যক্তিগত সব কথা আমাদের শোনা উচিত নয়, শুনলেই বরং বিপদের মাত্রা বেড়ে যায়। তবে বাইরে কেন, ম্যাডাম, আমরা নিজেদের কামরায় অপেক্ষা করি।'

রানা বলল, 'আমি সন্দেহ করছি, ইশরাতকে কিডন্যাপ করা হবে। ঘরের ভেতর থাকার চেয়ে করিডরেই এখন থাকা উচিত তোমাদের।'

'ঠিক আছে,' বলে সজীবের বাহু ধরে দরজার দিকে এগোল গোমেজ। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে। 'ম্যাডাম, ওদের সঙ্গে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবেন তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। মাসুদ রানাকে আমি চিনি, গোমেজ। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।'

স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে গেল গোমেজ আর সজীব।

'আপনি আমাকে চেনেন—কিভাবে, ইশরাত?' দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হতেই জানতে চাইল রানা, সুরটা প্রায় জেরা করার।

'কিভাবে মানে?' ইশরাতের ঠোঁটে তিক্ত হাসি। 'আমার স্বামী আপনার সম্পর্কে সব কথাই আমাকে বলেছে।'

'যেমন?'

'আপনি তার প্রধান শত্রু। তার বাবার মৃত্যুর জন্যেও নাকি আপনি দায়ী।'

'আর কিছু?'

'তার কথা হলো, সে আপনাকে দয়া করে বাঁচিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে হলে যখন খুশি আপনাকে সে মেরে ফেলতে পারে।'

স্যুইটের একটা দরজার দিকে তাকাল রানা। 'গোমেজ আর সজীব

সম্ভবত ওদিকের কামরাটায় থাকে, তাই না?' ইশরাত মাথা ঝাঁকাতে পারভিনের দিকে তাকাল ও।

মুখে কিছু বলতে হলো না; দরজাটার দিকে পা বাড়াল পারভিন।

'স্বামীর সঙ্গে কি নিয়ে লাগল আপনার?' জানতে চাইল রানা। 'তার আগে বলুন, আপনি তাকে বিয়ে করলেন কেন?'

'কেন বিয়ে করেছি, এর উত্তর এক কথায় দিতে পারব না,' বলল ইশরাত। ইঙ্গিতে রানাকে একটা সোফা দেখিয়ে সেটার উল্টোদিকের সোফায় বসল সে, তারপর রানা না বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। 'একটা ফ্যাশন শোতে পরিচয়। যেচে পড়ে সে নিজেই আমার সঙ্গে পরিচিত হয়। নিজের সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব তথ্য দেয় আমাকে। বিশাল ব্যবসা তার। এত বেশি আয় যে কল্পনা করা যায় না। খোঁজ নিয়ে দেখি, তার একটা কথাও মিথ্যে নয়। এ-কথা বলাটা মিথ্যে হবে যে ওর টাকা আর ক্ষমতা আমাকে লোভে ফেলে দেয়নি। অবশ্য অন্যান্য কারণও ছিল। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি সিস্টেম আমাকে প্রভাবিত করে। দরিদ্র একটা দেশের মেয়ে হয়ে সুপারমডেল হয়েছি, ইউরোপিয়ান মাফিয়ারা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখছে না। ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে চিঠি আসে, ফোন আসে। ভাবলাম কবিরকে বিয়ে করলে নিরাপত্তার দিকটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কারণ, কবির অত্যন্ত ভদ্র আর নরম মানুষ। অন্তত বিয়ে করার আগে তাকে আমার তা-ই মনে হয়েছে। কিন্তু বিয়ে করার এক মাস পরই একটু একটু করে টের পেলাম, সে আসলে আর্মস আর ড্রাগসের ব্যবসা করে। আমি তাকে এ-সব ত্যাগ করতে বলি, ব্যস, অমনি আগুন জ্বলে উঠল, বেরিয়ে এল ওর আসল চেহারা।'

'আপনি তাকে ছেড়ে চলে যাননি কেন? আপনি সিলেব্রেটী, পুলিস আর লইয়ারদের সাহায্য চাননি কেন?'

'কবিরের ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কি কোন ধারণা নেই? ওর মত একজন উন্মাদ যখন হুমকি দিয়ে বলে পালাতে চেষ্টা করলে বা কোন তথ্য ফাঁস করলে স্রেফ খুন করা হবে, কোন মেয়ের আর কিছু করার থাকে?'

'কবিরকে এতই যদি ভয় পান, তাহলে গোমেজকে দিয়ে হাসানকে মেসেজ পাঠাতে গেলেন কোন সাহসে?'

আঙুল দিয়ে নিজের মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখাল ইশরাত। 'এই নির্যাতন আমাকে বেপরোয়া করে তুলেছে, ভাই।'

লিভিং রুমে ফিরে এল পারভিন। রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসল সে, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

উত্তরে বাথরুমের দিকে তাকাল রানা। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে সেদিকে এগোল পারভিন, হাতব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাচ্ছে। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, তবে পুরোপুরি নয়, সিকি ইঞ্চির মত ফাঁক থাকল কবাট।

ইশরাত বিস্মিত হয়ে রানার দিকে তাকাল, কিন্তু রানা কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল, 'আমার একজন সহকর্মী আপনাকে ফোন করেছিল,

আপনি তাকে বলেছেন যে কবির আপনার ওপর নজর রাখছে না।'

'না, রাখছে না,' বলল ইশরাত। 'রাখলে গোমেজ আর সজীব ঠিকই জানতে পারত। ওরা প্রফেশন্যাল, ভাই। ভারতীয় একটা সিকিউরিটি কোম্পানী থেকে ওদেরকে আমার বীমা কোম্পানী আনিয়ে দিয়েছে। ওদের ভুলে বা বিশ্বাসঘাতকতায় আমার শারীরিক কোন ক্ষতি হলে আমার নমিনিকে দশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বীমা কোম্পানীকে। মৃত্যু হলে পঁচিশ কোটি টাকা। কাজেই বীমা কোম্পানীও ওদের সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়েছে। তাছাড়া, প্রায় তিন বছর হলো আমার সঙ্গে আছে ওরা, এমন কোন আচরণ করেনি যাতে সন্দেহ করা চলে।'

'তাহলে বলুন, কবির কি বোকা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার প্রশ্ন বুঝতে পারল না ইশরাত। 'মানে?'

'প্যারিস থেকে ইচ্ছে করলেই, কারও সাহায্য ছাড়াই, আপনি পালিয়ে যেতে পারেন, তাই না?' রানার ঠোঁটে তিক্ত হাসি। 'এই সুযোগ কেন আপনাকে দেয়া হলো?'

প্রশ্নটা নিয়ে তিন সেকেন্ড চিন্তা করল ইশরাত। তারপর ধীরে ধীরে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হতভম্ব, দিশেহারা লাগছে তাকে। 'সত্যিই তো!' বিড়বিড় করল। 'কেন?'

'উত্তরটা কি পানির মত সহজ নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তবে ভয় পাবেন না। আমরা যখন এসে পড়েছি, এখন আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে আপনাকে আমার আরও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'কিন্তু,' স্যুইট থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার দিকে চট করে একবার তাকাল ইশরাত, 'ইঙ্গিতে আপনি যা বলতে চাইছেন তা একেবারেই অসম্ভব, ভাই। ওরা...'

ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'সম্ভব কি অসম্ভব একটু পর নিজেই বুঝতে পারবেন। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'জ্বী। বলুন।'

'আপনার কোন ধারণা আছে, কবির এখন কোথায়?'

মাথা নাড়ল ইশরাত। 'নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে দুই দেশের এক দেশে চলে গেছে। হয় পাকিস্তানে, নয়তো বাংলাদেশে।'

'বাংলাদেশে?' রানা বিস্মিত। 'আবার?'

'ওখানে ওর অনেকগুলো ঘাঁটি আছে, সবগুলোর কথা আপনারা জানেন না,' বলল ইশরাত। 'আগামী মাসের কোন একদিন বাংলাদেশে মারাত্মক একটা কিছু ঘটাতে চায় ও। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল, দু'একটা কথা শুনে ফেলেছি। কিন্তু ঠিক কি ঘটাতে চায়, জানতে পারিনি। সেজন্যেই ভাবছি, সেভাইল থেকে সম্ভবত বাংলাদেশেই ফিরে গেছে ও।'

'পাকিস্তানেও যেতে পারে, এ-কথা কেন বললেন?'

'করাচীতে তার বিশাল ভূ-সম্পত্তি আছে। শহর থেকে অনেক দূরে, পাহাড়ী এলাকা, কিন্তু ওখানেই সে তার সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি বানিয়েছে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন কবির একটা রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান? ওর দলের নাম ভাই-ভাই পার্টি। মোহাজির কওমী মুভমেন্ট সহ চরমপন্থী সবগুলো দল তার পার্টির কর্মসূচী সমর্থন করে।' ইশরাতের চেহারায় দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটছে, লক্ষ করে বিস্মিত হলো রানা।

'হ্যাঁ, শুনেছি। কবির চায় বাংলাদেশকে আবার পূর্ব-পাকিস্তান বানাবে।'

'ওই পাহাড়ী এলাকায় দলের ক্যাডারদের ট্রেনিং দেয়া হয়,' ইশরাতের গলা হঠাৎ খাদে নেমে গেল। 'সেখানে কি ঘটছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। সারা দুনিয়া থেকে টেরোরিস্টদের ভাড়া করেছে কবির, বেকার যুবকদের ট্রেনিং দিচ্ছে তারা। হাজার হাজার যুবক, সবাই তারা সুইসাইড স্কোয়াডে নাম লিখিয়েছে।' থরথর করে কাঁপছে ইশরাত।

'আপনি শান্ত হন,' নরম সুরে বলল রানা।

'কি করে শান্ত হই?' ইশরাতের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'ওখানে আমি গেছি, ভাই! দেখে এসেছি কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে!'

'যাই ঘটুক, বাংলাদেশ কোনদিনই আর পাকিস্তান হবে না,' হাসিমুখে বলল রানা।

'আমি কি তা জানি না?' ইশরাতের গলায় চাপা উত্তেজনা। 'কিন্তু ভেবে দেখেছেন, এই ফ্যানাটিক ক্যাডাররা বাংলাদেশের কি ক্ষতি করতে পারে? আমি আরও অনেক তথ্য জানি। রোহিঙ্গা গেরিলা আর মৌলবাদী দলগুলোকে বিপুল অস্ত্র সরবরাহ করছে কবির। পাকিস্তান সরকার সব জেনেও না জানার ভান করে আছে।' হঠাৎ এগিয়ে এসে রানার একটা হাত চেপে ধরল মেয়েটা। 'কবির আমাকে মেরে ফেলবে, শুধু এই ভয়ে আমি আপনাদের সাহায্য চেয়েছি, এ-কথা সত্যি নয়। আমি প্রবাসী হলেও জন্মভূমিকে ভালবাসি। যখন বুঝতে পারলাম কবিরকে বুঝিয়ে পারা যাবে না, বাংলাদেশের ক্ষতি করার ক্ষমতাও তার আছে, তখন মরিয়া হয়ে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছি...'

'আপনি বলতে চাইছেন...'

'যদি বলেন, আমি তার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে রাজি আছি,' বলল ইশরাত। 'যে-কোন সাহায্য চান, পাবেন। এমন কি তার করাচীর ঘাঁটিতেও আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি। আপনাদের যাওয়া উচিত, তা না হলে তার ক্ষমতা সম্পর্কে...'

দরজায় নক হতে চুপ করে গেল ইশরাত।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল গোমেজ, সামনে একটা ট্রলি, ঠেলে নিয়ে আসছে। বাইরে থেকে ভেতরে একবার উঁকি দিল সজীব, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। ইশরাত জোর করে হাসল, বলল, 'ও, হ্যাঁ, তোমাকে কফির কথা বলেছিলাম। ধন্যবাদ, গোমেজ।'

রানার দিকে তাকিয়ে হাসল গোমেজ। 'আপনাদের জন্যেও এনেছি, তবে শুধু কফি, স্যার।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও, আমিই পরিবেশন করছি,' বলল ইশরাত।

'জ্বী,' বলে ট্রলি রেখে ঘুরল গোমেজ, দরজার দিকে হাঁটছে।

দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে তার পিছনে চলে এল রানা, এরইমধ্যে হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলটা। 'হল্ট!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও। স্থির হয়ে গেল গোমেজ। সারা শরীর আড়ষ্ট। 'পারভিন, সার্চ করো ওকে।' রানার পিস্তল গোমেজের ঘাড়ে ঠেকে আছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে গোমেজকে সার্চ করল পারভিন। শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল পাওয়া গেল, মোজার ভেতর লুকানো খাপে পাওয়া গেল ছোট একটা ছুরি।

গোমেজ নড়ছে না, শান্ত সুরে শুধু জানতে চাইল, 'ম্যাডাম, এ-সব কি ঘটছে?'

রানা ঘাড় ফিরিয়ে ইশরাতের দিকে তাকাল না, বলল, 'পাশের ঘরে লিসনিং ডিভাইস পাওয়া গেছে, ইশরাত। ফ্যাশন জগতের অনেকেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে, জার্নালিস্টরাও আসে, তাই না? তাদের সঙ্গে আপনি কি আলাপ করেন সব ওরা নিজেদের কামরায় বসে শোনে। আপনাকে আমি আগেই আভাস দিয়েছি, যতই পুরানো বা বিশ্বস্ত হোক, কবির ওদেরকে কিনে ফেলেছে।'

'প্রিয় যীশু, এসব তুমি আমাকে কি শোনাচ্ছ!' গোমেজের প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

ইশরাত বলল, 'ভাই, ওদেরকে আমি সত্যিই বিশ্বাস করি। কোন প্রমাণ ছাড়া...'

এই সময় ফোনটা বেজে উঠল।

'পারভিন, ফোনটা ধরো,' নির্দেশ দিল রানা।

পিছিয়ে এসে দেয়ালের হুক থেকে ফোনের রিসিভার নামিয়ে কানে ঠেকাল পারভিন। ত্রিশ সেকেন্ড পর রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। 'হোটেল থেকে লং ডিসট্যান্স একটা কল করা হয়েছে, রানা,' বলল সে। 'পাকিস্তান থেকে নটবর সিং তিনটে মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছে—কিল দেম অল।'

'ও আল্লাহ!' আঁতকে উঠল ইশরাত। 'কিন্তু নটবর সিং কে?'

'খায়রুল কবির,' বলল পারভিন। 'রানা?' পরবর্তী নির্দেশ চাইল সে।

'ইশরাত,' বলল রানা, 'আপনি দরজা খুলে সজীবকে ভেতরে ডাকুন। পারভিন, ওকে কাভার দাও।'

দরজার পাশে চলে গেল পারভিন, হাতে বেরেটা। গোমেজের ঘাড়ে পিস্তলের চাপ বাড়াল রানা, হাঁটতে বাধ্য করল। কামরার এক কোণে চলে এল দু'জন, দরজা খোলার পর বাইরে থেকে সজীব যাতে ওদেরকে দেখতে না পায়।

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল ইশরাত। 'শুনে যাও, সজীব।'

কিছুই সন্দেহ করেনি সজীব, ভেতরে ঢুকে পড়ল। ইশরাত দরজা বন্ধ করছে, পারভিন তার ঘাড়ে বেরেটা ঠেকাল।

'ইশরাত,' বলল রানা, 'আমাদের হাত খালি নেই, কাজেই সজীবকে

আপনিই সার্চ করুন।'

'কেন? এর মানে কি?' জানতে চাইল সজীব।

'সার্চ করলেই মানেটা বেরিয়ে আসবে, অন্তত আমার তাই ধারণা,' বলল রানা। 'ইশরাত!' তাগাদা দিল।

সজীবকে সার্চ করে পিস্তল, ছুরি আর ছোট্ট একটা কাচের শিশি পাওয়া গেল। শিশিটা পরীক্ষা করল রানা, তলায় সামান্য তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। ছিপি খুলে নাকের সামনে একবার তুলল। 'আর্সেনিক ট্রিওক্সাইড। ইঁদুর মারার জন্যে আদর্শ। সজীব ও গোমেজ, খুব কষ্ট পেয়ে মরতে হবে তোমাদের, কারণ তিন কাপ কফিই এখন তোমাদের দু'জনকে খেতে হবে।'

গা থেকে ফার কোটটা খুলে ফেলল ইশরাত। ঘেমে নেয়ে ওঠায় তার মেকআপের বারোটা বেজে গেছে। 'এ আমি কি করে বিশ্বাস করি!' মাথায় হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়।

'বসে পড়লে চলবে না,' বলল রানা। 'ওড়না বা রশি যোগাড় করুন, ওদেরকে বাঁধতে হবে।'

'রশি কোথায় পাব,' সোফা ছেড়ে বলল ইশরাত। ওয়ার্ড্রোব খুলে একজোড়া জর্জেটের ওড়না বের করল। 'আমার এত শখের ওড়না...'

ইশরাতই বাঁধল দু'জনকে। বাঁধনগুলো পরীক্ষা করল রানা। ইতিমধ্যে হোটেল কর্তৃপক্ষকে ফোন করেছে পারভিন। ইশরাতের স্যুইটের নম্বর জানিয়ে বলেছে, 'এখানে সুপারমডেল আর তাঁর দুই অতিথিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। পুলিস ডাকুন।'

হোটেলের ম্যানেজার কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে স্যুইটে পৌঁছুল। পুলিস এল আরও সাত মিনিট পর। পুলিসের সঙ্গে লাফাও এল, কিন্তু রানা ও পারভিন প্রথমে তাকে চিনতেই পারল না। হোটেলে কবিরের চর থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে নিজের ওপর অন্যায় করে ফেলেছে সে। বড় সাধের গোঁফ জোড়া কামিয়ে ফেলেছে।

সমস্ত দায়িত্ব আর ঝামেলা পুলিসের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ইশরাতকে নিয়ে হোটেল ছাড়ল ওরা। তার আগে অবশ্য নিজেদের স্যুইট থেকে ব্যাগগুলো আনিয়ে নিতে ভোলেনি। চার্লস দ্য গলে পৌঁছুল রাত দেড়টায়। খোঁজ নিতে জানা গেল ইশরাতের সী প্লেনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে, মেরামত করতে দু'দিন লেগে যাবে। আর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা ফ্লাইট করাচীর উদ্দেশে রওনা হবে আরও দশ ঘণ্টা পর, অর্থাৎ দুপুর বারোটায়। তবে নয়াদিল্লীর একটা ফ্লাইট পাওয়া গেল।

ইশরাতকে নিয়ে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি একটা থ্রীস্টার হোটেলে উঠল রানা। পারভিনকে প্লেনে তুলে দিয়ে লাফা তার নিজের ডেরায় ফিরে গেল, যাবার সময় রানাকে কথা দিয়ে গেল এগারোটার মধ্যেই ভিসা নিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করবে—সেটা বৈধ হোক বা জাল। রানা তাকে আরও একটা কাজ দিয়েছে—যদি সম্ভব হয় ভারতীয় পাসপোর্ট আর ভিসা তৈরি করাতে হবে

লাফা কথা দেয়নি, তবে বলেছে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

ছয়

করাচীতে ইশরাতের বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদেরই কারও বাড়িতে উঠতে চাইল সে। রানা রাজি হলো না। করাচী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্লেন তখনও ল্যান্ড করেনি, ইশরাত বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে চলুন ফাইভ স্টার কোন হোটেলে উঠি।'

রানা মাথা নেড়ে বলল, 'শহরে রানা এজেন্সির সেফ হাউস আছে, আপনার জন্যে সেটাই সবচেয়ে নিরাপদ হবে।'

'আমার জন্যে মানে? সেখানে কি একা শুধু আমি থাকব?' ইশরাতকে বিস্মিত দেখাল।

'মাত্র কয়েক ঘণ্টা,' বলল রানা।

'কিন্তু কেন?' রাগে হোক বা অপমানে, লালচে হয়ে উঠল ইশরাতের চেহারা। 'আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

মৃদু হেসে রানা জবাব দিল, 'যদি অবিশ্বাসও করি, আপনি কি আমাকে দোষ দিতে পারেন? ভেবে দেখুন, গোমেজ আর সজীব সম্পর্কে আপনি যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তা যদি বিশ্বাস করতাম, এখন কোথায় থাকতাম আমরা?'

'স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু তাই বলে...'

'প্রশ্নটা ঠিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নয়, ইশরাত,' বলল রানা। 'আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছি, কাজেই জেনেশুনে কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। মাকরানে, চৌধুরী এস্টেটে, আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যাচ্ছি, সম্ভব হলে কবিরের ওখানকার ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়ে আসব। এরকম একটা কাজে কোন মেয়েকে সঙ্গে রাখা স্রেফ বোকামি। বিশেষ করে আপনাকে নিয়ে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এলাকার বহু লোক আপনাকে চেনে।'

থমথমে চেহারা নিয়ে চুপ করে থাকল ইশরাত।

একটু পর রানা নরম সুরে বলল, 'আমি চাই কবিরের ওই এস্টেট ও ঘাঁটি সম্পর্কে আপনি যা জানেন সব আমাকে বিস্তারিত বলবেন। আপনাকে করাচীতে আনার সেটাই কারণ। ম্যাপ এঁকে সব আমাকে দেখিয়ে দেবেন কোথায় কি আছে।'

এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল লাউঞ্জে ওদের জন্যে দু'জন বেলুচ তরুণ অপেক্ষা করছে। রানা এজেন্সির করাচী শাখার এজেন্ট ওরা। প্যারিস থেকে আগেই ওদেরকে টেলিফোনে সতর্ক করে দিয়েছিল রানা। প্রাইভেট কার নয়, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে ওরা, নিজেরাই চালাবে। করাচীতে এটাই ওদের কাভার—ট্যাক্সি ড্রাইভার।

সেফ হাউসটা জিন্নাহ এভিনিউয়ের শেষ মাথায়, থানার ঠিক পাশের বিল্ডিঙে। গ্রাউন্ড ও ফার্স্ট ফ্লোরে কার্পেটের কারখানা। ইশরাত গুম হয়ে বসে আছে দেখে রানা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আপনার মত সিলেব্রেটীর উপযুক্ত আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থাই ওখানে আছে, চিন্তা করবেন না।'

'আপনি আমার পারিবারিক ইতিহাস জানেন না, জানলে এ-কথা বলতেন না,' জবাব দিল ইশরাত। 'যদি ভেবে থাকেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছি, ভুল করবেন। কিশোরগঞ্জে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। ছোটবেলায় বাবা মারা যান। কোন ডিগ্রী ছিল না, শুধু বই পড়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী শুরু করেন মা।'

'ইন্টারেস্টিং।'

'আমিই তাঁর একমাত্র মেয়ে। মেয়েকে অনেক বড় করবেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এটাই ছিল তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। অল্প অল্প করে পয়সা জমিয়ে আমাকে ঢাকায় এনে খুব নামকরা একটা স্কুলে ভর্তি করে দেন। আমার জীবনটাকে তিনি কঠিন এক রুটিনে বেঁধে ফেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে নাচের ওস্তাদ আসেন, গানের ওস্তাদ আসেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে কোচিঙে যেতে হয়, শুতে হয়, গল্প-উপন্যাস পড়তে হয়, ইংরেজি ছাড়াও জার্মান আর ফ্রেঞ্চ শিখতে হয়। হাত ধরে বিদেশী দূতাবাসগুলোয় নিয়ে যেতেন আমাকে, আমি যাতে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে মানুষজনের সঙ্গে সহজ হতে পারি, শুধু এই উদ্দেশ্যে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও আমার কোন স্বাধীনতা ছিল না। দিনে দুই লিটার পানি খেতে হবে, লাল মাংস খাওয়া নিষেধ, সকালে চিরতার পানি খেতে হবে, এরকম হাজারও নিয়ম।'

'আমি বলব আদর্শ জননী। তিনি এখন কোথায়?'

'আমি যেদিন প্যারিসের বিখ্যাত একটা ফ্যাশন হাউসে মডেল হিসেবে চাকরি পাই, তার পরদিনই হসপিটালে মারা যান,' বলল ইশরাত। 'প্যারিসেরই একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল—ক্যান্সার।'

'সত্যি আমি দুঃখিত।'

'মায়ের নামে ঢাকায় আমি একটা ডিজাইন সেন্টার খুলেছি, মেয়েদেরকে বিনা পয়সায় কাজ শেখানো হয়। আমার ওই সেন্টারের বহু মেয়ে এখন বিদেশে চাকরি করছে।'

'বাহ্।'

সেফ হাউসে পৌঁছুবার পর সম্পূর্ণ বদলে গেল ইশরাত। রানাকে নিয়ে টেবিলে বসল সে। কাগজে ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিল চৌধুরী এস্টেটের কোথায় কি আছে। 'শহরটা খুবই ছোট। তবে শহরের আশপাশের বিশাল ভূ-সম্পত্তি কবির চৌধুরী পানির দরে কিনে নেন, তিনি মারা যাবার পর একমাত্র ছেলে মালিক হয়েছে। এলাকায় পাহাড় তো আছেই, বিরাট বনভূমিও আছে।'

ইশরাতের কথা থেকে জানা গেল করাচী শহরে 'ভাই ভাই পার্টি'-র বিশাল অফিস আছে। কর্মী আর নেতারা সেখানে নিয়মিত মীটিং করে। তবে কবিরের গোপন মীটিংগুলো বসে মাকরান শহরে। ওখানেও তার একটা অফিস

বিল্ডিং আছে। ইশরাতের ধারণা প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরি হয় এখানে। সবাই জানে বিল্ডিংটায় একটা ল ফার্ম আছে, ওখানে তিনজন লইয়ার আইন ব্যবসা করেন। ইশরাতের সন্দেহ, ভাই-ভাই পার্টির সমস্ত গোপন দলিল আর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর তালিকা ওই বিল্ডিংটায় লুকিয়ে রাখা হয়। ওখানে বসেই কবির নির্দেশ দেয়, করাচীর কোথায় কখন বোমা মারা হবে। বাংলাদেশী মৌলবাদী নেতা, রোহিঙ্গা গেরিলা গ্রুপের লীডার, ইউরোপ ও আমেরিকার মাফিয়া ডন, সবাই ওখানে গোপনে দেখা করে কবিরের সঙ্গে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ইশরাতের আরও ধারণা, আগামী মাসে কবির বাংলাদেশে যে অপারেশনটা চালাবে, প্ল্যানটা যদি কাগজে-কলমে তৈরি করা হয়ে থাকে, সে-সব ওই মাকরান শহরের বিল্ডিংটায় পাওয়া যেতে পারে।

মাকরান শহর থেকে বেশ খানিক দূরে, পাহাড়শ্রেণীর একটা ভাঁজে, কবিরের ট্রেনিং ক্যাম্প। সেখানেও কয়েকটা বিল্ডিং আছে, আর আছে প্যারেড গ্রাউন্ড। ইশরাত দেখেনি, তবে শুনেছে যে ওখানে তার গোলাবারুদের গুদামও নাকি আছে। ট্রেনিং ক্যাম্পটার ম্যাপ আঁকল ইশরাত, বলল, 'জায়গাটার নাম উঁচা পাস।'

'তারমানে কি ট্রেনিং ক্যাম্পটা একটা গিরিপথের ভেতর বা আশপাশে?'

'না। গিরিপথের কাছাকাছি, একটা মালভূমির ওপর।'

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে মাকরান শহর ও চৌধুরী এস্টেট সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সব জেনে নিল রানা। বাজার করাই ছিল, আলোচনার ফাঁকে রান্নার কাজটাও নিজের হাতে সারল ইশরাত, রানাও অবশ্য তাকে সাহায্য করল। পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় রওনা হয়ে গেল ও। রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট ও কেয়ারটেকার ছাড়াও বয়স্কা এক মহিলা থাকল সেফ-হাউসে, তারাই ইশরাতের দেখাশোনা করবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে শহর থেকে বেরিয়ে এল রানা, শুরু হলো চড়াই-উৎরাই, দু'পাশে বালির পাহাড়। বোমা ফাটাবার পর পাকিস্তান নিজের অর্থনীতির কি অবস্থা করেছে তার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া গেল বেকার মানুষের শহরমুখী মিছিল দেখে। রাস্তার ধারে বাজার বসেছে, সে বাজারে পণ্য যেমন কম, ক্রেতা আরও কম। মরু এলাকার লোকজন নিজেরাই খেতে পাচ্ছে না, উটগুলোকে আর কি খাওয়াবে—হাড্ডিসার কঙ্কাল বললেই হয় ওগুলোকে।

মেইন রোড লেহরি ধরে সাড়ে আটটার দিকে মাকরানে পৌঁছুল রানা, করাচী থেকে সত্তর মাইল দূরে। সিন্ধু নদীর একটা খরস্রোতা শাখা শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। নদী এখানে এমনভাবে বাঁকা, প্রায় একটা বৃত্তই বলা যায়, সেই বৃত্তের ভেতর গড়ে উঠেছে লোকবসতি। বৃত্তের দক্ষিণ প্রান্তেই সমস্ত বাড়ি-ঘর ও রাস্তা, পুব দিকে বিশাল বিশাল পাথরের স্তূপ, স্তূপগুলো ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে।

রেন্ট-আ-কারের গাড়িটা শহরের উত্তর প্রান্তে একটা কার পার্কে থামাল রানা শহরের মাঝখানে এল পায়ে হেঁটে। কোন যান্ত্রিক বাহন চোখে পড়ল

না। রানার কাঁধে একটা গারমেন্ট ব্যাগ ছাড়া লাগেজ বলতে আর কিছু নেই। সরু কয়েকটা নির্জন গলি পেরিয়ে শহরের মাঝখানে চলে এল ও। মুদি দোকানের সাইনবোর্ডে রাস্তার নাম লেখা রয়েছে 'আসমারা খাস'। ইমারত আর ভবনগুলো রানার মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। নতুন বিল্ডিং মাত্র দুই কি তিনটে। বাকি সবই এত পুরানো আর ভাঙাচোরা যে প্রাচীন কোন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বলে সন্দেহ হয়।

চৌরাস্তার কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা, একশো গজ দূর থেকে নদীর নরম কলকল-ছলছল আওয়াজ ভেসে আসছে। শহরের এক প্রান্তে বেশ বড়সড় একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে, ভাঙাচোরা হলেও পরিষ্কার বোঝা যায় যে এককালে ওটা একটা দুর্গ ছিল। ইশরাতের ম্যাপে এই দুর্গটাও আছে, নাম ফতে আলি কিলাহ। কিলাহ আরবী শব্দ, স্থানীয় লোকেরা কিল্লা বলে, বাংলায় সেটা কেল্লা হয়ে গেছে।

শহরে লোকজন খুব কম। জোব্বা পরা এক মৌলানা সাহেবকে দেখা গেল, হাতে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছেন, মসজিদের পাশেই মক্তব বা মাদ্রাসা, ভেতরে কয়েকটা বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে। দু'একটা চা ও মুদি দোকান খোলা রয়েছে, ক্রেতাদের চেহারা ও কাপড়চোপড় অত্যন্ত করুণ। চেঙ্গিস খান এভিনিউয়ে একটা সরাইখানা দেখতে পেল রানা, ঢোকার মুখে একপাশে একটা হোন্ডা মটরসাইকেল চোখে পড়ল। সরাইখানার মালিক টেবিলের পিছনে বসে আছে, মাথায় জড়ানো সাদা পাগড়ি।

ভেতরে কোন খদ্দের নেই। মালিক খাতির করে নিজের টেবিলেই বসতে দিল রানাকে। কোন অর্ডার না দেয়া সত্ত্বেও ওয়েটারকে ডেকে নাস্তা আনতে বলল। শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থ উদ্ধার নয়, আতিথেয়তা প্রদর্শনের প্রবণতাও কাজ করছে এখানে। মালিকের এই ব্যবহারে খুশিই হলো রানা, গল্প করার ফাঁকে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। উর্দু ও ভালই বলতে পারে।

দু'মিনিটের আলাপেই জানা গেল, স্থানীয় লোকজন বিদেশীদের পছন্দ করে না। কারণটাও ব্যাখ্যা করল সরাইখানার মালিক। সমস্ত দোষ সে চৌধুরী এস্টেটের উত্তরাধিকারী খায়রুল কবিরের ঘাড়ে চাপাল। 'ভাই-ভাই পার্টি' বাংলাদেশকে আবার পূর্ব-পাকিস্তান বানাবার কর্মসূচী নিয়েছে, তার দৃষ্টিতে এটা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা। অথচ ভাই-ভাই পার্টির চেয়ারম্যান খায়রুল কবিরকে পাকিস্তান সরকার নীরবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সরকারের প্রশ্রয় পেয়ে চৌধুরী এস্টেটে ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে চেয়ারম্যান কবির। দেশ-বিদেশের সন্ত্রাসী আর গুণ্ডাপাণ্ডারা এখানে ট্রেনিং নিতে আসছে। ফলে এলাকার পরিবেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে ক্যাডাররা শহরে এসে স্থানীয় লোকজনকে ভয়-ভীতি দেখাত, বউ-ঝিদের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাত, কুকুর-বিড়ালের স্বর নকল করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করত। এ-সব ব্যাপার নিয়ে কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়, তারপর থেকে ক্যাডাররা আর এদিকে বড় একটা আসে না। কিন্তু তাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, এরইমধ্যে দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মাকরানের লোকজন স্বস্তিবোধ করছে

না। সংখ্যায় তারা কম, সংগঠিতও নয়, ফলে ট্রেনিং ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার জন্যে আন্দোলনও করতে পারছে না।

'ট্রেনিং ক্যাম্পটা কোথায়? কি ট্রেনিং দেয়া হয় ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা, কিছুই যেন জানে না।

'আপনিও তো বিদেশী, কি করে বুঝব ওদেরই একজন নন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সরাই মালিক। 'আগে নিজের পরিচয় দিন, এখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করুন।'

'আমি ভারত থেকে আসছি,' বলল রানা। 'নাম শাইখ খান। হিন্দু মৌলবাদী সরকার ক্ষমতায় আসায় মহারাষ্ট্রে টেকা দায় হয়ে উঠেছে, কারণ শিবসেনারা ওখান থেকে মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিচ্ছে। ভাবছি বউ-বাচ্চা নিয়ে পাকিস্তানে চলে আসব। আমি একজন শিল্পী, ছবি আঁকি। নির্জন জায়গা দরকার আমার। করাচীতে এসে শুনলাম মাকরানে নাকি জমি খুব সস্তা, তাই দেখতে এসেছি...'

হাত লম্বা করে চৌরাস্তার উল্টোদিকটা দেখাল মালিক। কাঠের একটা বিল্ডিং। দরজার পাশে পিতলের লম্বা একটা নেমপ্লেট। 'ওটা একটা ল ফার্ম, চৌধুরী এস্টেটের সয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করে। শাইখ খান, আপনাকে কেউ ভুল তথ্য দিয়েছে। চৌধুরী এস্টেটের এক ছটাক জায়গাও কেউ কোনদিন কিনতে পারেনি, পারবেও না। এমনকি এই শহরেও আপনার ঠাঁই হবে না, কারণ মাকরানের সব জমিও একে একে ওই ল ফার্মের সাহায্যে কিনে নিচ্ছে ভাই-ভাই পার্টির চেয়ারম্যান। তবু এত কষ্ট করে যখন এসেছেন, ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।'

'কার সঙ্গে কথা বলব?'

'তিনজন লইয়ার বসে ওখানে, আপনি মারুফ খানের সঙ্গে কথা বলুন।'

সরাইখানার একটা কামরা বুক করল রানা, তারপর স্থানীয় পোস্টাপিসে চলে এল করাচীতে ফোন করার জন্যে। রানা এজেন্সির এজেন্টকে জানাল মাকরানে নিরাপদেই পৌঁছেছে ও, ল ইয়ারদের সঙ্গে কথা বলার পর আবার ফোন করবে।

বিল্ডিংটা পুরানোই বলতে হবে। তবে কাঠের তৈরি হলেও অত্যন্ত মজবুত। জানালায় শাটার আছে, প্রায় সবগুলোই বন্ধ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নেমপ্লেটটা পড়ল রানা, ইংরেজিতে লেখা—অ্যাডভোকেট মারুফ খান, অ্যাডভোকেট নাজির খান অ্যান্ড অ্যাডভোকেট পিয়ার আলি চিশতি। দরজায় খুব দামী কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে, মেহগনি কিংবা আমদানি করা ওক হবে, কব্জাগুলো ইস্পাতের, ফ্রেমটা ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া। তালাটাও পরীক্ষা করল রানা—ইয়েল লক, প্রচলিত আকারের চেয়ে অনেক বড়। দরজার দু'পাশে চোখ বুলিয়ে তার-টার বা ইলেকট্রনিক্স বক্স আছে কিনা খুঁজল রানা। সফিসটিকেটেড অ্যালার্ম সিস্টেম আছে বলে মনে হলো না, তবে টেলিফোনের তারটা খুব উঁচু একটা পোল থেকে বিল্ডিংটার ডান কোণ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।

কলিংবেলে চাপ দিল রানা। কয়েক সেকেন্ড পরই দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে পকেট বহুল সবুজ ইউনিফর্ম পরা এক মেয়ে, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, বিড়ালাক্ষী। ইশরাত এই সালমা জোহরা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে রানাকে। কুংফু-কারাতে তো জানেই, রীতিমত স্যাডিস্টিক চরিত্র—দীর্ঘ সময় নিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে কুকুর-বিড়াল মারতে দেখে ইশরাত আঁতকে ওঠায় কবির তাকে বলেছিল, ঠিক এভাবে মানুষও মারতে পারে জোহরা। মেয়েটার বয়েস বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে। তার পিছন থেকে আরেক মহিলাকে আসতে দেখা গেল। ইনি বয়স্কা, প্রায় চল্লিশ, পরনের ঢোলা সালোয়ার কামিজ বাদামী সিল্ক, মাথায় জর্জেটের দোপাট্টা।

জোহরাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে মহিলা রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. শাইখ খান? খানিক আগে আপনিই ফোন করেছিলেন?'

'জ্বী,' বলল রানা। 'আমি অ্যাডভোকেট মারুফ খানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' ঠোঁটে অমায়িক হাসি।

'আসুন, জনাব,' বলে ঘুরলেন মহিলা। তাঁর পিছু নিয়ে হলরুমে ঢুকল রানা, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে, চারদিকে চোখ বুলাবার সময় সিদ্ধান্ত নিল বেরিয়ে যাবার সময় সুযোগ পাওয়া গেলে বিল্ডিঙের ভেতরটা আরও ভাল করে দেখে নিতে হবে। দু'তিনবার চোখ বুলিয়ে আড়িপাতা যন্ত্র বা অ্যালার্ম সিস্টেমের কোন আভাস পাচ্ছে না। একটা ডেস্কে শুধু একজোড়া কমপিউটর আর একটা বড় আকৃতির লেযার প্রিন্টার রয়েছে। ইতিমধ্যে দরজা বন্ধ করে কমপিউটরের সামনে বসে কি যেন টাইপ করছে জোহরা, এতই মনোযোগ যেন এই কাজের ওপরই তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

দোতলায় পাশাপাশি তিনটে দরজা, নেমপ্লেটে তিন অ্যাডভোকেটের নাম লেখা। ডান দিকে চলে গেছে করিডর, একটাই দরজা ওদিকে, বাথরুমের। মারুফ খানের দরজায় নক করলেন মহিলা, নিজেই সেটা খুলে বললেন, 'জনাব শাইখ খান।'

বিশাল এক ডেস্কে বসে আছে মারুফ খান, ডেস্কটা কামরার এক কোণে ফেলা। সেটা ঘুরে করমর্দনের জন্যে যখন এগিয়ে আসছে, রানা উপলব্ধি করল এতক্ষণ লোকটা দাঁড়িয়েই ছিল, কারণ ডেস্কের পিছন থেকে আসার সময় তাঁর উচ্চতা এক চুল বাড়েনি।

লোকটার বয়েস আন্দাজ করা কঠিন, ত্রিশ হতে পারে, আবার পঁয়তাল্লিশ বললেও মেনে নিতে ইচ্ছে করবে। লম্বায় সে চার ফুট দুই ইঞ্চি, তার বেশি হতেই পারে না, তা-ও জুতোর দুই ইঞ্চি সহ। সম্ভবত শারীরিক ত্রুটি পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই সদাহাস্যময় খোশমেজাজী একটা ভাব আয়ত্ত করেছে সে। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে রানাকে অভ্যর্থনা জানাল। 'বলুন জনাব, আপনার কি খেদমতে লাগতে পারি আমি।' রানাকে চেয়ারে বসিয়ে ডেস্কের পিছনে ফিরে গেল সে, কিন্তু নিজে বসল না, কারণ বসলে রানাকে দেখতে পাবে না।

প্রথমে মাকরান বা আশপাশের এলাকায় পাথর ভাঙার একটা মেশিন

বসাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করল রানা। তারপর জানাল, ও আসলে একজন শিল্পী, কিন্তু ছবি এঁকে তো পেট চলবে না, তাই রোজগারের একটা উৎস থাকা চাই—সেটার ব্যবস্থা হলেই বউ-বাচ্চা নিয়ে ভারত থেকে হিজরত করবে সে।

'উত্তম প্রস্তাব, শুনে বড় খুশি হলাম,' বলে খাতা-পত্র খুলে বিক্রয়যোগ্য জমি ও বাড়ির তালিকায় চোখ বুলাতে শুরু করল মারুফ খান। মিনিট পাঁচেক পর মুখ তুলে অমায়িক হাসি হেসে বলল, 'দুঃখিত। মাকরানে খালি বা বিক্রয়যোগ্য কোন জায়গা নেই। যেগুলো ছিল সেগুলো আকারে এত বিশাল যে আপনি কিনতে পারতেন না—দুটো কারণে। এক, দাম পড়ত অনেক বেশি। দুই, চৌধুরী এস্টেট আকারে বড় করার জন্যে সেগুলো বায়না করা হয়ে গেছে।'

রানা বলল, 'চৌধুরী এস্টেট তো এমনিতেই বিশাল, সেটাকে আরও বড় করার কি প্রয়োজন?'

হাসিমুখে তিক্ত কথা শোনাল মারুফ খান, 'চৌধুরী এস্টেটের সমস্ত বিষয় দেখাশোনা করে আমার ভাই, নাজির খান; কিন্তু দুঃখের কথা হলো এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমার বিশ বছর আলাপ হয় না। আমার যদি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকত, বহুকাল আগেই চৌধুরী এস্টেট দেখাশোনার কাজ অন্য কোন ফার্মকে দিয়ে ঝামেলা মুক্ত হতাম।'

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?'

আবার হাসল মারুফ খান, তিক্ততায় ভরা। 'অদ্ভুত এক লিগ্যাল পজিশনে আটকা পড়ে গেছি আমরা। কোম্পানীর চুক্তিতে বলা আছে খান ও চিশতি পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই ফার্ম ত্যাগ করতে পারবে না।'

'সত্যি অদ্ভুত। কিন্তু কেন?'

'এই চুক্তির মাধ্যমে খান আর চিশতি পরিবারকে চিরকালের জন্যে এক সুতোয় বেঁধে রাখা হয়েছে। এর পিছনে ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। এই ধরুন পঞ্চাশ বছর আগে খান আর চিশতি পরিবারের পুরুষ সদস্যরা কবির চৌধুরীর খানসামা ছিল। কবির চৌধুরী বাঙ্গাল হলে কি হবে, মহৎপ্রাণ মানুষ ছিলেন। খান ও চিশতি পরিবারের তিনজনকে তিনি ওকালতি পড়ান। তারপর এই ল ফার্ম গঠন করার পরামর্শ দেন। দুই পরিবার যাতে কোন দিন বিচ্ছিন্ন হতে না পারে, তার ব্যবস্থা করেন নিজের হাতে লেখা ওই চুক্তিপত্রে।'

'কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো, আপনাদের মধ্যে সদ্ভাব নেই?'

'আপনাকে তো বললামই, ভাইয়ের সঙ্গে বিশ বছর কথা বলি না। সে আমার চেয়ে সাত বছরের বড়। তার স্ত্রী আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন না। জীবনের শেষ দিকে আম্মুর সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিল, কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে আব্বু আমাকে না চেনার ভান করতেন। দুনিয়া বড় আজব জায়গা, জনাব শাইখ—তবে এই ভুল বোঝাবুঝির সঙ্গে আমার বামুনত্বের কোন সম্পর্ক নেই। খান পরিবারের প্রতি চারজন পুরুষের মধ্যে একজন আমার মত বেঁটে হয়ে জন্মায়। আমি খাটো সেজন্যে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। তবে

রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা দেখছি, সত্যি কথা বলতে কি, আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না।'

'একটু ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'আমার ব্যাখ্যা শুনে কেন আপনি মূল্যবান সময় নষ্ট করতে যাবেন?' বলল মারুফ খান। 'তারচেয়ে নিজের চোখেই দেখে আসুন না। আজ রাত ন'টায় উঁচা পাসে যান, তাহলেই আপনার চোখ খুলে যাবে—সেই সঙ্গে জমি কিনে এখানে বসবাস করার খায়েসও চিরকালের জন্যে মিটে যাবে।'

রানার সন্দেহ হলো, হাসিমুখে লোকটা তাকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিচ্ছে।

আরও পাঁচ মিনিট আলাপ করল ওরা। মারুফ খান কথা দিল, উঁচা পাসে আজ রাতে রানার যে অভিজ্ঞতা হবে, তারপরও যদি এখানে বসবাস করার ইচ্ছে অবশিষ্ট থাকে ওর, ওকে একখণ্ড জমি পাইয়ে দেয়ার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করবে সে।

রানাকে বিদায় দেয়ার সময় ল্যান্ডিং পর্যন্ত হেঁটে এল মারুফ খান। ওরা হ্যান্ডশেক করছে, এই সময় পিয়ার আলি চিশতির অফিস কামরার দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে এল রানা, কারণ অফিস থেকে আক্ষরিক অর্থেই বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড এক দৈত্য। লোকটা ছয় ফুট চার ইঞ্চি তো হবেই, বেশিও হতে পারে। হাত দুটো মোটা ল্যাম্পপোস্টের মত, আঙুলগুলো যেন ইস্পাতের তৈরি কলার ছড়া। মাথাটা কামানো।

'সব ঠিক আছে, চিশতি,' নরম সুরে বলল মারুফ। 'তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।'

'ও, বেশ-বেশ, তাহলে তো ভালই,' পিয়ার আলি চিশতির গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক কর্কশ, যেন খুব ধীর ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে শক্ত সুপারি ভাঙা চলছে মুখের ভেতর। তার ঠোঁটেও হাসি, তবে সে হাসি ঠোঁট ছাড়া অন্য কোথাও পৌঁছায়নি। ঘুরল না, পিছিয়ে অফিসে ফিরে গেল সে। এরকম প্রকাণ্ড শরীরের ক্ষিপ্র বেগ লক্ষ্য করে বিস্মিত হলো রানা। লোকটা যেন চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মারুফ খান ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'চিশতি পরিবারেও প্রতি ছ'জন পুরুষের মধ্যে একজন এ-ধরনের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। সে পার্টনার হলেও, কোন কাজ করে না। করে না মানে পারে না আর কি। তবে গুণ নেই, তা ভাববেন না। তার স্মরণশক্তি অসাধারণ। বিশ বছর আগে দেখা লোককেও চিনতে পারে। আরেকটা কথা, ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব বদমেজাজী সে। ভুলেও ওর সঙ্গে লাগতে যাবেন না। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, একটা মানুষকে স্রেফ টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে চিশতি। নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতনও খুব, হারকিউলিসের যুগে জন্মায়নি বলে দুঃখের সীমা নেই তার। আপাতত বিদায়, জনাব শাইখ খান। জেসমিন আপনাকে নিচে নিয়ে যাবে, আর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে জোহরা। ওরা দু'জনেই আমার কাজিন।'

নিচে নেমে জোহরাকে রানা বলল, 'পিটিভিতে আমি তোমার গান

শুনেছি। তোমার গলা সত্যি খুব ভাল।'

মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত ঝাপটাল জোহরা। 'আরে ধ্যাত। সে তো আমার ছোট বোন, তসলিমা জোহরা। তবে দু'জনেই আমরা স্টার—সে সঙ্গীতে, আমি মার্শাল আর্টে।'

চেঙ্গিস খান এভিনিউয়ে বেরিয়ে এসে সরু একটা গলিতে ঢুকল রানা, এ-পথ সে-পথ ঘুরে চলে এল ল ফার্মের পিছন দিকটায়। বিল্ডিংটায় কোথাও কোন ইলেকট্রনিক্স সিকিউরিটি বা অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। পিছনের দরজায় তালাটাও সাধারণ। তবে ভেতরে যদি ঢুকতে হয়, রাতে ঢোকাই নিরাপদ। ল ফার্মের অফিস কামরা সার্চ করতে হবে ওকে, দেখতে হবে লিখিত কোন কর্মসূচী বা নকশা পাওয়া যায় কিনা। শোনা যাচ্ছে আগামী মাসে খায়রুল কবির বাংলাদেশে বড় ধরনের একটা অপারেশন চালাবে। তাকে বাধা দিতে হলে প্রস্তুতি দরকার, তার আগে দরকার নিরেট প্রমাণ।

শহরের উত্তর প্রান্তে, কার পার্কে চলে এল রানা। রাতে যদি তৎপর হতে হয়, দিনের আলোয় চারদিকটা একবার দেখে রাখা উচিত, বিশেষ করে পালাবার একটা পথ আগে থেকেই ঠিক করে রাখা দরকার। গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসল, এটা-সেটা নাড়াচাড়ার ছুতোয় ভিউ মিররে চোখ রেখে দেখে নিল কেউ ওকে লক্ষ করছে কিনা। বোরখা পরা দু'একজন মহিলা ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না, যে যার গন্তব্যে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে।

কার পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে শহর ত্যাগ করল রানা। এই মুহূর্তে মেইন রোড লেহরিতে রয়েছে ও, এই লেহরি ধরেই করাচী থেকে মাকরানে পৌঁছেছে। শহরে ঢোকার মুখে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় পথটা সরু একটা গলির মত, যেন পরিত্যক্ত। গলিটা ধরে খানিক দূর যাবার পর ডান দিকে বাঁক নিতে হলো। গলির পাশের দেয়ালে একটা সাইনবোর্ড দেখল রানা—'বিপজ্জনক। প্রবেশ নিষেধ'। সরু পথটা মসৃণ একটা মালভূমিতে নিয়ে এল ওকে, মালভূমির শেষ প্রান্তে স্তূপ হয়ে আছে টন টন পাথর। এক সারিতে কয়েকটা সাদা ওয়ার্নিং পোল দেখা পেল। মাকরানের যে-কোন জায়গা থেকে নদীর শব্দ পাওয়া যায়, তবে এখানে নদীর আওয়াজ রীতিমত জোরে শোরে গর্জন করছে। কাঠের পোলগুলোর কাছে চলে এল রানা, উঁকি দিয়ে দেখল পাহাড়-প্রাচীরের পা খাড়া দুশো ফুট নিচে নেমে গেছে। সরাসরি নিচেই নদী, কিনারাটা পাথরের।

সরাইখানায় ফেরার পথে পোস্টাফিস থেকে আবার করাচীতে ফোন করল রানা। 'আমি ভালই আছি,' রানা এজেন্সির এজেন্টকে জানাল। 'ইশরাত কেমন আছে?'

'ভাল।'

'আজ রাতে আমি বেরুচ্ছি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা, ফিরে এল সরাইখানায়।

কালো জিনস, বোল নেক আর ডেনিম জ্যাকেট পরে রাত সাড়ে আটটায় তৈরি

হয়ে নিল রানা। ডান নিতম্বে হোলস্টার, জ্যাকেটে চাপা পড়ে আছে; স্পেয়ার অ্যামুনিশন ম্যাগাজিনগুলো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঠাঁই পেয়েছে, ছুরিটা থাকল বাম বাহুর সঙ্গে স্ট্র্যাপে আটকানো। পকেটে একটা সুইস আর্মি নাইফ আর টর্চও নিয়েছে। প্রস্তুতি নেয়া শেষ হতে ইশরাতের আঁকা ম্যাপটা খুলে আরেকবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল উঁচা পাসের কোথায় কি আছে।

গাড়িতে দশ মাইলের পথ, পথটা চড়াই ও উৎরাই-এর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, দু'পাশে কখনও ঘন বনভূমি, কখনও পাথুরে পাহাড়, কোথাও জনবসতির কোন চিহ্ন নেই। তারপর সামনে পড়ল চৌধুরী এস্টেটের বাউন্ডারি ওয়াল। গাড়িটা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে রেখে রাস্তা পার হলো রানা, পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চোখে অন্ধকার সইয়ে নিচ্ছে। রাস্তা থেকে এদিকের ঢাল ক্রমশ উঁচু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে, জানে ও। পাঁচিলটা যথেষ্ট উঁচু হলেও গায়ে গর্ত থাকায় মাথায় চড়তে কোন অসুবিধে হবে না। ঢালের মাথায় উঠতে পারলে তিনশো গজ নিচে একটা পুরানো বাড়ি দেখতে পাবে।

ঢাল বেয়ে সাবধানে উঠছে রানা, মাঝে মধ্যে ঝোপের আড়ালে থেমে কান পাতছে। আরও খানিক ওপরে ওঠার পর চূড়ার উল্টোদিকে আলোর আভা কাঁপতে দেখল। গলার আওয়াজও পাচ্ছে—যান্ত্রিক, লাউডস্পীকার থেকে ভেসে আসছে। এই কণ্ঠস্বর রানার পরিচিত।

চূড়ার মাথায় উঠে এসে নিচে তাকাতেই দৃশ্যটা বিহবল করে তুলল রানাকে। বাড়িটা বিশাল, সমতল একটা মালভূমির মাঝখানে, আগুনের উজ্জ্বল লাল শিখায় আলোকিত হয়ে আছে। ধূসর ও বাদামী রঙের পাথর দিয়ে তৈরি বাড়িটা, কাঠামোটা দুর্গের মত, পঞ্চাশ কি ষাট ফুট উঁচু। তিনতলায় একটা বারান্দা আছে, গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে সেটা, সিঁড়িটা বাড়ির সামনের দিকে, ধাপগুলো দশ-বারো ফুট চওড়া। সিঁড়ির মাথায়, প্রশস্ত বারান্দায় কাঠের একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে, পরনে সাদা ও সবুজ রঙের ইউনিফর্ম, বক্তৃতা দিচ্ছে খায়রুল কবির। তার দু'পাশে অনেক লোকজন, সবার পরনে একই ধরনের ইউনিফর্ম—সবুজ আর সাদা কাপড়ের তৈরি সাফারি স্যুট, ডান বুকের কাছে চাঁদ ও তারা এমব্রয়ডারি করা—পাকিস্তানী পতাকার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়, বাম বুকে আরবীতে কিছু লেখা আছে, এত দূর থেকে পড়া গেল না।

সিঁড়ির গোড়ায় প্যারেড গ্রাউন্ড, সেখানে জড়ো হয়েছে তিন কি সাড়ে তিন হাজার তরুণ। সাধারণ শ্রোতার মত এলোমেলোভাবে নয়, তারা সুশৃঙ্খল কোন বাহিনীর অনুকরণে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, সিনা টান টান, কেউ একচুল নড়ছে না, প্রত্যেকের হাতে একটা করে লম্বা মশাল। অসংখ্য মশাল, সবগুলোর মিলিত শিখা বাড়ি ও প্যারেড গ্রাউন্ড আলোকিত করে রেখেছে, বারান্দার পিছনের দেয়ালে বিশাল ছায়া পড়েছে খায়রুল কবিরের।

...আমি আবার বলছি, এই বোমা ইসলামী বোমা। পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে খোদ আল্লাহ তাঁর রহমতের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। কাজেই দুনিয়ার যেখানে যত মুসলমান আছে তাদের সবার হক আছে এই বোমার ওপর। এই

বোমা ইরাকী ভাইদের সাহায্যে আসবে, কাশ্মীরী ভাইদের সাহায্যে আসবে, সাহায্যে আসবে বসনিয়ার মুসলমানদের ও ফিলিস্তিনী গেরিলাদের। তবে,' এখানে নাটকীয় বিরতি নিল কবির, '...তবে, সবার আগে দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানকে এক করতে হবে। এটা আমাদের প্রথম কাজ, পবিত্র দায়িত্ব।

'ভাইসব, স্বয়ং আল্লাহর রহমতে আমরা বোমা পেয়েছি। সেই পরম করুণাময়ের ইচ্ছাতেই আগামী মাসের তিন তারিখে প্রাণের দুশমনের ওপর প্রথম আঘাত হানতে যাচ্ছি আমরা। আঘাতটা হবে মৃদু, সামান্য একটা টোকা, তাতে খুব বেশি হলে পাঁচ-সাতশো কাফের মারা যাবে; কিন্তু এই আঘাতের তাৎপর্য বিশাল। তিন তারিখের ওই আঘাতটাকে পূর্ব-পাকিস্তান ফিরে পাবার জন্যে যে যুদ্ধ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তার সূচনা বলে গণ্য করতে হবে। দুশমনকে বুঝিয়ে দিতে হবে, পাল্টা আঘাত করার জন্যে আমরা প্রস্তুত।' পথভ্রষ্ট তরুণদের উন্মত্ত উন্মাদনায় সামিল করার জন্যে আবেগে থরথর কণ্ঠে ধর্মীয় জিকির তুলল সে, 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালাকে বাদ!'

তিন তারিখ... পাঁচ-সাতশো কাফের...রানার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এতই অন্যমনস্ক যে ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে আসা বিপদটা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। জানা কথা কবিরের লোকজন চৌধুরী এস্টেটের চৌহদ্দির ভেতর সশস্ত্র টহলের ব্যবস্থা করে রেখেছে, কিন্তু সে-কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে ও।

প্রথমে চোখের কোণে সামান্য একটু নড়াচড়া ধরা পড়ল, ওর বাম দিকে। ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই পঞ্চাশ গজ দূরে সাদা ও সবুজ ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোককে দেখতে পেল, চেইন খুলে একজোড়া জার্মান শেফার্ড অ্যাটাক ডগ মুক্ত করছে। অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ট্রেনিং পাওয়া কুকুর, এখন তারা চাপা গর্জন ছেড়ে প্রায় উড়ে আসছে ওর দিকে।

চূড়ার মাথায় হাঁটু মুড়ে বসে ছিল রানা, লাফ দিয়ে সিধে হয়েই ঘুরল, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে পাঁচিলের দিকে। ওই পাঁচিল টপকে রাস্তা পেরুতে হবে ওকে, তারপর ঝোপের ভেতর লুকানো গাড়িতে উঠতে হবে। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, পাঁচিলের কাছে পৌঁছুনোর আগেই কুকুর দুটো ওর নাগাল পেয়ে যাবে।

হাল ছাড়ার পাত্র নয়, এরইমধ্যে ডান হাতে অটোমেটিক পিস্তল আর বাম হাতে ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে। প্রাণ নিয়ে ছুটছে রানা, একজোড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ওর আরও কাছে চলে আসছে কুকুর দুটো।

পাঁচিলের কাছে পৌঁছানো গেল, কিন্তু ওপরে ওঠা হলো না, তার আগেই প্রথম কুকুরটা ওর নাগাল পেয়ে গেল। ধরা পড়ে গেছে, বুঝতে পেরে পাঁচিলের দিক পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রানা। ইতিমধ্যে ওর বুক লক্ষ্য করে লাফ দিয়ে ফেলেছে কুকুরটা। ঝট করে নিচু হলো ও, মুখটা ওপর দিকে তোলা। শেফার্ডটা ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দেখে ছুরি ধরা বাম হাতটা

ক্ষিপ্রবেগে ওপর দিকে তুলল রানা। লম্বা ফলা সবটুকু সেঁধিয়ে গেল শেফার্ডের বুকে, ছুরিটা বেরিয়ে গেল হাত থেকে। পাঁচিলে ধাক্কা খেলো হিংস্র জানোয়ার, হার্ট দু'ফাঁক হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। পাঁচিলের গোড়ায় ভারী বস্তার মত পড়ল লাশটা, সেটার ওপর পা দিয়ে পাঁচিলের মাথা ধরল রানা বাম হাতে, ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত ঝাঁকি খেলো শরীর, পাঁচিলের মাথায় কোন বিরতি না নিয়ে উল্টোদিকে অর্থাৎ রাস্তার ওপর পড়ল, সিধে হয়েই ছুটল নাক বরাবর।

রাস্তাটা পেরুতে পারেনি, পাঁচিল টপকে নিচে নামল দ্বিতীয় শেফার্ড। পিছন ফিরে তাকায়নি রানা, চাপা গর্জন শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। রাস্তা পেরিয়ে গাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে ও, উপলব্ধি করল প্রাণে বাঁচতে হলে লড়াই করতে হবে। ঘুরতেই দেখতে পেল ওকে লক্ষ্য করে এরইমধ্যে লাফ দিয়েছে শেফার্ড, না ঘুরে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করলে পিঠের ওপর পড়ত, দুই চোয়ালের মাঝখানে আটকে কামড় বসাত ঘাড়ে। পিঠে নয়, পেটে এসে পড়ল জানোয়ারটা। ছিটকে পিছিয়ে এল রানা, ধাক্কা খেলো ফোক্সওয়াগনের গায়ে, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। অসহ্য, তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল ডান কব্জির ওপরে, দাঁত বসিয়ে মাংস ছেঁড়ার জন্যে টানাটানি করছে কুকুরকটা। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্ক গ্রাস করল রানাকে, মনে হলো হাড় থেকে সমস্ত মাংস খসিয়ে ফেলছে। এই সময় একটা ভুল করে ফেলল শেফার্ড, রানার শরীর আর পিস্তলের মাঝখানে চলে এসেছে। ট্রিগারে আটকানোই ছিল আঙুল, টেনে দিল ও। ঝাঁকি খেয়ে পিছন দিকে ছিটকে পড়ার আগেই মারা গেছে বলে মনে হলো।

পাঁচিলের মাথা থেকে দু'জন লোককে লাফ দিয়ে রাস্তায় নামতে দেখল রানা। আর কি দেরি করে, দরজা খুলে গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিল। ঝোপের ভেতর থেকে রাস্তায় উঠে আসছে গাড়ি, দুটো বুলেট লাগল বনেটে। মাথাটা নিচু করে রেখেছে, কি ক্ষতি হলো দেখতে পায়নি। স্পীড বাড়িয়ে বাঁক ঘুরল, ফিরে যাচ্ছে মাকরানে।

মিশন সফল করতে হলে জরুরী একটা কাজ সারতে হবে ওকে. তার আগে মাকরান ত্যাগ করা উচিত হবে না। খায়রুল কবিরের পুরো বক্তৃতা শোনা হয়নি ওর, ফলে জানা হয়নি তিন তারিখে কোথায় কি ঘটতে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পর রানা নিশ্চিত হলো, পিছু নিয়ে কেউ আসছে না। তবে এখুনি না এলেও, একটু পর ঠিকই আসবে। শেফার্ডের টেনাররা ওর গাড়িটা দেখেছে, কবিরকে তারা রিপোর্ট করবে। রিপোর্ট পেয়ে কবির তার লোকজনকে কি নির্দেশ দেবে সেটা আন্দাজ করা কঠিন নয়।

রাত সাড়ে দশটায় মাকরান শহরের উত্তর প্রান্তের কার পার্কে পৌঁছুল রানা। গাড়িটা এক কোণে থামাল ও। সঙ্গে সঙ্গে নামল না, ডান হাতের বাহুটা পরীক্ষা করল। ক্ষতগুলো থেকে রক্ত ঝরছে, তবে দাঁত বেশি গভীরে ঢোকেনি। একটা রুমাল দিয়ে শক্ত করে হাতটা বাঁধতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল, আস্তিন নামিয়ে ঢেকে দিল ব্যান্ডেজটা। সময়ের এখন এতই মূল্য, অপচয়

করলে প্রাণ হারাতে হতে পারে। গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে মিনিয়েচার ক্যামেরাটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামল, নির্জন রাস্তা পেরিয়ে লইয়ারদের কাঠের বিল্ডিঙের পিছন দিকে চলে এল।

মাস্টার কী দিয়ে তালা খুলতে আধ মিনিটও লাগল না। ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। টর্চ জ্বালল এক মিনিট পর, হাত দিয়ে আলোটা ঢেকে রেখেছে। প্যাসেজ থেকে এন্ট্রান্স হলে চলে এল, কোথাও কোন শব্দ নেই। কমপিউটরগুলো চোখে পড়ল, প্লাস্টিক কাভার দিয়ে ঢাকা। এখানেও কান পেতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। গোটা বিল্ডিং নিস্তব্ধ হয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে এল।

রানা থামল নাজির খান লেখা দরজার সামনে। আজ সকালে চৌধুরী এস্টেট সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে মারুফ খান, কাজেই ধরে নিতে হয় খায়রুল কবিরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর নয়। ভাই-ভাই পার্টির দলীয় বা ব্যক্তিগত কোন গোপন দলিল-পত্র বা কর্মসূচীর অস্তিত্ব আদৌ যদি থাকে, নাজির খানের অফিস কামরাতেই থাকবে। মারুফ খান অভিযোগের সুরে বলেছে, চৌধুরী এস্টেটের সমস্ত বিষয় তার বড় ভাই নাজির খানই দেখাশোনা করে।

অফিস কামরাটা খোলাই পেল রানা, অর্থাৎ তালা দেয়া নয়। ভাগ্যটা ভালই, খুশি মনে ভাবল রানা। একটা কেবিনেটের গায়ে লেবেল সাঁটা রয়েছে, তাতে লেখা, 'ভাই-ভাই পার্টির ফাইল'। প্রতিটি দেরাজে তালা দেয়া, তবে সঙ্গে বিভিন্ন মাপের চাবি থাকায় সবগুলোই খুলতে পারা গেল। যদিও কোন লাভ হলো না। দলীয় প্রচার-পত্র, মেনিফেস্টো, চাঁদা তোলার বই, লিখিত ভাষণ, নেতা ও পাতি-নেতাদের তালিকা ইত্যাদি সবই আছে, কিন্তু গোপন কোন অপারেশন বা প্ল্যান সংক্রান্ত কোন ফাইল বা কাগজ নেই। আরও দুটো ফাইল কেবিনেট পরীক্ষা করল রানা। লাভ হলো না। ডেস্কের দেরাজ খুলে পেল ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীর নাম ঠিকানা, প্রতিটি নামের বিপরীতে মোটা অঙ্কের টাকা লেখা আছে। প্রায় নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া চলে, এরা সবাই ভাই-ভাই পার্টির গোপন সদস্য, বেশির ভাগই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকার ছিল, এখনও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। পুরো তালিকার ফটো তুলল রানা, প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। এদের মধ্যে গোলাম মাওলা আর কলিম চৌধুরীর নামও আছে। মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের এক কুখ্যাত নেতার নামের পাশে এক লাইনের একটা মন্তব্য লেখা রয়েছে। ছোট্ট হলেও, তাৎপর্যটুকুর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে রানার অসুবিধে হলো না—'ফজলুলউদ্দিন তালুকদার: তিন তারিখে সনম্যারন পয়েন্টে তাঁকে তাঁর ইয়ট সুইট হোম নিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।'

এটাই একমাত্র প্রমাণ, তিন তারিখে খায়রুল কবির কিছু একটা করতে যাচ্ছে। রহস্যটা হলো সনম্যারন পয়েন্ট। কোথায় সেটা? নিশ্চয়ই সাগরে কোথাও। কিন্তু কোন সাগরে? ফজললউদ্দিন তালুকদারকে ধরে ইন্টারোগেট

করলে আশা করা যায় সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। সনম্যারন শব্দটা আগে কখনও শুনেছে বলে রানা মনে করতে পারছে না।

এ নিয়ে পরে গবেষণা করা যাবে, অফিস কামরাটা আরেকবার দ্রুত তল্লাশী চালিয়ে পিয়ার আলি চিশতির কামরায় ঢুকল রানা। দ্রুত কয়েকটা দেরাজ পরীক্ষা করে কিছুই পেল না। চৌধুরী এস্টেটের আয়-ব্যয় আর রক্ষণাবেক্ষণ খাতে কত খরচ হয়েছে, ক্যাডারদের ভরণ-পোষণ বাবদ কত ব্যয় হয়েছে, অস্ত্রের চালান ছাড়াতে কত টাকা লেগেছে, বিভিন্ন খাতা-পত্রে শুধু এ-সবই লেখা। ইতিমধ্যে রানার একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেছে। আর্মস আর ড্রাগস ব্যবসার কোন কাগজ-পত্র ল ফার্মে রাখেনি কবির। এমন কোন কাগজ-পত্র এখানে নেই যা তার বিরুদ্ধে আদালতে ব্যবহার করা যাবে। ইশরাতের সন্দেহ ভুল, কবির আসলে তার সমস্ত গোপন কাগজ-পত্র চৌধুরী এস্টেটে রেখেছে।

কিন্তু এখন আর সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব হলেই বা কি, চৌধুরীর ওই ঘাঁটিতে একটা মাছিও গলতে পারবে না। ভেতরে তল্লাশী চালাতে হলে পুলিস নয়, সেনাবাহিনীর সাহায্য দরকার হবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারই যেখানে কবিরকে সাহায্য করছে, সেখানে সেনাবাহিনীর সাহায্য পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

একটা জানালা খুলে বিল্ডিঙের বাইরেটা দেখে নিল রানা। সামনের রাস্তা ফাঁকা পড়ে আছে। এই সুযোগে কেটে পড়া দরকার। সরাইখানার বিল মিটিয়ে রাতেই করাচীতে পৌঁছুতে হবে ওকে। তবে ততক্ষণে কবিরের লোকজন ওর খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। করাচীতে পৌঁছুতে পারলে সেফ হাউসে আশ্রয় পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করতে না পারলে তিন তারিখ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানার সুযোগ হবে না। ও করাচীতে লুকিয়ে আছে, এটা বুঝতে পারলে সিআইডি পুলিসের সাহায্যে শহর থেকে বেরুবার পথ বন্ধ করে দেবে কবির, শহরের টেলিফোন লাইনে আড়িপাতা যন্ত্রও বসাবে—রানা কোথাও ফোন করলে তা যাতে ট্রেস করতে পারে।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় নিজেকে আশ্বাস দিল রানা, সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আছে।

সিঁড়ির গোড়ায় পা দিয়েছে, হঠাৎ হলরুমের আলো জ্বলে উঠল।

'এই যে, জনাব শাইখ—নাকি মাসুদ রানা বলব? সাবধানে, ধীরে ধীরে এদিকে হেঁটে আসুন, আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলি।' সাদা ইউনিফর্মের ওপর মিলিটারি টাইপ রেইনকোট পরেছে সালমা জোহরা, হলরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শরীরের কাছাকাছি হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল।

'জোহরা? হাই,' বলল রানা, হাসিটা ছড়িয়ে দিল সারা মুখে। 'তুমি তাহলে আমার চিরকুটটা পেয়েছ! সত্যি কথা বলতে কি, নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছি না—মানে, সত্যি ভাবিনি তুমি আসবে।' হেঁটে আসার সময় এমন ভাব করল, পিস্তলটা যেন দেখতেই পায়নি; হাত দুটো বাড়িয়ে দিল.

যেন আলিঙ্গন করবে।

'আপনার চিরকুট? আমি···? আপনার কথা তো আমি বুঝতেই পারছি না, জনাব···?'

জোহরার একেবারে কাছে চলে এসে ইচ্ছে করে হোঁচট খেলো রানা, তাল সামলাবার জন্যে এমন ভঙ্গিতে ধরল মেয়েটাকে, ট্রিগারে টান দিলেও গুলিটা যাতে শরীরে না লাগে। 'জোহরা, কি খুশি যে হয়েছি! এখন তুমিই বলো, তোমাকে খুশি করার জন্যে কি প্রেজেন্ট করতে পারি?'

জোহরাকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল রানা তার হাত থেকে পিস্তলটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিতে। ডান হাত দিয়ে আলিঙ্গন করেছিল রানা, হাতটা তুলে তার ঘাড় চেপে ধরল, পিস্তলটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে বাম হাত দিয়ে ঘুসি মারল কিডনির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল জোহরা। ধীরে ধীরে তাকে মেঝেতে পড়ে যেতে দিল ও। হাঁটু গেড়ে পালস পরীক্ষা করল, আশা করল অন্তত মিনিট দশেকের আগে জ্ঞান ফিরছে না।

পিস্তলটা তুলে নিয়ে বিল্ডিঙের পিছন দিকে ছুটে এল রানা, বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল আবার। কার পার্কিং-এর দিকে দৌড়াচ্ছে, বাম বাহুর ব্যথাটা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

তিন মিনিটের মাথায় গাড়ির কাছে পৌঁছুল রানা। সরাইখানা থেকে ব্যাগ আনা বা মালিককে বিল দেয়া, এখন আর কোনটাই সম্ভব নয়।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা, বাধা এল কার পার্কিং থেকে বেরুবার মুখে। বিশাল এক কালো ফোর্ড সগর্জনে সামনে চলে এল। একই রঙের একটা মার্সিডিজকে দেখা গেল কার পার্কিঙের আরেক প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকছে—অর্থাৎ ফোক্সওয়াগনের পিছু হটার পথও বন্ধ।

মার্সিডিজ থেকে একযোগে লাফ দিয়ে নামল দু'জন লোক। আর সামনে অকস্মাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়তে ফোর্ড থেকেও নামল একজন। তিনজনই সশস্ত্র, তাদের মধ্যে আজ সকালে দেখা দৈত্যটাও আছে, পিয়ার আলি চিশতি।

ব্রেক ছেড়ে দিয়ে অ্যাকসেলারেটারে জোরে চাপ দিল রানা, ফোক্সওয়াগন সরাসরি তাক করল ফোর্ড থেকে সদ্য নেমে আসা নিঃসঙ্গ লোকটার দিকে। 'ব্যাটা হাঁদারাম!' বিড়বিড় করল আপনমনে, কারণ লোকটা বুক ফুলিয়ে ওর গাড়ির পথে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় ভয় বা উদ্বেগের ছায়া মাত্র নেই, নিজেকে যেন নিরেট পাহাড় মনে করছে। গাড়ির নাক সামান্য ডান দিকে ঘোরাল রানা, সজোরে ব্রেক করল, ফলে অফসাইডের দরজা হাঁদারামটাকে ধাক্কা দিল। অসুস্থকর একটা শব্দ ঢুকল কানে, পলকের জন্যে লোকটার মুখ খুলে যেতে দেখল রানা, চোখ অকস্মাৎ আতঙ্কে বিস্ফারিত হতে যাচ্ছে। রানা আন্দাজ করল লোকটা ছিটকে কয়েক গজ দূরে সরে গেছে, তবে একটু পরই নিশ্চিতভাবে জানার সুযোগ পাবে। এবার স্পীড বাড়াল ও, বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে আর ব্রেক কষে আধ পাক ঘুরিয়ে নিল গাড়ি, তারপর মার্সিডিজ থেকে নেমে আসা লোক দু'জনকে লক্ষ্য করে ছুটল। আহত হাঁদারামটাকে ডান

দিকে পড়ে থাকতে দেখল রানা, তবে মারা গেছে কিনা ভাল করে দেখা হলো না, কারণ পরপর দুটো বুলেট ছুটে এসে ফোক্সওয়াগনের উইন্ডশীল্ড ফুটো করে দিল, প্যাসেঞ্জার সাইডে, ছিন্নভিন্ন করে দিল ওর পাশের সীট।

গাড়িতে আটকে পড়া অবস্থায় সশস্ত্র লোকদের সঙ্গে লড়তে হলে অস্ত্র হিসেবে গাড়িটাকেই ব্যবহার করতে হয়, কাজেই চাপ দিয়ে মেঝেতে ঠেকাল রানা অ্যাকসেলারেটার, ফলে বাঘের মত লাফ দিল গাড়ি, ছুটল পিয়ার আলি চিশতিকে লক্ষ্য করে। গুলি দুটো সে-ই করেছে।

ফোর্ডের আরোহীকে ছিটকে পড়ে যেতে দেখেছে দৈত্যটা, কাজেই সাবধান হয়ে গেছে। খুব সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে আবার গুলি করল সে। এবার রানাও সতর্ক ছিল, হুইল ঘুরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে ছোটাল গাড়ি। দুটো বুলেটই পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বুলেটে কাজ হয়নি দেখে আত্মরক্ষার জন্যে ঘুরল চিশতি, ছুটে পালাচ্ছে। গাড়িটা রানা সোজা করে নিতে যাবে, ইচ্ছে ছুটন্ত দৈত্যটাকে ধাওয়া করা, এই সময় পার্কিং লটের মাঝখানে জমে থাকা তেলে হড়কে গেল গাড়ির চাকা। হুইলের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করছে রানা, কিন্তু ফোক্সওয়াগন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। পার্কিং লট আর রাস্তার মাঝখানে কাঠের একটা বেড়া আছে, হড়কে সেদিকে চলে যাচ্ছে গাড়ি। এরইমধ্যে হঠাৎ রানা দেখল, ওর বাম দিকে উদয় হয়েছে চিশতি, হাত লম্বা করছে আবার গুলি করার জন্যে। কিন্তু ফোক্সওয়াগন নিশ্চয়ই তাকে ঘষা দিয়েছে পাশ কাটানোর সময়, কারণ ধাক্কা লাগার একটা আওয়াজ পেল রানা, তারপরই এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল কাতর একটা গোঙানির শব্দ।

অনিয়ন্ত্রিত দীর্ঘ হড়কানির সমাপ্তি ঘটল কাঠের পাঁচিল ভেঙে ফোক্সওয়াগন রাস্তায় উঠে আসার পর। ডান দিকে হুইল ঘোরাল রানা, গাড়ি সিধে করে নিয়ে দেখতে পেল মার্সিডিজ পিছিয়ে এসেওর সামনের পথ আগলাবার চেষ্টা করছে। তবে ইতিমধ্যে স্পীড বাড়িয়ে নিয়েছে, মার্সিডিজের পিছনটাকে এক কি দুই ইঞ্চি তফাতে রেখে পাশ কাটিয়ে চলে আসতে পারল, রাস্তার ওপর চাকার তীব্র ঘর্ষণ তুলে বাঁক নিচ্ছে।

ইচ্ছে করেই লেহরি রোড ছেড়ে সরু গলির ভেতর ঢুকেছে রানা। এ পথে এসে প্রাণ বাজি রেখে জুয়া খেলতে চাইছে, তবে ওর সামনে অন্য কোন পথ খোলাও নেই। মার্সিডিজ আর ফোর্ড, দুটোই বিশাল গাড়ি, ওগুলোর তুলনায় ফোক্সওয়াগন খুবই ছোট—প্রায় ফাঁকা দীর্ঘ রাস্তায় ওগুলোর সঙ্গে দৌড়ে পারবে না। তাছাড়া, ও একা, প্রতিপক্ষ সংখ্যায় এখনও কয়েকজন। গাড়ি দুটো ধাক্কা দিয়ে ফোক্সওয়াগনকে রাস্তার পাশের খাদে যদি ফেলে দিতে না-ও পারে, গুলি করে চাকা ফাটিয়ে দিতে পারবে। অর্থাৎ লেহরি রোড ধরে করাচীতে ফিরতে চাওয়াটা স্রেফ আত্মহত্যার সামিল।

আবার ডান দিকে বাঁক নিল রানা, 'বিপজ্জনক' লেখা সাইনবোর্ডটাকে পাশ কাটাল। স্পীড আরও বাড়াল ও। হামলা শুরু হবার সময় সীটবেল্ট বাঁধেনি, ফলে এক হাতে হুইল ধরে রেখে অপর হাতে দরজার হাতল ছুঁতে পেরেছে।

পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায় সাদা পোস্টগুলো দেখতে পাচ্ছে রানা, পোস্টের গায়ে লাল রিফ্লেক্টর লাগানো আছে। জীবন-মরণ এখন সূক্ষ্ম সময়জ্ঞানের ওপর ঝুলে আছে। পাথরের স্তূপে ধাক্কা খেলো গাড়ি, এক সেকেন্ডের জন্যে ভূমি ত্যাগ করল সেটা, নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে মাটিতে পড়ল একটু বাম দিক ঘেঁষে।

পোস্টগুলো যখন বিশ গজ দূরে, স্পীড আরও বাড়াল রানা, তারপর এক ঝটকায় দরজা খুলে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল ডান দিকে।

মাটিতে ভারী বস্তার মত পড়ল রানা, কয়েকবার গড়ান খেয়ে স্থির হয়ে গেল, তারপর আর যেন নড়ার শক্তি নেই। কাছেই একটা বিশাল বোল্ডার, ওটার পিছনে পৌঁছুতে পারলে শরীরটাকে লুকিয়ে ফেলা যায়। শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে নড়তে পারল, ক্রল করে চলে এল বোল্ডারটার পিছনে। ইতিমধ্যে ওয়ার্নিং পোল-এ বাড়ি খেয়েছে গাড়ি। সেটাকে সামনে লাফ দিতে দেখল ও, যেন বাতাসে ভর দিয়ে উড়তে চাইছে। তারপর নিচু হলো নাক, খসে পড়তে শুরু করল। আড়াল থেকে আওয়াজ পেল রানা, ইস্পাতের সঙ্গে পাথরের সংঘর্ষ। হুপ্ করে একটা শব্দ হলো, পেট্রল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয়েছে, আগুনের শিখা খাদের মাথা পর্যন্ত উঠে এল।

গলি ধরে শম্বুকগতিতে এগিয়ে আসছে ফোর্ড আর মার্সিডিজ, স্থানীয় ড্রাইভাররা বিপদ সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন। দুই গাড়ি থেকে চারজন লোক নামল, চিশতিকে নিয়ে পাঁচজন। সাবধানে, ধীরে ধীরে, এগিয়ে এসে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল তারা। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে লোকগুলোর মধ্যে নকভিকেও চিনতে পারল রানা। সেই প্রথম কথা বলল, 'আল্লাহ যা করেন ভালই করেন, দুষ্কৃতকারীদের এভাবেই সাজা দেন।'

চিশতি বলল, 'নিচে পাকিস্তানের একজন দুশমন পুড়ে মরছে। এর অর্থ হলো, আমরা ব্যর্থ হয়েছি!' গলার আওয়াজটা প্রায় কাঁদো কাঁদো।

নকভি বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো, চিশতি। আমরা ব্যর্থ হলাম কিভাবে? আমাদের লীডার লোকটাকে জ্যান্ত ধরে আনতে বলেছেন, জানি। কিন্তু এ-ও জানি যে ধরতে পারলে তিনি তাকে নিজের হাতে খুন করতেন। ফলাফল তো সেই একই হলো। লীডারের ইচ্ছাই আমরা পূরণ করেছি।'

'তাই তো!' মাথা চুলকাল দানবটা। 'আমরা তাহলে ব্যর্থ হইনি। তোমার কথাই ঠিক, নকভি, আমরা জিতেছি!'

সাত

রাত বারোটায় সরাইখানায় ফিরল রানা। নিজের ঘরে ঢুকেই ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল, মালিকের ঘরে নক করে ঘুম ভাঙাল তার। নক করেই সরাইখানার বাইরে চলে এসেছে ও, দাঁড়িয়েছে হোন্ডা মোটরসাইকেলের

পাশে। রাস্তায় আলো নেই, চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোথাও কোন নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে না। কাঁচা ঘুম ভাঙানোয় মালিক লোকটা মহাবিরক্ত, তবে রানার কথা শুনে লোভে চকচক করে উঠল চোখ জোড়া। ওর গাড়িটা বিগড়ে গেছে, অথচ জরুরী একটা কাজে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাহোরে পৌঁছুতে হবে ওকে। ট্যাঙ্কে যথেষ্ট তেল থাকলে মোটরসাইকেলটা কিনতে চায় ও, দাম যতই হোক। মালিক জানাল, ট্যাঙ্ক ভরাই আছে, কিন্তু মুশকিল হলো হোন্ডাটা তার নয়, ছোট ভাইয়ের। ছোট ভাই উট নিয়ে গেছে নাকাব অঞ্চলে, বউ বাচ্চাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে। রানা যুক্তি দেখাল, হোন্ডাটা আপনি বেশি দামে বিক্রি করতে পারলে ছোট ভাই খুশিই হবে, তাই না? এটা তো পুরানো, কিন্তু আমি যে রুপিয়া দেব তাতে নতুন একটা কিনতে পারবে সে, আপনারও কিছু আয় হবে। দামটা আপনিই বলুন।

এক লাফে এক লাখ রুপিয়া চেয়ে বসল মালিক। শেষ পর্যন্ত আশি হাজার টাকায় রফা হলো। রুপিয়ার বদলে রানা ডলার দেবে শুনে লোকটা আনন্দে প্রায় নেচে ওঠে আর কি।

লেহরি রোড ধরে হানড্রেড সিসি হোন্ডাটাকে তীরবেগে ছোটাচ্ছে রানা। ও মারা গেছে, কবিরের এই ধারণা ওর জন্যে একটা প্লাস পয়েন্ট। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে খাদের তলায় যদি কবিরের লোকেরা নামে, লাশ না পেয়ে যা বোঝার বুঝে নেবে। রিপোর্ট পাবার পর কবির যদি বলে, যাও, লাশটা দেখে এসো, তাহলে আজ রাতেই খাদে নামবে ওরা।

মনে মনে একটা হিসাব করল রানা। রাত দুটোর মধ্যে করাচীর সেফ হাউসে পৌঁছে যাবে ও। রাত বারোটার পর চলতি মাসের ঊনত্রিশ তারিখ শুরু হয়েছে। ত্রিশে মাস, আর চারদিন পর কবিরের অপারেশন শুরু হবে। প্রশ্ন হলো, সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করতে ক'দিন লাগবে ওদের। একা হলে কাজটা সহজ হত। সঙ্গে ইশরাত আছে। ইশরাতকে পাকিস্তানে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়।

খাদের তলায় পোড়া গাড়িতে লাশ না পেলে করাচীর পুলিসকে সতর্ক করে দেবে কবির। পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোও তৎপর হয়ে উঠবে। করাচীতে মোহাজির কওমী মুভমেন্টের প্রচণ্ড দাপট, তারা ভাই-ভাই পার্টির কর্মসূচী সমর্থন করে, কাজেই তাদের সশস্ত্র ক্যাডাররাও ওর খোঁজে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়বে।

একটা ভয় ও সন্দেহ ক্রমশ দানা বাঁধছে রানার মনে। কবিরের তিন তারিখের অপারেশনে বাধা দেয়া ওর পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। এখনও জানাই হয়নি অপারেশনটা কি। হাতে সময়ও খুব কম। ইসলামাবাদে ফোন করতে পারে ও, বাংলাদেশ দূতাবাসে, কিন্তু আড়িপাতা যন্ত্রে সেটা ধরা পড়ে যাবার ষোলোআনা সম্ভাবনা। সিদ্ধান্ত নিল সেফ হাউসে পৌঁছে রানা এজেন্সির একজন এজেন্টকে করাচীর বাংলাদেশ বিমান-এর অফিসে পাঠাবে, ওখানে রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট আছে। তার মাধ্যমে বিসিআই ঢাকা হেডকোয়ার্টারকে সতর্ক করে দিতে হবে।

কিন্তু কি বলে সতর্ক করবে রানা? হাতে নিরেট কোন তথ্য নেই। শুধু জানতে পেরেছে তিন তারিখে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন অপারেশন চালাবে খায়রুল কবির। তাতে পাঁচ থেকে সাতশো 'কাফের' মারা যাবে। এই অপারেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটা তথ্য হলো—ফজলুলউদ্দিন তরফদার নামে এক বাংলাদেশী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের নেতাকে সনম্যারন পয়েন্টে ইয়ট নিয়ে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। সবগুলোই অস্পষ্ট তথ্য, নিরেট কিছু নয়। এ-সব তথ্য পেয়ে বিসিআই কি ব্যবস্থা নেবে?

পথে কোন বিপদ হলো না। দুটোর কয়েক মিনিট আগেই করাচীতে পৌঁছুল রানা। মোটরসাইকেল একটা গলিতে রেখে ট্যাক্সি ভাড়া করল, নামল একটা রেস্তোরাঁর সামনে। রেস্তোরাঁয় বসল না, কয়েকটা নান রুটি আর কাবাব কিনে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ফাঁকা রাস্তা, হাঁটতে হাঁটতে চলে এল জিন্নাহ এভিনিউয়ে। সেফ হাউসটা থানার পাশেই. চারদিক আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। থানার সামনে পুলিসের কয়েকটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে. তবে পুলিসরা সবাই ভেতরে। সেফ হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ট্রাক। ইরানী ব্যবসায়ীরা তদারক করছে, শ্রমিকরা ট্রাকে কার্পেট তুলছে। এই কার্পেট দুনিয়ার সব দেশে রফতানি করা হয়। শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে গেল রানা, তারপর এক সময় বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে পড়ল। ওদের সেফ হাউস তিনতলায়, সেখান থেকে বিল্ডিঙের পিছন দিকে বেরুবার আলাদা একটা সিঁড়িও আছে, তবে এত রাতে সেটা ব্যবহার করলে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে ভেবেই সামনে দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা।

রানার কাছে চাবি আছে, লোহার দুটো গেট খোলার পর চৌকো একটা ঘরে পৌঁছুল, দেয়ালে ফিট করা স্পীকারের মাউথপীস নামাল হুক থেকে। ঘরটা ছোট, কোন জানালা-দরজা নেই। স্পীকারে কথা বলল রানা, 'এম.আর.নাইন।' পাশের কামরায় একটা কমপিউটর আছে, সেটার মেমোরিতে আছে রানার কণ্ঠস্বর। দুই গলার আওয়াজ একই হওয়ায় কমপিউটরের নির্দেশেই ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেম চালু হয়ে গেল, ঘরের একদিকের পুরো দেয়াল সরে গেল একপাশে।

বুলেট প্রুফ ভেস্ট পরে রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের ওদিকে। ওদের উপস্থিতি স্রেফ অতিরিক্ত সাবধানতা। দু'জনেই ওরা বেলুচ, নাম উচ্চারণ করা হয় না, শুধু নম্বর ধরে ডাকা হয়। 'ম্যাডাম শুধু পাগল হতে বাকি আছেন, স্যার! আপনার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে উনি নিজেই মাকরানে যেতে চাইছিলেন, অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি।'

'কোথায় তিনি?'

'নিজের ঘরে সেই সন্ধে থেকে নামাজ পড়ছেন। মাঝে মধ্যে দরজা খুলে শাসাচ্ছেন আমাদের, বলছেন আমরা তাঁকে সেফ হাউস থেকে বেরুতে না দিলে থানার দিকের জানালা খুলে চিৎকার করবেন।'

হেসে ফেলল রানা। 'ইন্টারেস্টিং তো! যাও, ডাকো ওঁকে।'

রানার পিছু নিয়ে হলরুমে চলে এল এক ও দুই নম্বর। এক নম্বর বলল, 'স্যার, ম্যাডামের অনুরোধে বাইরে বেরিয়ে আমাকে কাল সকালে প্যারিসে ফোন করতে হয়েছিল।'

স্থির হয়ে গেল রানা। 'মানে? কেন?'

'চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে ছোট একটা প্লেন আছে, ওনার দেয়া নম্বরে ডায়াল করে আমি ওই প্লেনের পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

'নিশ্চয়ই কোন মেসেজ দিয়েছ তাকে। কি সেটা?' রানা আড়ষ্ট।

'ম্যাডাম আমাকে যা বলতে বলেছেন আমি পাইলটকে তাই বলেছি,' জবাব দিল এক নম্বর। 'প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, প্লেন মেরামত হয়েছে কিনা। তারপর বললাম, পুরোপুরি মেরামত করার দরকার নেই, উড়তে পারলেই হয়, প্লেন নিয়ে সে যেন করাচী ইন্টারন্যাশনালে চলে আসে।'

'ব্যস, এইটুকু? আর কিছু বলোনি?'

'না।'

'পাইলট কি বলল?'

'আজ, মানে, উনত্রিশ তারিখ দুপুরের দিকে প্লেন এখানে পৌঁছে যাবে।'

রানার পেশীতে ঢিল পড়ল। আর ঠিক এই সময় হলরুমের একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ইশরাত। রানা প্রথমে চিনতেই পারল না। কে বলবে ইউরোপ-আমেরিকার ফ্যাশন জগতে এই মেয়েটিই গত তিন বছর ধরে একের পর এক তুমুল আলোড়ন তুলছে, নিজের রূপ আর যৌবনকে দাহ্য পদার্থের মত ব্যবহার করে লাখ লাখ স্বাস্থ্যসচেতন ও সৌন্দর্যপিপাসু তরুণ-তরুণীর মনে অনির্বাণ শিখার মত আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, ধারে-কাছে আর কাউকে ঘেঁষতে দেয়নি? ইশরাতের পরনে ফোলা আলখেল্লা, তার ওপর পরেছে সিল্ক রোব, মাথা ও বুক দোপাট্টায় ঢাকা, হাতে একটা তসবি।

রানাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইশরাত। কথা বলল না, হাসল না। চোখের পাতা ফেলল না। শুধু টপ টপ করে দু'ফোঁটা অশ্রু পড়ল কার্পেটের ওপর।

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন,' ফিসফিস করল রানা, নিজেও জানে না কেন।

লক্ষ্মী মেয়ের মত শান্ত পায়ে হেঁটে এসে লম্বা একটা সোফায় বসল ইশরাত। তার মুখোমুখি সিঙ্গেল সোফায় বসল রানা। এক ও দুই নম্বর এজেন্ট সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল।

'আল্লাহর কাছে হাজারও শোকর আপনি ফিরে এসেছেন,' বলল ইশরাত। বলার সুরে অভিযোগ বা আবেগ, কিছুই নেই। 'শুধু একটা উদ্বেগের কথা বলি আপনাকে। আপনি কি উপলব্ধি করেন, নিজের জীবনটাকে নিয়ে কি ধরনের জুয়া খেলেছি আমি? কিংবা এরকম একটা ভয়ঙ্কর জুয়া কেন আমি খেলেছি?'

রানা শুনছে। অপেক্ষা করছে।

'বেঁচে যখন ফিরে এসেছেন, খায়রুল কবিরের ক্ষমতা সম্পর্কে আশা করি আপনাকে আর কিছু আমার না বললেও চলবে. তাই না? তাহলেই ভেবে

দেখুন, কত বড় ঝুঁকি নিয়েছি আমি। একে দল বদল বলে না, বলে আত্মহত্যা। শুধু দেশকে ভালবাসি বলে ঝুঁকিটা নিয়েছি, তা কিন্তু নয়। আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারবেন, মনের ভেতর থেকে এই আশ্বাস পাবার পরই কেবল আপনার সঙ্গে আসতে রাজি হই আমি। সেই লোক, যার ওপর ভরসা করে আমি আমার প্রাণ ও ক্যারিয়ার বাজি রেখেছি, সে যদি মারা যায়, আমি কি তাকে ক্ষমা করতে পারব? জবাবটা আমি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই, ভাই।'

রানার মনে ইশরাতের প্রতি অদ্ভুত এক শ্রদ্ধাবোধ জাগল। তবে কৌতুক করার লোভটাও দমন করতে পারল না। 'বুঝতে পারি, আপনি বারবার আমাকে ভাই ভাই করেন এই আশায় যে আমি আপনাকে বোন বলে ডাকব। তা বোন, আমি কি মারা গেছি?'

'যাননি, সেটা করুণাময়ের অপার কৃপা আর আমার সৌভাগ্য,' বলল ইশরাত। 'এবার বলুন, আপনার বেঁচে থাকার রহস্যটা কি? আমি যতটুকু জানি, বিদেশী কোন গুপ্তচর চৌধুরী এস্টেটের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসতে পারে না।'

'সে অনেক কথা, পরে সময় পেলে খুলে বলা যাবে,' বলল রানা। 'তার বদলে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিই। কবির আর তার লোকজন জানে আমি মারা গেছি। তবে তাদের এই ভুল ধারণা এতক্ষণে ভেঙে যেতেও পারে। সেক্ষেত্রে এই সেফ হাউস থেকে কবে আমরা বেরোতে পারব, বলা কঠিন।' এজেন্টদের দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা ভোরেই বেরিয়ে পড়বে। প্রথম কাজ শহরের পরিস্থিতি বোঝা। রেলস্টেশন, এয়ারপোর্ট, বন্দর—এ-সব জায়গায় বিশেষ ভাবে নজর রাখা হচ্ছে কিনা জানতে চেষ্টা করো। তারপর খোঁজ নাও ম্যাডামের প্লেন এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে কিনা। অফিস টাইম শুরু হলে বাংলাদেশ বিমানের অফিসে যাবে একজন, কমার্শিয়াল ম্যানেজারকে আমার একটা মেসেজ দিয়ে আসবে। কাগজ-কলম দাও, আমি লিখে দিচ্ছি।'

'না লিখলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল এক নম্বর। 'আপনি বললে আমি মুখস্থ করে নিই।'

'আমি সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখব, তাতে মেসেজটা ঢাকায় পাঠাতে সহজ হবে তার।'

মেসেজটা লেখা শেষ হতে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর দু'ঘণ্টা পর সকাল হয়ে যাবে। দুপুরের মধ্যে যে-কোন একজন ফিরে আসবে তোমরা, ঠিক আছে?'

দুই এজেন্টই মাথা ঝাঁকাল।

ইশরাত জানতে চাইল, 'আপনার প্ল্যানটা কি? ধরুন আমার প্লেন দুপুরের মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছুল। পাসপোর্ট আছে, কিন্তু ভিসা তো নেই, প্লেনে উঠব কিভাবে? আর যদি কবিরের লোকজন এয়ারপোর্টে নজর রাখে...'

ইশরাতকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'ভিসাও আছে, কিন্তু জাল। তবে

পাসপোর্ট বা ভিসা কোনটাই দরকার হবে না। এমনকি শহরের পরিস্থিতি যদি বিপজ্জনকও হয়, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা, তারপর যেভাবে হোক আপনার প্লেনে উঠে পাকিস্তান ছেড়ে যাব।'

'তা কিভাবে সম্ভব? ফ্লাইট অর্ডার লাগবে, আমাদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে, প্লেনে উঠতে হবে...'

আবার বাধা দিল রানা। 'মাথার ভেতর কাজ চলছে, প্ল্যানটা পুরোপুরি তৈরি হলে জানাব আপনাকে।' এজেন্টদের দিকে তাকাল ও। 'তোমাদের জন্যে আরও একটা জরুরী কাজ। ম্যাডামের পাইলটকে বলবে, কন্ট্রোল টাওয়ারের কাছে সে যেন নেপালে যাবার ফ্লাইট অর্ডার চায়। দুপুরে ফিরলে আমি তোমাদের হাতে কাগজ-পত্র দিতে পারব, সেগুলো তোমরা পাইলটকে দিয়ে আসবে। অবশ্য এ-সবই নির্ভর করছে ম্যাডামের প্লেনটা প্যারিস থেকে করাচীতে এসে পৌঁছানোর ওপর। ইশরাত, আপনি এবার ঘুমাতে যান। আমারও বিশ্রাম দরকার।' এজেন্টদের দিকে ফিরল ও। 'অ্যালার্ম সিস্টেমগুলো চালু রেখে বেরিয়ে যাবে তোমরা, ঠিক আছে?'

পাশাপাশি দুটো কামরায় রাত কাটাচ্ছে ইশরাত আর রানা। রানার নির্দেশ বা অনুরোধ যা-ই বলা হোক, সম্মতি জানিয়ে মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখল ইশরাত। ইতিমধ্যে রানার পরামর্শে কাপড়চোপড় পাল্টে প্যান্ট-শার্ট পরতে হয়েছে তাকে, যাতে মুহূর্তের নোটিসে সেফ হাউস ত্যাগ করতে পারে। ঘুমাতে চায় বললেও, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে বিছানায় বসে থাকল রানা, ভোর হবার অপেক্ষায় আছে। মাঝখানে একবার পা টিপে টিপে ইশরাতের ঘর থেকে ঘুরে এসেছে। সুপারমডেলের নিয়মিত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শুনে বুঝতে পেরেছে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। ঠিক সাড়ে চারটের সময় রানা এজেন্সির এজেন্টরা সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে গেল। আরও আধ ঘণ্টা পর ইশরাতের ঘুম ভাঙাল রানা।

শহরের চারদিক তুমুল গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে শুনে আকস্মিক আতঙ্কে দিশেহারা ইশরাত লাফ দিল বিছানা থেকে, তার কঠিন আলিঙ্গনে দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো রানার। রানার কথা তার কানেই ঢুকছে না, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে চলেছে, 'আমি তো মরবই, কবির আপনাকেও খুন করবে! আমার জন্যেই আপনার এই বিপদ...'

গা থেকে ইশরাতকে সরিয়ে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিল রানা। 'থামুন! শান্ত হোন! এ-ধরনের গোলাগুলি করাচীর দৈনন্দিন ঘটনা, কবিরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

লজ্জা পেয়ে রানাকে ছেড়ে দিয়ে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল ইশরাত। 'সরি,' বিড়বিড় করল সে।

'আমি নিচতলায় যাচ্ছি, কি ঘটছে জানার চেষ্টা করব,' বলল রানা। 'আপনি এখানেই বসে থাকুন, ভুলেও জানালার সামনে দাঁড়াবেন না। আমি যখন ফিরব, লোহার গেট দুটো খোলার সময় মৃদু অ্যালার্ম বাজবে. ভয় পাবেন

না।'

'একা আমার ভয় করবে…'

'এই বিল্ডিঙেই থাকছি আমি, আপনাকে ফেলে পালাচ্ছি না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। ইচ্ছে করলে কিচেনে গিয়ে নাস্তা তৈরি করতে পারেন, নিজেকে ব্যস্ত রাখা হবে। আপনি তৈরি হয়ে থাকুন, যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে হতে পারে। আপত্তি না থাকলে চুলও কেটে ফেলুন, তা না হলে পাগড়ি পরতে হবে।'

আধঘণ্টা পরই ফিরল রানা, কিন্তু গোলাগুলির কারণ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। ইশরাতকে নাস্তা তৈরিতে সাহায্য করল ও।

খেতে বসে ইশরাত বলল, 'আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, চিন্তা তো হচ্ছেই। করাচীতে মোহাজির কওমী মুভমেন্টের ক্যাডাররা প্রায়ই পাইকারীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের লোকজনকে খুন করে, নিজেরাও খুন হয়। প্রতি মাসে বড় ধরনের দাঙ্গাও বাধে। আর দাঙ্গা বাধলেই কারফিউ জারি করা হয়, কখনও কখনও একটানা দু'তিন দিন। আজও যদি কারফিউ জারি করা হয়, এয়ারপোর্টে যাওয়া সম্ভব হবে না।'

চেহারা আরও ম্লান হয়ে গেল ইশরাতের। 'গোলাগুলি তো কমছে না, আরও বরং বাড়ছে।'

'হ্যাঁ, নিচে লোকজনকে বলাবলি করতে শুনলাম, রাস্তা দিয়ে আধা-সামরিক বাহিনীর কনভয় যেতে দেখেছে তারা।'

'তারমানে কি এরইমধ্যে কারফিউ জারি করা হয়ে গেছে?'

'সম্ভবত। রাস্তায় একটা কুকুর-বিড়ালও নেই।'

এক ঘণ্টা পর আবার নিচে নামল রানা। ফিরে এল কয়েকজন ইরানীকে নিয়ে, তারা বিশাল আকারের একজোড়া কার্পেট আর টিনের দুটো টিউব বয়ে নিয়ে এল। টিউব দুটোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ইশরাত। প্রতিটি টিউব ছয় ফুট লম্বা, আর এত চওড়া যে অনায়াসে ভেতরে একজন লোক ঢুকে শুয়ে থাকতে পারবে। লোকগুলো চলে যাবার পর প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে।

মুচকি হেসে রানা বলল, 'নিচের কার্পেট কারখানা রানা এজেন্সির কাভার। আন্দাজ করুন, কেন এগুলো আনিয়েছি, কি কাজেই বা ব্যবহার করা হবে।'

শুধু রূপ-যৌবনই যে সুপারমডেল হবার জন্যে যথেষ্ট নয়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও দরকার হয়, আর তা যথেষ্ট পরিমাণেই তার আছে, সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করল মেয়েটা। বলল, 'আপনি এখান থেকে বেরুবার প্রস্তুতি নিয়ে রাখছেন। কারফিউ সারাদিনে একবার অন্তত শিথিল করা হবে। তখন ওই টিউবে ঢুকব আমরা। টিউব দুটোকে কার্পেটে মোড়া হবে, তারপর সম্ভবত ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে এয়ারপোর্টে, রফতানিযোগ্য পণ্য হিসেবে।'

'আপনি বুদ্ধিমতী।'

ইশরাতকে রান্নার কাজে লাগিয়ে দিয়ে আরও কয়েকবার নিচে থেকে

ঘুরে এল রানা। অনেক খবরই পাচ্ছে ও, সবই দুঃসংবাদ, তবে ইশরাতকে সব কথা বলছে না। আজকের দৈনিক খবরের কাগজ বিলি করা হয়নি, তবে সেগুলোয় ভোর রাতের গোলাগুলির খবর না থাকারই কথা। কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে রেডিও ও টিভির মাধ্যমে, পুলিস আর আধা-সামরিক বাহিনী টহল দিচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়, দেখামাত্র গুলি করা হবে। কি ঘটেছে সঠিক জানা যায়নি, তবে গুজব হলো একটি রাজনৈতিক দলের তিনজন প্রথম সারির নেতাকে খুন করেছে মোহাজের কওমী মুভমেন্টের ক্যাডাররা। পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে প্রতিপক্ষ দলের ক্যাডাররা ওদের এগারোজন কর্মী আর দু'জন নেতাকে খুন করেছে। কারফিউ জারি করা সত্ত্বেও বিভিন্ন পাড়ায় থেমে থেমে দুই দলে সংঘর্ষ চলছে। আধা-সামরিক বাহিনী ও আর্মড পুলিসও গুলি করে বেশ কিছু লোককে মেরে ফেলেছে।

সারাটা সকাল টিভির সামনে বসে থাকল রানা, মাঝে মধ্যে রেডিও অন করছে। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে গেল বেলা দুটোর পর। বেলা একটা থেকে দুটো পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছিল কারফিউ, কিন্তু রানা এজেন্সির এজেন্টরা সেফ হাউসে ফেরেনি।

দুটোর পর রানা সিদ্ধান্ত নিল, ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ বিমান-এর অফিসে ফোন করবে ও। হাতে সময় নেই, কবিরের অপারেশন সম্পর্কে বিসিআই হেডকোয়ার্টারকে যেভাবে হোক সাবধান করে দিতে হবে। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাতে ডায়াল টোন পেল না। ইশরাতের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'সম্ভবত সরকারের ওপর মহলের নির্দেশে শহরের সমস্ত টেলিফোন লাইন অচল করে রাখা হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নেতারা যাতে ক্যাডারদের নির্দেশ দিতে না পারে। করাচীতে এটা স্বাভাবিক ঘটনা।'

'কিন্তু ওরা কেন এল না?'

'অস্থির হয়ে লাভ নেই। না ফেরার অনেক কারণ থাকতে পারে। যে কাজগুলো করতে পাঠিয়েছি সেগুলো হয়তো সময়ের অভাবে সারতে পারেনি, তাই ফেরেনি। সন্ধ্যার দিকে আবার নিশ্চয়ই কারফিউ তুলে নেয়া হবে, তখন আসবে।'

'কাল ত্রিশ তারিখ,' মনে করিয়ে দিল ইশরাত। 'কবির তিন তারিখে যদি কিছু ঘটায়, আপনার হাতে সময় থাকবে মাত্র দু'দিন। এদিকে আবার আবহাওয়ার খবরে বারবার আট নম্বর মহা বিপদ সঙ্কেত তোলার কথা বলছে।'

'জানি।'

'এক কাজ করলে হয় না?' হঠাৎ উত্তেজিত দেখাল ইশরাতকে। 'সন্ধ্যায় কারফিউ তুলে নিলে চলুন আমরা এয়ারপোর্টে চলে যাই।'

'কিন্তু আপনার প্লেন যদি প্যারিস থেকে না এসে থাকে? কার্পেটে মোড়া অবস্থায় ট্রাকের ওপর কতক্ষণ থাকতে পারবেন?'

খানিক চিন্তা করে ইশরাত বুদ্ধি দিল, 'প্লেন না এসে থাকলে কাল কোন এক সময় আবার আমাদেরকে এখানে ফিরিয়ে আনবে ট্রাক. কালও নিশ্চয়ই

কারফিউ শিথিল করা হবে।'

বুদ্ধিটা মন্দ নয়, চিন্তা করল রানা। তবে বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। কার্পেটের ভেতর গোলা-বারুদ বহন করা হচ্ছে, এই সন্দেহে পুলিস বা আধা-সামরিক বাহিনীর লোকজন ট্রাক সার্চ করতে পারে। 'আজকের দিনটা দেখি,' বলল ও। 'কাল দুপুরের মধ্যে ওরা না ফিরলে আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখব।'

বেলা আড়াইটায় আবার একবার নিচে গেল রানা, একটা ইংরেজি দৈনিক নিয়ে ফিরে এল একটু পরই। খেতে বসে কাগজটা পড়ছে, ছোট্ট একটা খবর খিদেটাই নষ্ট করে দিল। রানার চেহারা বদলে যেতে দেখে ইশরাতের হাতও স্থির হয়ে গেল। 'কি হলো? কি পড়ছেন?'

'তিন তারিখে ভারতীয় দুটো ফ্রিগেট আর দুটো ডেস্ট্রয়ার শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসছে,' বিড় বিড় করল রানা। 'চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়বে ওগুলো।' চেয়ার ছেড়ে বেসিন থেকে হাত ধুয়ে এল ও, সোফায় বসে মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করছে।

হাত ধুয়ে ইশরাতও রানার পাশে চলে এল। 'তারমানে কি এটাই কবিরের অপারেশন? ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিতে চায় সে, বাংলাদেশের জলসীমায়?'

'বঙ্গোপসাগরে সনম্যারন পয়েন্ট বলে কিছু নেই, নরম্যানস পয়েন্ট আছে। ফজলুলউদ্দিন তালুকদারের নামের পাশে যে মন্তব্য লেখা আছে তাতে সনম্যারন শব্দটা থাকলেও, ওটা আসলে নরম্যানস হবে।

'ওই লোককে আমি চিনি, টেকনাফে একবার দেখা হয়েছিল।'

মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে রানা।

'রানা, ভাই, আমি আবার অনুরোধ করছি, সিদ্ধান্ত পাল্টান।' কাতর অনুরোধ করল ইশরাত। 'টিভিতে বলল বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হবে। আপনার এজেন্টরা ফেরে কিনা দেখার জন্যে পনেরো থেকে বিশ মিনিট অপেক্ষা করব আমরা, তারপর চলুন ট্রাকে চড়ে এয়ারপোর্টে যাই। আপনি তো এসপিওনাজ এজেন্ট, আমার প্লেন না পেলে অন্য কোন প্লেন হাইজ্যাক করে হলেও পাকিস্তান ত্যাগ করা দরকার। কবিরের এই অপারেশন ব্যর্থ করতে হলে যা করার আপনাকে একাই করতে হবে, বুঝতে পারছেন তো? বিশেষ করে ঢাকায় যখন কোন খবরই পাঠানো যাচ্ছে না।'

রানা চিন্তা করছে। ইশরাতের কথায় যুক্তি আছে।

ইশরাত আবার বলল, 'করাচী থেকে লাহোর হয়ে আমরা নেপালে চলে যাব, সেখান থেকে ফুয়েল নিয়ে বার্মা হয়ে টেকনাফ। আমার সী প্লেনের রেঞ্জ বেশি নয়, নেপাল পর্যন্ত পৌঁছুতে হলে অতিরিক্ত ফুয়েল নিতে হবে। আমি বলতে চাইছি, করাচী এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে পারলে কোন না কোন ব্যবস্থা ঠিকই করা যাবে। টেকনাফ আর চট্টগ্রামে কবিরের কয়েকটা ঘাঁটি আছে, আমি চিনি। সময় মত বিসিআই বা রানা এজেন্সির সাহায্য আপনি যদি না-ও

পান, আমি সঙ্গে থাকলে আপনি একাই ওদের অনেক ক্ষতি করতে পারবেন।'

'আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন?' এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও হাসি পেল রানার।

'কেন, আমাকে আপনি কি মনে করেন?' ইশরাত হাসছে না। 'আমি প্লেন চালাতে জানি, শূটিং প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল পেয়েছি, বোট চালাতে জানি, গ্লাইডার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশে উড়ে বেড়িয়েছি, কারাতে-কুংফু শিখেছি...'

হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল রানা। 'মানলাম, আপনি আমার সঙ্গে থাকার যোগ্যতা রাখেন।' তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ও। প্রায় মিনিট দুয়েক পর মাথা তুলে বলল, 'ঠিক আছে, তবে তাই হোক। ঝুঁকিটা আমরা নেব। কিন্তু আবহাওয়াকে ভয় পাচ্ছি আমি। যেরকম ঝড়ো বাতাস বইছে, প্লেন আকাশে তোলা যাবে কিনা কে জানে!'

পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না, তার আগেই গোটা করাচী শহর রানা আর ইশরাতের জন্যে আক্ষরিক অর্থেই নরককুণ্ড হয়ে উঠল। রানা এজেন্সির এক নম্বর এজেন্ট সেফ হাউসে ফিরে এল অবিশ্বাস্য আর ভয়াবহ সব দুঃসংবাদ নিয়ে।

রানা যে গুজব শুনেছিল, দেখা গেল সেটাই সত্যি। মোহাজির কওমী মুভমেন্টের ক্যাডাররাই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের তিনজন নেতাকে খুন করেছে। এক নম্বর এজেন্ট আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে খবর নিয়ে এসেছে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটাবার পরিকল্পনা অনেক আগেই করা হয়, তবে অপারেশন চালাবার কথা ছিল আরও দুই হপ্তা পর। হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টাবার জন্যে দায়ী রানা ও ইশরাত। মাকরানের খাদের তলায় রানার লাশ না পেয়ে কবির চৌধুরী কাল রাতেই কওমী মুভমেন্টের সাহায্য চায়, রানা ও ইশরাত যাতে করাচী থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। মুভমেন্টের নেতারা রাতারাতি মীটিঙে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, সকাল হবার আগেই করাচীতে লোক চলাচল বন্ধ করে দিতে হবে। তা করতে হলে সরকারকে দিয়ে কারফিউ জারি করানোই সবচেয়ে উত্তম পন্থা। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের তিন নেতাকে খুন করার পরিকল্পনা করাই ছিল, তারিখটা শুধু এগিয়ে আনা হয়। খুন ও পাল্টা খুনের ফলে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়, ভোর থেকেই কারফিউ জারি করে সরকার।

যেভাবেই হোক কবির চৌধুরী জানতে পেরেছে রানার সঙ্গে ইশরাতও করাচীতে আটকা পড়েছে, তার প্রমাণ মোহাজির কওমী মুভমেন্টের ক্যাডাররা এয়ারপোর্ট, বন্দর, রেলস্টেশন আর শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সমস্ত পয়েন্টে কড়া পাহারা বসিয়েছে, প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে ভাই-ভাই পার্টির হাইকমান্ড থেকে অলিখিত ঘোষণা দেয়া হয়েছে বাংলাদেশী স্পাই মাসুদ রানা ও সুপারমডেল ইশরাত জাহানকে ধরে দিতে পারলে পঁচিশ লাখ রুপিয়া পুরস্কার দেয়া হবে। ওদেরকে যে শুধু কওমী মুভমেন্ট আর ভাই-ভাই পার্টির ক্যাডাররা খুঁজছে, তা নয়; পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, আর্মড পুলিস আর আধা-সামরিক বাহিনীকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আজ রাতে

করাচীর সমস্ত হোটেল ও বোর্ডিং হাউস ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় তল্লাশী চালানো হবে অবৈধ অস্ত্র আর দুষ্কৃতকারীর সন্ধানে।

এজেন্ট তার রিপোর্টে আরও একটা পিলে চমকানো খবর দিল। কারফিউ এড়িয়ে, জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে প্রথমে তারা এয়ারপোর্টে গিয়েছিল ইশরাতের সী প্লেন পৌঁছেছে কিনা দেখার জন্যে, কারফিউ শুরু হয়ে যাওয়ায় ওখানেই তারা আটকা পড়ে। দুপুরে কারফিউ শিথিল করা হলে বাংলাদেশ বিমান-এর অফিসে যায় তারা। কিন্তু দূর থেকেই দেখতে পায় বিল্ডিঙটাকে আধাসামরিক বাহিনীর লোকজন ঘিরে রেখেছে। কাছাকাছি যেতে পারেনি, দূর থেকেই দেখতে পায় আশপাশে কাউকে দেখলেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। ওখান থেকে এখানে ফেরার পথে ওদের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় তাদের, সবাই তারা কোন না কোন জঙ্গী মৌলবাদী দলের ক্যাডার। ওরা দু'জন তাদের আসল পরিচয় জানে, তারা ওদের প্রকৃত পরিচয় জানে না। রানা ও ইশরাতকে খোঁজা হচ্ছে, এই তথ্য তাদের কাছ থেকেই পায় ওরা। আলাপ করার জন্যে বাধ্য হয়েই একটা রেস্তোরাঁয় বসতে হয়েছিল ওদেরকে। ফলে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয় ওখানে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আবার এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল ওরা পাইলটের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, এই সময় রানা এজেন্সির দুই নম্বর এজেন্ট ওকে একটা প্রস্তাব দেয়। সে বারবার বলতে থাকে, রেস্তোরাঁয় ফিরে গিয়ে সেফ হাউসের ঠিকানা প্রকাশ করে দিলেই নগদ পঁচিশ লাখ রুপিয়া কামানো সম্ভব—জীবনে এত বড় সুযোগ আর না-ও আসতে পারে। কাজেই, বাধ্য হয়ে, নির্জন একটা গলিতে ঢুকে দুই নম্বরকে গুলি করে মেরে ফেলেছে ও।

রানা সম্পূর্ণ শান্ত, তবে গম্ভীর। ভারী গলায় জানতে চাইল, 'তোমাকে কেউ দেখেনি তো?' তরুণ বেলুচ মাথা নাড়তে আবার বলল, 'এর উপযুক্ত পুরস্কার তুমি পাবে। এখন বলো, এয়ারপোর্ট থেকে কি খবর এনেছ।'

'ওদিকের খবর ভাল। ম্যাডামের প্লেন বেলা এগারোটার দিকে পৌঁছেছে। ম্যাডাম আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে ওটার রঙ নীল, কিন্তু আমরা দেখলাম সাদা...'

'আমারই ভুল হয়েছে,' বলল ইশরাত। 'প্যারিসে ওটার রঙ পাল্টানো হচ্ছিল।'

রানা জানতে চাইল, 'পাইলটের সঙ্গে দেখা করেছ? কি করতে হবে বলেছ তাকে?'

পাইলটের সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছে ওর। একবার বেলা বারোটার দিকে, দ্বিতীয়বার বেলা দুটোর পর। রানা ও ইশরাতকে শহরের সবখানে গরুখোঁজা করা হচ্ছে, এই তথ্য পাবার পর পাইলটের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আলোচনা করতে যায় ও। গিয়ে শোনে, ইনকামিং সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করা হলেও, আউটগোয়িং ফ্লাইট বাতিল করা হয়নি, ফলে কন্ট্রোল টাওয়ারের কাছ থেকে নেপালে যাওয়ার ফ্লাইট প্ল্যান পাইলট পাস করিয়ে নিতে পেরেছে। কিন্তু এয়ারপোর্টে কড়া পাহারা, রানা ও ইশরাতের পক্ষে কোনভাবেই প্লেনে

ওঠা সম্ভব নয়। পাইলটকে তাই সে বুদ্ধি দিয়েছে, ফ্লাইট প্ল্যান অনুসারে সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় প্লেন নিয়ে নেপালের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে সে, আরোহী ছাড়াই। কিছু দূর যাবার পর প্লেন অনেক নিচে নামিয়ে আনবে, রাডারে যাতে ধরা না পড়ে, তারপর একটা বৃত্ত তৈরি করে চলে যাবে সাগরের দিকে। মোকাম সী বীচ থেকে বিশ মাইল দূরে জেলেদের একটা গ্রাম আছে, ওই গ্রামের কাছাকাছি সাগরে নামবে পাইলট, সেফ হাউস থেকে সেটা প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। গ্রামের নাম দুলহান, এজেন্টের দু'একজন চেনা লোকজন আছে ওখানে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। সোয়া পাঁচটা। সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করল ও। ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছে না, দ্বিধায় ভুগছে ইশরাতের কথা ভেবে।

রানার অনুমতি না নিয়েই এক নম্বর এজেন্টকে নিজেদের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল ইশরাত। শুনে বিচলিত দেখাল ওকে, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল।

'আর দেরি করা যায় না,' বলল রানা। 'আমি ইন্টারকমে ওদেরকে ডাকছি। আবহাওয়ার শেষ খবর কি?' ইশরাতের দিকে তাকাল?

'খারাপ,' ম্লান মুখে বলল ইশরাত। 'খুবই খারাপ। এখনও আট নম্বর মহা বিপদ সঙ্কেত দেখাতে বলা হচ্ছে।'

গুটানো অনেকগুলো কার্পেট আগেই একটা ট্রাকে তোলা হয়েছে, রানা আর ইশরাত যে কার্পেট দুটোর ভেতর থাকবে সেগুলো তোলা হবে সবার শেষে। তিন তলার হলরুমে তারই প্রস্তুতি শুরু হলো। সঙ্গে অতিরিক্ত কোন কাপড়চোপড় নেয়নি ওরা, তবে অস্ত্রগুলো একটাও ফেলে যাচ্ছে না। রানা গোটা চারেক গ্রেনেডও রাখল জ্যাকেটের পকেটে। টিউবগুলো যথেষ্ট চওড়া, ভেতরে ঢোকার পরও নড়াচড়ার জায়গা থাকল। ওরা টিউবে ঢোকার পর কার্পেট দিয়ে মুড়ে ফেলা হলো সেগুলো। প্রতিটি কার্পেট বারো ফুট চওড়া, টিউবের দু'দিকে তিন ফুট করে অতিরিক্ত লম্বা হয়ে থাকল। দুই প্রান্তের ওই তিন ফুট অতিরিক্ত অংশ নেতিয়ে পড়ছে দেখে এজেন্সির লোকের ভেতরে খবরের কাগজ আর নারকেল-ছোবড়া ঢুকিয়ে দিল।

প্রতিটি টিউব বয়ে আনতে তিনজন করে লোক লাগল। ট্রাকে তোলার পর বৈসাদৃশ্যটা চোখে পড়ল, ট্রাকের বাকি কার্পেটের সঙ্গে আকার-আকৃতিতে মিলছে না। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রানা আর ইশরাতের মোড়কের ওপর আরও কয়েকটা কার্পেট তোলা হলো।

পৌনে ছ'টায় তুমুল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রওনা হলো ট্রাক, ড্রাইভারের পাশে বসেছে এক নম্বর এজেন্ট। একশো গজও এগোয়নি ট্রাক, আর্মড পুলিসের একটা জীপ ওভারটেক করে পথ আগলাল। কার্পেটের ভেতর থেকে হাবিলদারের কর্কশ গলা কোনরকমে শুনতে পাচ্ছে রানা। তার প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভার জানাল, অস্ত্র বা বিস্ফোরক নয়, জাহাজে কার্পেট তোলার জন্যে পোর্টে যাচ্ছে সে। হাবিলদার বলল, 'ট্রাক সাইড করো, আমরা সার্চ করব।'

'জ্বী, হুজুর, ঠিক আছে।' তর্ক না করে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো ড্রাইভার।

'ঠিক আছে, যাও—তোমার কথা বিশ্বাস করলাম,' হেসে উঠে বলল হাবিলদার, যেন ড্রাইভার ভয় না পাওয়াতেই তার সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।

আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা। ইশরাতের কথা ভাবল। পাশেই রয়েছে সে, অথচ অভয় দেয়ার উপায় নেই। প্রথমবার কাকতালীয়ভাবে রক্ষা পেয়ে গেছে ওরা। সামনে নিশ্চয়ই ব্যারিকেড পড়বে। কার্পেট ভর্তি একটা ট্রাক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, দেখেই সন্দেহ হবার কথা। কার্পেটের ভেতর অস্ত্র, গোলাবারুদ লুকিয়ে রাখা খুবই সহজ। মানুষ লুকিয়ে রাখার জন্যেও আদর্শ।

উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে ট্রাকের গতি ধীরে ধীরে কমে আসায়। কারফিউ শিথিল হওয়ামাত্র কেনাকাটা আর আত্মীয়-স্বজনদের খবর নিতে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে শহরের লোকজন। কাজ সেরে সাতটার আগেই যে-যার ঠিকানায় পৌঁছানোর জন্যে ব্যাকুল। ফলে ট্র্যাফিক জ্যাম লেগে গেছে গোটা শহরে। মাঝে মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে ট্রাক। যানজট ছুটছে না। রানার ভয় লাগল, শহর থেকে বেরুবার আগেই না আবার কারফিউ শুরু হয়ে যায়।

রানার শরীরে পানি বলে কিছু থাকছে না, সব ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গুটানো কার্পেটের দুই প্রান্তে কাগজ আর ছোবড়া খুব কৌশলে গোঁজা হয়েছে, বাতাস চলাচলের জন্যে ফাঁক-ফোকর রাখার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেগুলো আকারে এত ছোট যে অক্সিজেনের অভাবে রীতিমত হাঁপাচ্ছে ও। ইশরাতের কথা ভেবে আতঙ্ক অনুভব করল, দম আটকে মারা যাবার ভয়ে মেয়েটা যদি টিউব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে তাহলেই সর্বনাশ।

প্রতিটি মেইন রোডের মোড়ে রোড ব্লক খাড়া করা হয়েছে। যানজটের সেটাও একটা বড় কারণ। মিনিটের পর মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে, ট্রাক নড়ছে না। চারদিক থেকে গাড়ির হর্ন, লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি, আর বাতাসের গর্জন ভেসে আসছে।

ক্যাব থেকে নেমে ট্রাকের পিছনে চলে এল বেলুচ তরুণ, বৃষ্টিতে ভিজছে। দু'হাতে মুখ আড়াল করে বলল, 'স্যার, রাস্তার যে অবস্থা, শহর থেকে বেরুনো সম্ভব না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আবার সেফ হাউসে ফিরে যেতে হবে আমাদের।'

টিউব আর কার্পেটের ভেতর থেকে রানা জবাব দিল, 'অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেবে। ম্যাডামের সাড়া পাও কিনা দেখো।'

ইশরাত কথা বলে উঠল, গলাটা পরিষ্কারই শুনতে পেল রানা। 'কষ্ট হচ্ছে, তবে বেঁচে আছি।'

রানা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমি চাই এই যানজট না খুলুক। রোড ব্লক তুলে নিতে বাধ্য হবে ওরা।'

ঘটলও ঠিক তাই। শহরের সবগুলো মেইন রোডে হাজার হাজার যানবাহন নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, দায়ী ওই রোড ব্লক। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল, রোড ব্লক তুলে ফেলার নির্দেশ দিতে বাধ্য

হলো তারা। তারপরও শহর থেকে বেরিয়ে আসতে পনেরো মিনিট লেগে গেল ওদের। শহর থেকে বেরিয়ে ফুল স্পীডে ছুটছে অসংখ্য প্রাইভেট কার ও ট্রাক, ওগুলোর মধ্যে দুটো অ্যামবুলেন্সও আছে।

বন্দর এলাকায় কারফিউ নেই, তবে তল্লাশী চালানো হচ্ছে। খবরটা পাওয়া গেল বিপরীতগামী ট্রাক ড্রাইভারদের মুখ থেকে। মোড়কের ভেতর থেকে রানা নির্দেশ দিল, 'মেইন রোড ছেড়ে সেকেন্ডারি রোড ধরো, তারপর মেঠো পথ ধরে দুলহানের দিকে চলো।'

রানার নির্দেশ ড্রাইভারকে জানিয়ে দিল তরুণ এজেন্ট।

মেইন রোড ত্যাগ করল ট্রাক। রানার নির্দেশে কার্পেটের এক প্রান্ত থেকে কাগজ আর ছোবড়া সরিয়ে ফেলল এক নম্বর এজেন্ট, টিউব থেকে বেরিয়ে ইশরাতকেও বের হতে সাহায্য করল রানা। ঢোলা সালোয়ার আর জোব্বা পরে আছে ইশরাত, মাথায় কালো পাগড়ি থাকায় কিশোর একটা ছেলের মত লাগছে দেখতে। ড্রাইভারের দু'পাশে বসল ওরা। এজেন্ট জানাল অ্যামবুলেন্স দুটো এই পথেই আসছে।

জেলেদের গ্রাম দুলহানে ট্রাক থামল না, আরও প্রায় মাইল দুয়েক এগোবার পর সৈকতে পৌঁছুল। বৃষ্টির কারণে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, তবে সরু জেটির মাথায় সাদা রঙের সী প্লেনটাকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে আনন্দে রানাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল ইশরাত। এজেন্ট রিপোর্ট করল পিছনের জোড়া হেডলাইট এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

ট্রাক থেকে নামার আগে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ড বের করল রানা। বেলুচ তরুণের হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে। প্রয়োজনে সেফ হাউস বদল করবে, এই টাকার কোন হিসাব দিতে হবে না তোমাকে।'

'স্যার...'

'এটা তোমার পাওনা,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'পুরস্কারও বলতে পারো। এই টাকা থেকে ড্রাইভারকে দু'হাজার ডলার দিতে পারো তুমি।' কাগজে ফোন নম্বর সহ ছোট্ট একটা মেসেজ আগেই লিখে রেখেছে রানা, সেটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিল, 'খুব জরুরী মেসেজ, নম্বরটা বিসিআই হেডকোয়ার্টারের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও চেষ্টা করবে ফোন করতে।'

সী প্লেনের পাইলট ককপিট থেকে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল। প্লেনে ওঠার সময় জেটির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকল এক নম্বর এজেন্ট ও ড্রাইভার। ছোট নৌকায় চড়ল ওরা, এজেন্টের বাড়ানো হাত থেকে একটা বাস্কেট নিল ইশরাত। বৈঠা চালিয়ে প্লেনের কাছে পৌঁছুল রানা।

প্লেনে ওঠার পর রানা জানতে পারল, পাইলট বাংলাদেশী। নাম ইকবাল হাসান। সাহসী যুবক, সংক্ষেপে সে তার ফ্লাইট প্ল্যান ব্যাখ্যা করে শোনাল রানাকে। সময় বাঁচানোর জন্যে লাহোর, নেপাল ও বার্মা হয়ে টেকনাফ যাবার প্ল্যান বাতিল করে দিয়েছে সে। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে

চট্টগ্রাম পৌঁছুতে চায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হলে প্রচুর সময় নষ্ট হবে, সে ঝামেলায় না গিয়ে প্লেন খুব নিচে রাখবে সে, ওদের রাডারে যাতে ধরা না পড়ে, প্রয়োজনে পানির ওপর দিয়ে যাবে।

'কিন্তু ফুয়েল?'

পাইলট ইকবাল হাসান জানাল, 'ট্যাঙ্ক ভরা আছে, দশটা ক্যানে আছে অতিরিক্ত আরও ষাট গ্যালন।'

'তা কি বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল ইকবাল, তবে মিটিমিটি হাসছে। বলল, 'আরব সাগর আর ভারত মহাসাগরে স্মাগলারদের অনেক জাহাজ দেখতে পাব আমরা, ফুয়েল কেনা কোন সমস্যা হবে না। প্রয়োজনে শ্রীলঙ্কার কলম্বো বন্দর থেকেও ফুয়েল নেয়া যাবে।'

'তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে চলো আকাশে উঠে পড়ি,' ইকবালকে বলল ইশরাত।

রানা জানতে চাইল, 'বঙ্গোপসাগরে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের?'

'সেটা নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর,' জবাব দিল ইকবাল। 'আশা করি কাল এই সময় চট্টগ্রামে পৌঁছে যাব আমরা।'

'ত্রিশ তারিখ রাতে,' বলে রানার দিকে তাকাল ইশরাত।

'সময়টা আমি একটু বাড়িয়ে ধরছি,' বলল রানা। 'এক তারিখ সকালেও যদি চট্টগ্রামে বা টেকনাফে পৌঁছুতে পারি, কবিরকে খুঁজে বের করা সম্ভব?' ইশরাতের দিকে তাকাল ও।

'আমি তার গোপন কয়েকটা আস্তানা চিনি,' জবাব দিল ইশরাত। 'তবে সে কি এরইমধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছে গেছে?'

'এত বড় একটা অপারেশন, সে নিজের চোখে দেখতে চাইবে না?'

কমিউনিকেশন সিস্টেম চেক করছে রানা। যন্ত্রপাতিগুলো আধুনিক নয়, একশো মাইল পর্যন্ত মেসেজ পাঠানো সম্ভব, তার বেশি নয়। কম দামী খেলনা বললেই হয়, ককপিটের পিছনে মাত্র দু'জন আরোহী বসতে পারে। ফুয়েল ভর্তি দশটা ক্যান তোলায় বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ভারী।

পাইলটের পাশে, কো-পাইলটের সীটে বসল রানা। দীর্ঘ সময় ধরে নানা রকম কসরৎ করার পর প্লেনটাকে আকাশে তুলতে পারল ইকবাল। রানার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ইশরাত।

প্লেন আকাশে ওঠার পরই মনে হলো বাতাসের তীব্র ঝাপটায় কাত হয়ে আবার সাগরে পড়ে যাবে ওরা। এক হাতে ইশরাতকে জড়িয়ে ধরল রানা, ইশরাতও রানাকে শক্ত করে ধরে আছে। এই সময় জানালার বাইরে চোখ পড়তে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

জেটি থেকে বেশি দূর নয়, মাইল দুয়েক হবে, দুলহান গ্রামের ঠিক বাইরে আগুন দেখা গেল। আগুনের আকৃতিটা লম্বাটে, চারকোনা, সেটাকে দুই প্রান্ত থেকে আলোকিত করে রেখেছে দু'জোড়া হেডলাইট। কি ঘটে গেছে বুঝতে

পেরে প্রবল শোকে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার। করাচীতে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়েছে রানা এজেন্সির এজেন্টরা—এক নম্বর এজেন্ট ও ড্রাইভার। ট্রাকটায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। দায়ী দুই জোড়া হেডলাইটের পিছনে একজোড়া অ্যামবুলেন্স।

'ওরা খুন হয়ে যাচ্ছে!' চিৎকার থামিয়ে বলল ইশরাত। 'আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

'খুন হয়ে যাচ্ছে না, হয়ে গেছে,' বলে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'না, এখন আর আমাদের কিছুই করার নেই।' শোকের সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তাও জাগল রানার মনে, ঢাকায় মেসেজটা পাঠানো হলো না।

ঝড়ের কবলে পড়েছে ওরা, প্লেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইকবাল। এই প্লেন ওদেরকে তিন হাজার কিলোমিটার বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রানার।

আধ ঘণ্টা পর কেবিনে ফিরে এল ও। একটা সীটের হাতল খালি পেয়ে তাতেই বসেছে ইশরাত। ও একটা ক্যানের ওপর বসল। 'কাল আপনার ঘুম হয়নি বললেই চলে। আর আমি ঘুমাইনি দুই রাত। এভাবে বসে চব্বিশ বা ছত্রিশ ঘণ্টা কিভাবে কাটাব?'

ইশরাত জবাব দিল না, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যানের ওপর বসা অবস্থায় একটু পরই রানাও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে মাথাটা কাত হয়ে স্থির হলো ইশরাতের গায়ে।

আট

ভোর রাতে সাগরে নামল প্লেন। ট্যাঙ্কে নতুন করে ফুয়েল ভরা হলো, খালি পাঁচটা ক্যান ড্রাম ফেলে দেয়া হলো সাগরে। বৃষ্টি তো থামেইনি, ঝড়ের তীব্রতাও বেড়েছে। আকাশে প্লেন তুলতে ভয় পাচ্ছে ইকবাল, ফলে তিন ঘণ্টা পানি কেটে এগোল ওরা, গতি একেবারেই মন্থর। আরও একটা ক্যান খালি করার পর সেটাও সাগরে ফেলে দেয়া হলো। প্রবল স্রোত ঠেলে সামনে এগোতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে প্লেন। আবহাওয়ার খবর বলা হলো, ভারত মহাসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। প্রচুর ফুয়েল খরচা হওয়ায় প্লেন হালকা হয়ে গেছে, কেবিনের সীটও দুটো এখন খালি, ফলে ওরা বসার সুযোগ পেয়েছে। বাস্কেট থেকে স্যান্ডউইচ আর ফল বের করল ইশরাত, সব শেষে ফ্লাস্ক থেকে কফি পরিবেশন করল। পাইলটের সীটে বসতে চেয়েছিল রানা, ইকবাল সেটা ছাড়তে রাজি হয়নি। তাকে খুব গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

রানা জানতে চাইল, 'কোন সমস্যা?'

'স্রোতের উল্টোদিকে যেতে হচ্ছে, ফলে আমার হিসেবের চেয়ে বেশি

খরচ হয়ে যাচ্ছে ফুয়েল। কলম্বো বন্দরে ভিড়তেই হবে আমাদের।'

'স্মাগলারদের জাহাজ?'

মাথা নাড়ল ইকবাল। 'এই আবহাওয়ায় তারা বেরোয়নি। গত আট ঘণ্টায় একটা জাহাজও চোখে পড়েনি।'

'কলম্বো পোর্ট আর কত দূরে?'

'চারশো কিলোমিটার। আকাশ পথে এক ঘণ্টা লাগার কথা। কিন্তু এভাবে যদি স্রোত ঠেলে এগোতে হয়, বিকেলের আগে পৌঁছুতে পারব বলে মনে হয় না। ঢেউগুলো দেখছেন তো, স্পীড বাড়ালে প্লেন উল্টে যাবে। দৃষ্টিসীমাও তো মাত্র পঞ্চাশ কি ষাট গজ। হঠাৎ সামনে কোন জাহাজ পড়লে এড়াবার সময় পাব না।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। কেবিনে ফিরে এসে ইশরাতের পাশের সীটে বসে বলল, 'এখন আবার সন্দেহ হচ্ছে এক তারিখ সকালেও চট্টগ্রামে পৌঁছুতে পারব না।'

ইশরাত বলল, 'কলম্বোয় পৌঁছে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব।'

'কাস্টমস-পুলিস ঝামেলা করবে। আমাদের সমস্যা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতেও তো সময় লাগবে।'

'আর তিনশো কিলোমিটার পার হতে পারলেই তো কলম্বো পোর্টের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করা যাবে,' বলল ইশরাত। 'পোর্ট কর্তৃপক্ষকে নিজের পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করুন বাংলাদেশ এমব্যাসীর কাউকে যেন পোর্টে চলে আসতে বলে।'

'দারুণ আইডিয়া,' ইশরাতকে খুশি করার জন্যে উৎসাহ দেখাল রানা, চিন্তাটা আগেই এসেছে ওর মাথায়।

কলম্বো পোর্ট যখন একশো কিলোমিটার দূরে, রেডিওতে দুঃসংবাদটা পেল ওরা। ভারতের পশ্চিম উপকূল আর শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সামুদ্রিক ঝড় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কলম্বো বন্দরের সমস্ত জাহাজকে নিরাপত্তার স্বার্থে গভীর সাগরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বন্দরে কোন জাহাজ ভিড়তে পারবে না, প্রায় সব ক'টা জেটি আর ভবন প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে। ওই একই বার্তায় বলা হলো, শ্রীলঙ্কার পুবে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর অপেক্ষাকৃত শান্ত, সমস্ত নৌ-যানকে ওদিকে সরে যাবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

রানার নির্দেশে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ইকবাল। সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেছে সে, সী প্লেনের দিক বদলে কলম্বোকে এড়াবার চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।

সূর্য আকাশ থেকে উধাও, অথচ সময় এখন বিকেল চারটে। প্রবল ঝাঁকুনিতে দু'বার বমি করল ইশরাত। ইকবালের জ্ঞান হারাবার অবস্থা, লক্ষ করে পাইলটের সীট থেকে টেনে ওঠাল রানা তাকে, নিজে বসল সেখানে। দৃষ্টিসীমা পঞ্চাশ গজের বেশি নয়. ক্রমশ আরও কমে আসছে। গুড়গুড় করে

মেঘ ডাকলে শিশুর মনে যে ভয় জাগে, রানার বুকে ঠিক সে-ধরনের একটা ভয়। তিন তারিখে ভারতীয় দুটো ফ্রিগেট আর দুটো ডেস্ট্রয়ারকে বঙ্গোপসাগরের কোথাও ডুবিয়ে দেয়া হবে, এই তথ্য একা শুধু সে জানে। চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে বা বাংলাদেশের জলসীমার ভেতর ওগুলো ডুবিয়ে দেয়া হলে তার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারকেই বহন করতে হবে। বাংলাদেশ ভারতের মিত্র রাষ্ট্র, কিন্তু মিত্র রাষ্ট্র সঙ্গত অসঙ্গত কারণে শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হতে বেশি সময় নেয় না, এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক আছে। ভুল বোঝাবুঝির কারণেও বিদ্বেষ ও বৈরিতার সূচনা ঘটতে পারে। চার-চারটে যুদ্ধ জাহাজ, পাঁচ-সাতশো নাবিক ও ক্রুসহ চট্টগ্রামের কাছাকাছি আক্রান্ত হলে ভারত যদি বাংলাদেশকে আক্রমণ করে বসে, তাতেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। রণকৌশল এমন একটা বিপজ্জনক বিদ্যা, সমরবিদরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন—আঘাত করা হলে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত করো, ভুল হলে পরে দুঃখ প্রকাশ করার পথ তো খোলাই থাকছে।

রাত নামল অকূল সাগরে বিভীষিকার মূর্তি নিয়ে। ঢেউগুলো খড়কুটোর মত প্লেনটাকে নিয়ে খেলছে। তীব্র স্রোত আর প্রবল বাতাসে প্লেন এগোচ্ছে না পিছু হটছে বোঝা যায় না। ট্যাঙ্কে আরও দুই ক্যান ফুয়েল ভরল রানা।

কেবিনের একটা সীটে বসার পরই ঘুমিয়ে পড়েছে ইকবাল। কো-পাইলটের সীটে ইশরাত বসে আছে ঠিকই, কিন্তু দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে ভয়ে।

রাত একটার দিকে ইশরাতকে কেবিনে পাঠাল রানা, 'যান, ইকবালের ঘুম ভাঙান। বলুন ঝড়টাকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি।'

'কিভাবে বুঝলেন?' সদ্য ঘুম থেকে জেগেছে ইশরাত, চোখ কচলাচ্ছে।

'একটু খেয়াল করলে আপনিও বুঝতে পারবেন,' বলল রানা। 'আগের মত ঝাঁকি খাচ্ছেন?'

'তাই তো! আমরা এখন কোথায়?'

'চট্টগ্রাম এখনও সাতশো কিলোমিটার দূরে,' বলল রানা। 'যান, ইকবালকে ডাকুন।'

কেবিনে ঢুকে কো-পাইলটের সীটে বসল ইকবাল। 'ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সে। 'সর্বনাশ! আর মাত্র তিন গ্যালন তেল আছে!'

'হ্যাঁ। আপনার ঘুম ভাঙানোর সেটাই কারণ। আর মাত্র দুটো ক্যান আছে, তাতে ফুয়েল আছে বারো গ্যালন। তাতে কি সাতশো কিলোমিটার কাভার করা যাবে, এই আবহাওয়ায়?'

'ঝড় দেখছি আগের চেয়ে অনেক শান্ত,' ককপিটের বাইরে তাকিয়ে বলল ইকবাল।

'তবে পুরোপুরি থামতে আরও সময় নেবে। এখুনি আমরা আকাশে উঠতে পারছি না।'

'পনেরো গ্যালন তেলে অর্ধেক পথও কাভার করা সম্ভব নয়,' ভারী গলায় বলল ইকবাল। রেডিও সেট অন করল সে। 'ডাকাডাকি করে দেখি আশপাশে

কোন জাহাজ আছে কিনা। ফুয়েল না পেলে চট্টগ্রামে পৌঁছুনো সম্ভব নয়।'

এক তারিখ ভোর রাত। আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ঝড়ের তাণ্ডব। পাহাড় সমান ঢেউ মিছিলের মত ছুটে এসে আঘাত করছে সী প্লেনকে। রিজার্ভের নিচের দিকে সামান্য ফুয়েল পড়ে আছে, সেটুকু ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছে রানা, ফলে সাত ঘণ্টা আগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এঞ্জিন। উত্তাল সাগর খুদে জলযানকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে। ককপিটের উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে গেছে, ফলে ঢেউয়ের অবিরত হামলায় লাফ দিয়ে ভেতরে পানি ঢুকছে। দু'পাশে রাবার ফ্লোট থাকায় প্লেন ডুবছে না, ড্রেনেজ সিস্টেম থাকায় পানিও বেরিয়ে যাচ্ছে, তবে লোনা আর হিম পানিতে সারাক্ষণ ভিজছে ওরা। এঞ্জিন বন্ধ হলেও প্লেন থেমে নেই, প্রায় তীরবেগে ছুটে চলেছে কোন্ অজানা পথে কে জানে। বাস্কেটে পানি ঢোকায় সমস্ত খাবার লোনা হয়ে গেছে, মুখে তোলার যোগ্য নেই। দু'তিনটে বড় আকৃতির ঢেউ প্লেনের ভেতরে সরাসরি হামলা করায় দিক-নির্দেশক সমস্ত যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তার আগেই ভেঙে গেছে এরিয়াল ও অ্যান্টেনা। লোনা পানি ঢোকায় অকেজো হয়ে গেছে রেডিও ও কমিউনিকেশন সিস্টেম। আশপাশে কোন জাহাজ থাকলেও সাহায্য পাবার জন্যে ডাকা যাবে না। এখন আর গন্তব্যে পৌঁছানোর কথাও ভাবতে পারছে না ওরা। কিভাবে জান বাঁচাবে সেই চিন্তায় অস্থির। যেহেতু করার কিছু নেই, নিজেদেরকে ওরা নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। আর নিয়তির নৃশংসতা কি ভয়াবহ হতে পারে সে-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে রানার। তবে এবারই বোধহয় প্রথম অভিজ্ঞতা হলো নিয়তির কৌতুক বোধ একাধারে অবিশ্বাস্য ও চমকপ্রদও হতে পারে।

দিনটা কিভাবে কাটল বলতে পারবে না ওরা। প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে থেঁতলে যাচ্ছে শরীর, সীট-বেল্ট যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হলো। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, কিন্তু সে-কথা ভুলিয়ে রাখল প্রবল আতঙ্ক। দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ নেই, সারাক্ষণ ভিজছে, রাক্ষসী হয়ে ওঠা সাগরের গর্জনে কেউ কারও চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না।

আলোড়িত, দ্রুতগতি ও ঘন কৃষ্ণ মেঘের মোড়কের ভেতর সময় কাটছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, মোড়কের ভেতর আলোর কোন তারতম্য নেই, সময়টা সকাল না বিকেল বোঝার উপায় নেই। ঘড়িতে অবশ্য রাত চারটে—দুই তারিখ। তবে আরেকবার শান্ত হতে শুরু করেছে সাগর, ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ আবার একটা ভোর হচ্ছে। ঢেউগুলো নত করল ফণা, বৃষ্টিও ধরে এল, ফলে আরও অনেক দূর চোখ বুলাতে পারছে ওরা।

চোখে বিনকিউলার থাকলেও অন্তহীন সাগর ছাড়া সারা দিন কিছুই দেখা গেল না। সন্ধ্যার পরও ইকবালের বিনকিউলারটা চোখে তুলে ডান পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, তন্ন তন্ন করে খুঁজছে দিগন্ত রেখায় কিছু

আছে কিনা। দিনের শেষে আবার রাত নামল।

সাতটার দিকে ক্ষীণ হলেও বাতিঘরের আলোটাই প্রথমে চোখে পড়ল, বিশ কি পঁচিশ মাইল দূরে। আলোটা এতই অস্পষ্ট, আধ ঘণ্টা চুপ করে থাকল রানা, ইশরাত বা ইকবালকে কিছুই বলল না। স্রোতের সঙ্গে ভেসে ওদের সী প্লেন ওদিকেই ছুটে চলেছে। ককপিট আর কেবিনের মাঝখানে দরজাটা খোলা, চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ইকবালের দিকে একবার তাকাল রানা। সীটের ওপর নেতিয়ে আছে সে, তবে জেগে আছে বলেই মনে হলো।

দশ মিনিট পর নিঃসন্দেহ হলো রানা। বাতিঘরটা এখন পনেরো মাইল দূরে। ওটার পাশে, ডান দিকে, ছোট্ট একটা বোট ঢেউয়ের দোলায় দুলছে, কালো ও লম্বাটে একটা দাগের মত, সী প্লেন থেকে দশ কি বারো মাইল দূরে। মনে মনে বিস্মিত হলো রানা—এখন খালি চোখেও দেখা যাচ্ছে বোট আর বাতিঘর, ইকবালের অন্তত চোখে পড়ার কথা না?

যেন রানার মনের কথা টের পেয়েই, নিজস্ব পদ্ধতিতে জবাবটা দিল ইকবাল। হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল এঞ্জিন।

'ওটা নরম্যানস পয়েন্ট বাতিঘর,' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা। 'ডান পাশে একটা বোট আছে, মনে হচ্ছে ছোট স্টীমার—জেটির মাথায়।'

'ইয়ট,' শুধরে দিল রানা, চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে বাড়িয়ে দিল ইকবালের দিকে। 'চোখে লাগান এটা, দেখুন দেখি চিমনির গায়ে লেখাটা পড়তে পারেন কিনা। ডেকে আলো জ্বলছে।'

দশ সেকেন্ড পর জবাব দিল ইকবাল, 'সুইট হোম! খোলা সাগরে এতবড় একটা ইয়ট নোঙর ফেলেছে, ব্যাপারটা কি?'

ইশরাত আঁতকে উঠল, নাকি গলা থেকে উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল, বোঝা গেল না; হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

রানা গম্ভীর সুরে নির্দেশ দিল, 'তৈরি হয়ে নিন। আপনাকে খানিকটা অভিনয় করতে হবে।'

'মানে?' ইশরাত ঢোক গিলল।

'কি করতে হবে বলে দিচ্ছি,' শুরু করল রানা। 'আপনি কবিরের বিরুদ্ধে চলে গেছেন, ফজলুলউদ্দিন তালুকদারের তা না জানারই কথা, ঠিক? কাজেই...'

দু'মিনিটের মধ্যে সব বুঝিয়ে দিল রানা। ঠিক হলো ঠিক আটটায় ইয়টে উঠবে ওরা।

'এ আর এমন কি,' বলে হাসল ইশরাত। 'অভিনয় আমি ভালই পারি।'

এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে ইকবালের প্রশ্নের জবাব দিল রানা। 'কোত্থেকে জেনেছি জিজ্ঞেস করবেন না, সুইট হোম সম্পর্কে গোপন অনেক তথ্য আমার মুখস্থ। লম্বায় ওটা আড়াইশো ফুট, তলায় দ্বিতীয় একটা খোল আছে, আর্মস স্মাগলিঙের কাজে ব্যবহার করা হয়।'

সুইট হোম আর যখন পঞ্চাশ গজ দূরে, ফুয়েলের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল সী প্লেনের এঞ্জিন। ইতিমধ্যে ইয়টের ডেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসেছে, তার মধ্যে একজন চট্টগ্রামের জঙ্গী মৌলবাদী নেতা হিসেবে কুখ্যাত, একানব্বুই সালের সাধারণ নির্বাচনে জিতলেও ছিয়ানব্বুইয়ে গো-হারা হেরেছেন—ফজলুলউদ্দিন তালুকদার। পাশে দাঁড়ানো এক যুবক, বাঙালী নয়, রোহিঙ্গা শরণার্থী। বয়েস খুব কম, পরনে সবুজ ইউনিফর্ম। ইশরাত জানাল, সেই ইয়টের পাইলট—কণ্ঠনালিতে জটিল একটা অপারেশন হওয়ায় কথা বলতে পারে না।

বুদ্বুদের স্বচ্ছ ঢাকনিটা সরিয়ে সী প্লেনের ককপিটে দাঁড়িয়ে আছে ইশরাত, ইয়ট থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে। বাকি দূরত্বটুকু স্রোতের টানে পেরিয়ে এল ওরা। জেটিটা সম্ভবত পরিত্যক্ত, আশপাশে আর কোন বোট নেই। ইশরাতকে চিনতে পেরে মুখ ভর্তি দাড়ির ভেতর বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল তালুকদার। রোহিঙ্গা তরুণকে ইশারা করতেই একটা লাইন ছুঁড়ে দিল সে সী প্লেনকে লক্ষ্য করে। ইকবাল সেটা খপ করে ধরে ফেলল, ইশরাতের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

সাদা রঙ করা লোহার একটা মই পানিতে নেমে এসেছে, সেটা বেয়ে ইয়টে উঠল ওরা—প্রথমে ইশরাত, তারপর ইকবাল, সবশেষে রানা। রানা আর ইশরাতের কাছে অস্ত্র আছে, তবে হাতে নয়। ইকবাল নিরস্ত্র। রোহিঙ্গা পাইলট সী প্লেনটাকে ইয়টের সঙ্গে বেঁধে রাখছে। তালুকদারের পিছু নিল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে মেইন কেবিনে ঢুকল। ইতিমধ্যে মোঘল ঐতিহ্যের কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ইশরাতকে কুর্নিশ করেছে তালুকদার, ইশরাত যেন একজন সম্রাজ্ঞী। ইকবালকে দেখে ভুরু নাচিয়েছে। রানাকে দেখে প্রথমে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, বা প্রকাশ পায়নি—ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক চোখ বুলিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে সালাম করেছে। ঠোঁট টিপে একটু হেসে সালামের জবাব দিয়েছে রানা, কথা বলেনি।

মেইন কেবিন আধুনিক ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। 'এই ইয়ট আপনার স্বামী, আমার ওস্তাদ, জনাব খায়রুল কবিরই আমাকে উপহার দিয়েছেন, বলতে গেলে আপনাদেরই সম্পত্তি। তা হঠাৎ আপনারা এই দুর্যোগের মধ্যে কোত্থেকে এলেন বলুন তো? আপনার সঙ্গে ইনি…,' ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল তালুকদার, তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'যদিও বিশ্বাস করিনি, তবে শুনলাম আপনারা নাকি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।'

'আপনি জানেন না? ওটা ছিল প্রয়োজনের খাতিরে সাজানো নাটক। ইনি আমার বড় ভাই, হাসান জাহান।' হেসে উঠল ইশরাত। 'আমাদের অপারেশন সম্পর্কে সবই জানেন ভাইয়া। আপনার বস্ বা বন্ধু, যাই বলুন, মানে আমার স্বামীর কথা বলছি আর কি—সে আসছে করাচী থেকে, আর আমরা আসছি প্যারিস থেকে।' ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল ও। 'সারপ্রাইজ দেব বলে কিচ্ছুটি জানাইনি, ভাইয়াকে নিয়ে সী প্লেনে চড়ি এখানে তার আগে

পৌঁছুব বলে। তখন কি আর জানতাম এমন ঝড়ের মধ্যে পড়ব। সত্যি কথা বলতে কি, আল্লাহ্ আমাদেরকে হাতে ধরে বাঁচিয়েছেন।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল তালুকদার। 'সবাই তো দেখছি আধমরা হয়ে গেছেন! কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, এখুনি আমি আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা আর আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থা করছি।'

'ইয়টে লোকজন কোথায়?' হেসে উঠে জানতে চাইল রানা। 'কারা আমাদের সেবা-যত্ন করবে?'

'কবির সাহেব অনেক লোকজন নিয়ে আসছেন, কাজেই খানাপিনা আর আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থা আগেই সেরে রেখেছি,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল তালুকদার। 'টেবিলে খাবার-দাবার সাজানো আছে, কেবিনগুলোও সব রেডি করে রাখা হয়েছে...'

'কি বলছেন! কবির কি ইয়টে এসে উঠবে? মানে এখানে থাকবে?'

মাথা নাড়ল তালুকদার। 'আরে না। অপারেশনটা উনি বিনকিউলার দিয়ে দূর থেকে দেখবেন, কুতুবদিয়ার ঘাঁটি থেকে। কিন্তু উনি আমার ওস্তাদ, আসার যখন কথা আছে, আমি তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রাখব না? হে হে!'

'ভারতীয় ফ্রিগেট আর ডেস্ট্রয়ার কখন এসে পৌঁছুবে?' জিজ্ঞেস করল ইশরাত।

তৃপ্তির হাসি হেসে তালুকদার বলল, 'এই দেখুন, গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছেন আপনি, ম্যাডাম! সত্যি কথা বলতে কি, অপারেশন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই এখনও আমি জানি না। আমাকে বিশ্বাস করেন বলেই সিক্রেট তথ্যটা জানিয়ে দিলেন। সত্যি আমি কৃতার্থ বোধ করছি।'

'অপারেশন সম্পর্কে কিছুই আপনাকে জানানো হয়নি?' ইশরাতকে বিস্মিত দেখাল।

'না-আ-আ!' নার্ভাস একটু হাসল তালুকদার। 'কবির সাহেবের এটাই তো গুণ, তাঁর নিজস্ব একটা সময়জ্ঞান আছে, যখন প্রয়োজন মনে করেন তখন জানান। আমি ছিলাম বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে, ইয়টে কার্গো লোড হচ্ছিল, এই সময় মেসেজ পেলাম—আমাকে সনম্যারন অর্থাৎ নরম্যানস পয়েন্টে ইয়ট নিয়ে থাকতে হবে, উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। মেসেজে একটা বড় ধরনের অপারেশনের কথাও বলা হয়েছে, সেটা তিনি কুতুবদিয়া ঘাঁটি থেকে দেখবেন। উনি ভিডিও ক্যামেরা সহ অপারেটর নিয়ে আসবেন, এই ইয়ট থেকে অপারেশনটার ছবি তোলা হবে। তাই নাফ নদী ধরে আজ সকালে এখানে পৌঁছেছি।'

ইশরাত বলল, 'কিন্তু আপনার তো তিন তারিখে পৌঁছানোর কথা, অথচ আজ দুই তারিখ।'

ঘন কালো দাড়িতে হাত বুলিয়ে তালুকদার হাসল। 'ইয়টে কার্গো তোলার কাজ শেষ হয়ে গেল, তাই আগেভাগে চলে এলাম। কার্গো আনলোড করার কথা পতেঙ্গায়, ইচ্ছে করেই করিনি।'

'কেন?'

'ম্যাডাম হয়তো ছেলেমানুষি বলবেন, কিন্তু ওস্তাদকে নিজের কৃতিত্ব দেখাবার লোভটা সামলাতে পারিনি,' জবাব দিল তালুকদার। 'এ-সব মাল তো ওনারই। সবই ওনার ক্যাডারদের মধ্যে বিলি করা হবে, তাই ভাবলাম মায়ানমার থেকে এবার কি এনেছি ওনাকে একবার দেখাই।'

'ও, তাই বলুন। মায়ানমার থেকে কি আর আনবেন, আর্মস আর ড্রাগস। এটা তো আমাদের রেগুলার অ্যাসাইনমেন্ট।' ইশরাতের ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি।

এক খিলি পান মুখে দিয়ে মাথা নাড়ল তালুকদার। 'জ্বী-না, ম্যাডাম,' বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল তালুকদার। 'এবার ও-সব নয়, অন্য জিনিস এনেছি।'

'অন্য জিনিস?' ভুরু কোঁচকাল ইশরাত। 'অন্য কি জিনিস?'

'জেলিগনাইট, ম্যাডাম, প্রচুর পরিমাণে। সঙ্গে আছে নতুন ডেভেলপ করা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, সেক্সটেক্স-এর চেয়ে তিন গুণ বেশি শক্তিশালী। আরও আছে লিমপেট মাইন।' দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হাসছে তালুকদার। 'ওস্তাদ বলেছেন, বর্তমান সরকারের পতন ঘটাতে হলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিতে হবে। আর অর্থনীতি ধ্বংস করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেয়া।'

'কিন্তু বন্দরে ঢুকে জাহাজের গায়ে লিমপেট মাইন ফিট করা সহজ কাজ নয়,' এই প্রথম কথা বলল রানা। 'দক্ষ ও সাহসী ডুবুরী লাগবে।'

'আছে তা! বিদেশ থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। তবে এ-ধরনের ডুবুরী পাওয়া খুব কঠিন, মাত্র দু'জনকে পাওয়া গেছে। সেজন্যেই তো জেলিগনাইট আনা হয়েছে।'

'কিন্তু জেলিগনাইটও তো জাহাজে ফিট করে আসতে হবে,' বলল রানা!

'এগুলোতে টাইমিং ডিভাইস ফিট করা, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়,' বলল তালুকদার, তৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। 'জাহাজে ফিট করতে হবে না, আকাশ থেকে ফেলা হবে।'

'আকাশ থেকে ফেলা হবে?' রানা ও ইশরাত একযোগে বলে উঠল।

'গ্লাইডার!' বিজয়ীর হাসি হেসে পিকদানীতে পানের পিক ফেলল তালুকদার। 'এবারের কার্গোতে ওগুলোই তো তুরুপ। এক ডজন গ্লাইডার আনা হয়েছে। ইটালির তৈরি, মাফিয়াদের সাহায্যে মায়ানমারে আনা হয়। কিন্তু এ-সব আলাপ পরে করা যাবে, এবার আপনাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করি।' মেইন কেবিনের দু'পাশে চারটে দরজা, সেদিকে ইঙ্গিত করল সে। 'প্রতিটি কেবিন তৈরি করা আছে, অ্যাটাচড্ বাথ থেকে শাওয়ার সেরে ডাইনিং কেবিনে চলে আসুন...'

ঠিক এই সময় ওদের পিলে চমকে দিয়ে ইয়টের বাইরে থেকে খায়রুল কবিরের গলা ভেসে এল, 'ও হে, ফজলা, তুমি কি মারা গেলে? এতক্ষণ ধরে ডাকছি, সাড়া দিচ্ছ না কেন? সঙ্গে আবার সেই বোবাটাকে রেখেছ, হাঁ করে শুধু তাকিয়ে থাকে!'

ভোজবাজির মত রানার হাতে অটোমেটিক পিস্তলটা বেরিয়ে এল। খপ করে তালুকদারের কাঁধ খামচে ধরল, এক টানে বসিয়ে দিল একটা সিঙ্গেল সোফায়। সোফাটার ঠিক পিছনে একটা দরজা। 'যা বলব ঠিক তাই করবে তুমি, তালুকদার, তা না হলে আজই তোমার শেষ দিন।' হাঁ হয়ে গেছে তালুকদার, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল ইশরাতের হাতেও একটা পিস্তল বেরিয়ে আসতে দেখে। 'কবির যেন জানতে না পারে ইশরাত আর আমি এখানে আছি। সী প্লেন নিয়ে ইকবাল একা এসেছে, তার আগে আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছে পতেঙ্গায়। আমরা কোথায় গেছি বা আছি, তোমরা কেউ জানো না। কবির যখন মেইন কেবিনে ঢুকবে, প্রয়োজন হলে এই সোফা ছেড়ে দাঁড়াবে তুমি, কিন্তু পা বাড়াবে না। পা বাড়ালে,' ইঙ্গিতে পিছনের দরজাটা দেখাল রানা, 'ওখান থেকে আমি তোমার মাথার পিছনে গুলি করব। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'জ্বী, হু...'

'কার্গোর কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে পতেঙ্গায় খালাস করেছ।'

'তোমার হলো কি, ফজলা? ঘুমাচ্ছ নাকি?' আবার ভেসে এল কবিরের গলা। 'সঙ্গে সঙ্গী-সাথী আছে, তুমি আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে না?'

'ইকবাল, সাবধান! আপনি ইশরাতের চাকরি করেন, আপনার সামান্য ভুলে উনি খুন হয়ে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে, আপনিও বাঁচবেন না।' ইশরাতের দিকে তাকাল রানা। 'আসুন।'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, ম্যাডাম,' বলল ইকবাল। 'আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

'তোমাকে আমি পরে সব ব্যাখ্যা করব, ইকবাল,' বলল ইশরাত। 'শুধু এটুকু জেনে রাখো, কবির আমাকে দেখামাত্র খুন করবে।'

'আমরা ইয়টে উঠেছি, তালুকদার,' ইয়টের কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে কবিরের গলা ভেসে এল। 'তোমার অতিথিদের সাবধান করে দাও। সংখ্যায় আমরা বিশজন।'

সিঙ্গেল সোফার পিছনের দরজা দিয়ে কেবিনে ঢুকল রানা ও ইশরাত। দরজাটা বন্ধ করল রানা, তবে তালা লাগাল না।

নয়

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ওরা, নিঃশ্বাস ফেলতে প্রায় ভুলেই গেছে, মেইন কেবিন থেকে ভেসে আসা কথাবার্তা শুনছে মনোযোগ দিয়ে। কবাটের সরু ফাঁকে চোখ।

'কি ব্যাপার বলো তো, ফজলা মিয়া? কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি, অথচ কোন সাড়া দিচ্ছ না। কি ভেবেছ? সত্যি মারা গেছি? হা-হা-হা।'

'ওস্তাদ, হুজুর,' সোফা ছেড়ে দাঁড়াল তালুকদার, পা দুটো কাঁপছে। 'আপনি···সত্যি···আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?'

'আসলে কি জানো, অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। নকভিকে তো তুমি চেনোই। চিশতিকেও চেনো। বাকি এরা সবাই আমার বডিগার্ড। সরফরাজ,' গলা চড়াল কবির, 'ওপরেই থাকো তুমি, ইয়টে কাউকে উঠতে দেবে না।' এগিয়ে এসে তালুকদারের সঙ্গে কোলাকুলি করল সে। 'ভূত নই, জ্যান্ত মানুষ, তোমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ খায়রুল কবির স্বয়ং। কি, এবার বিশ্বাস হলো?' ঝট করে ঘুরে ইকবালের দিকে তাকাল। 'ইশরাত কোথায়? আর আমাদের সেই পারিবারিক দুশমন, মাসুদ রানা? জানি, ওদেরকে সী প্লেনে তুলে এখানে নিয়ে এসেছ তুমি। নিশ্চয়ই ইয়টেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে···'

'ওদেরকে পতেঙ্গায় নামিয়ে দিয়ে এসেছি,' বলল ইকবাল। 'ওঁরা আপনার বিরুদ্ধে কিছু করার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, স্যার। তাই রিপোর্ট করার জন্যে এখানে এসেছি আমি।'

'ইশরাতের চাকরি করো, অথচ আমার উপকারে লাগতে চাও, এ-কথা কেন আমি বিশ্বাস করব?' হাসছে কবির। 'তাছাড়া, তুমি জানলে কিভাবে সুইট হোমকে কোথায় পাওয়া যাবে? তালুকদার আমার লোক, তা-ই বা তুমি কিভাবে জানলে?'

'ওঁরা আপনার অপারেশন সম্পর্কে সবই জানেন, স্যার,' বলল ইকবাল। 'ওঁরা আলাপ করছিলেন, সব আমি শুনেছি।'

'কি শুনেছ? কি জানে তারা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল কবির।

'তিন তারিখে চারটে যুদ্ধজাহাজ আসছে চট্টগ্রাম বন্দরে,' বলল ইকবাল। 'আপনি ওগুলো ডুবিয়ে দিতে চান।'

'কিভাবে?'

'তা ওঁরা জানেন না। তবে জানেন যে নরম্যানস পয়েন্টে ইয়ট নিয়ে তালুকদার সাহেব অপেক্ষা করবেন, ভিডিও ক্যামেরায় অপারেশনটার ছবি তোলা হবে।'

'ওরা তোমার ইয়টে সত্যি আসেনি?' সরাসরি তালুকদারকে জিজ্ঞেস করল কবির।

'না, ওস্তাদ।'

'আর কি জানে ওরা?' ইকবালের দিকে ফিরল কবির।

'আর কি জানেন আমি বলতে পারব না।'

'পারবে, প্যাঁদানি দিলে পারবে।' দাঁতে দাঁত ঘষল কবির। 'ওরা এখন কোথায়?'

'আমি সত্যি জানি না, স্যার,' বলল ইকবাল। 'পতেঙ্গায় নামিয়ে দিতে বললেন। কোথায় যাবেন বা কি করবেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেননি, কাজেই কি করে জানব। শেষদিকে ওঁরা বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।'

হঠাৎ হাসল কবির। 'যেখানেই থাকুক, চট্টগ্রামে ওদের জন্যে নিরাপদ কোন জায়গা নেই। আমার লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে আছে, ধরা ওরা পড়বেই। তালুকদার!'

'জ্বী, ওস্তাদ!' সোফার সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছে তালুকদার।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল কবির। 'অপারেশনের নামকরণ করা হয়েছে—নকআউট। শুরু হবে এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর। না, পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও নয়, আরও এক ঘণ্টা কম ধরো—কাল রাত আটটায়। তোমার কাজ হবে ইয়ট নিয়ে এখানেই থাকা। কাল বিকেলে দু'জন লোককে পাঠাব, তাদের সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরা থাকবে, গোটা অপারেশনের ছবি তুলবে তারা। ঠিক আছে?'

'জ্বী, ওস্তাদ।'

'ফজলা, জিজ্ঞেস করবে না, বাজপেয়ীর যুদ্ধজাহাজগুলো কিভাবে আমরা ডোবাব?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল কবির। 'নাকি ভাবছ বেশি কৌতূহল দেখানো হয়ে গেলে তোমার ওপর রাগ করব আমি?'

'ওস্তাদ!'

'শোনো, ফজলা। সারা দুনিয়ায় টেকনো-টেরোরিস্ট হিসেবে আমার খ্যাতি ছড়িয়েছে, সেটা অকারণে নয়। অপারেশন নকআউট এখন যদি ব্যাখ্যা করি, তুমি আমাকে জিনিয়াস না বলে পারবে না।' নিজের রসিকতায় নিজেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল কবির। 'কি, শুনতে চাও?'

'ওস্তাদ!'

'আমার কাছে টর্পেডো আছে, ফজলা। রিমোট কন্ট্রোলড্ টর্পেডো। কমিউনিজমের পতনের পর রাশিয়ায় কি রকম ঘুষ খাওয়া-খাওয়ি চলছে তা তো জানোই। নব্য জার ইয়েলিৎসিনকে মদদ যোগাচ্ছে দুশ্চরিত্র ক্লিনটন, ফলে রাশিয়ানদের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। ওরা এখন যে যা হাতের কাছে পাচ্ছে সব গোপনে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই সুযোগে ওদের কাছ থেকে দুটো আইটেম কিনেছি আমরা। একটা হলো ওই রিমোট কন্ট্রোলড্ টর্পেডো। আরেকটা···থাক, সেটার কথা না-ই বা শুনলে। তবে অপারেশন শুরু হলে ওটার পরিচয় জানতে পারবে। আরেকটা কথা।'

'জ্বী, ওস্তাদ।'

'ভিডিওতে ছবি তোলার পর অকুস্থলে এক মুহূর্তও থাকবে না তুমি,' বলল কবির। 'টর্পেডোর আঘাতে শুধু যে হিন্দুস্থানী জাহাজগুলোয় আগুন লাগবে, তা নয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দু'একটা জাহাজ ওগুলোকে এসকর্ট করে নিয়ে আসবে, সেগুলোতেও আগুন ধরে যাবে। পাকিস্তানের সম্পদ নষ্ট হবে, যদিও করার কিছু নেই। হতাহতের সংখ্যা পাঁচ-সাতশোকেও বোধহয় ছাড়িয়ে যাবে, হাজার দু'হাজার হলেও অবাক হব না। আমি চাই না তাদের মধ্যে তুমিও থাকো।'

'জ্বী, ওস্তাদ। ছবি তোলা হয়ে গেলেই চলে যাব। কোথায় যাব, ওস্তাদ?'

'তার আগে বলো, কার্গো কোথায় নামিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল কবির।

'কেন, যেখানে আনলোড করার কথা ছিল,' জবাব দিল তালুকদার। 'পতেঙ্গায়। আমাদের গোডাউনে সব তুলে রাখা হয়েছে, ওস্তাদ।'

'গুড। ছবি তোলার পর টেকনাফে চলে যাবে তুমি।'

'ওস্তাদ, আপনি...'

'আমি থাকব কুতুবদিয়ার ঘাঁটিতে, টেকনাফে যাবার পথে আমাকে তুমি তুলে নেবে।' কি যেন চিন্তা করল কবির। 'অপারেশনের পর পূর্ব-পাকিস্তান নরক হয়ে উঠবে। কাজেই আপাতত পশ্চিম পাকিস্তানেই ফিরে যাব, মায়ানমার হয়ে। নকভি, সরফরাজকে একবার ডাকো। ওকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে যাই। ফিরোজাকে ব্রিজে পাঠাও, চার্টটা নিয়ে আসুক।'

কম্প্যানিয়নওয়েতে পায়ের আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড পর হাতে অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে মেইন কেবিনে ঢুকল সরফরাজ, দীর্ঘদেহী এক তরুণ। 'স্যার, আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ। সরফরাজ, এই ইয়টেই তোমাকে ডিউটি দিতে হবে। কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারবে না। ঠিক আছে?'

'স্যার, আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, অপারেশন নকআউট শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না।'

'গুড। ঠিক আছে, তুমি যাও—ইয়টের চারপাশে নজর রাখো। কিছু দেখে সন্দেহ হলে আমাকে ফোন করবে,' বলে তালুকদারের দিকে তাকাল কবির 'তোমার স্যাটেলাইট টেলিফোনটা দেখছি না যে?'

'দেরাজে আছে, ওস্তাদ। দেব?'

'না। তবে সরফরাজকে দেরাজটা দেখিয়ে দাও।'

'ওই তো।' একটা ফাইলিং কেবিনেটের দিকে হাত তুলল তালুকদার।

কবিরের অনুমতি নিয়ে মেইন কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সরফরাজ। ইতিমধ্যে ফিরোজা ব্রিজ থেকে চার্ট ও পেন্সিল এনেছে, তালুকদারের সামনে নিচু টেবিলের ওপর সেটার ভাঁজ খোলা হলো। 'ফজলা, আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তুমি। এই জেটি ছেড়ে কাল সন্ধ্যা ঠিক সাতটায় রওনা হবে, তাহলে এখানে, এই পয়েন্টে সময়মত পৌঁছুতে পারবে,' চার্টের একটা পয়েন্টে পেন্সিলের ডগা ছোঁয়াল কবির, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশও উল্লেখ করল। 'এখানে পৌঁছুতে পারলে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকুণ্ডের এক মাইল দূরে থাকা হবে তোমার। জাহাজগুলোয় আগুন জ্বলতে দেখলে আরও কাছাকাছি যাবে, তবে বেশি কাছে যেয়ো না। ভিডিও ক্যামেরাগুলোয় টেলিফটো লেন্স লাগানো আছে, দূর থেকেও ভাল ছবি পাব আমরা। আরেকটা কথা।'

'ওস্তাদ।'

'কাল সকালে এই পয়েন্ট থেকে ঘুরে আসবে তুমি, মানে রিহার্সেল বা মহড়া দেবে আর কি।'

'জ্বী, ওস্তাদ।'

'ফজলা!' হঠাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল কবির।

'জ্বী, ওস্তাদ?' ঝাঁকি খেলো তালকদার।

'তোমাকে আমি কাঁপতে দেখছি কেন? তোমার বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষ স্মাগলার। তোমার এলাকার চারজন নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে খুন করার পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হয়েছিলে তুমি, শুধু কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প আর রিলিফ চুরি করার জন্যে। তারপর গরীব মানুষের ভোট কিনে সাংসদ হয়েছিলে। তারপরও বাপ-দাদার স্মাগলিং ব্যবসা ছাড়তে পারোনি, প্রতি মাসে চোরাই অস্ত্র এনে আমাকে সাপ্লাই দিচ্ছ। আমি বলতে চাইছি, তোমার নার্ভ ইস্পাত নয়, হীরের মত শক্ত। সে-ই তুমি কাঁপছ কেন? ব্যাপারটা কি?'

'ওস্তাদ,' কাঁপতে কাঁপতেই বলল তালুকদার, 'বেয়াদপি মাফ করবেন! শুধু আমি নই, আমার সমগ্র অস্তিত্ব আর আমার গোটা জগৎ কাঁপছে। দায়ী আপনার এই অপারেশন নকআউট। ওস্তাদ, আপনি একটা পারমাণবিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। আর বলছেন যেখানে যুদ্ধটা শুরু হবে সেখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকতে হবে আমাকে। আমি তো আমি, ওস্তাদ, কবরে আমার বাপ-দাদারাও বোধহয় কাঁপছে।'

নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, গলা ছেড়ে আবার হেসে উঠল কবির। 'আরে গাধা, যুদ্ধটা তো হবে একতরফা! বাজপেয়ীর জাহাজগুলোর ক্যাপটেন ও ক্রুরা বুঝতেই পারবে না কোত্থেকে কি আঘাত করল। হঠাৎ ঝাঁকি খাবে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে খোল আর এঞ্জিন, দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, তারপর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ডুবে যাবে। পাল্টা হামলা করবে, তার সুযোগ কোথায়? এক মাইল কেন, সিকি মাইল দূরে থাকলেও ওগুলোতে তোমার ইয়টের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আগেই তো বলেছি, টর্পেডোগুলো রিমোট কন্ট্রোলড্। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পানির তলা দিয়ে আসবে।'

ধপ করে সোফায় বসে পড়ার পর অনুমতি প্রার্থনা করল তালুকদার, 'ওস্তাদ, আমি বসি?'

কবির এমন ভাব দেখাল, ব্যাপারটা যেন সে খেয়াল করেনি বা শুনতে পায়নি। বলল, 'আরেকটা কথা, ফজলা।'

'জ্বী, ওস্তাদ।'

'কাল সকালে মহড়া দেয়ার সময় যদি পালিয়ে যাও, আমার লোকেরা তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। তোমার সমস্ত গোডাউনের ঠিকানা আমার জানা আছে, কথাটা ভুলো না।'

'ছি, কি বলেন, না!' প্রতিবাদ করল তালুকদার।

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে যাই, অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু করি,' বলল কবির। 'কুতুবদিয়ায় আবার আমাদের দেখা হচ্ছে, কেমন?'

'জ্বী, ওস্তাদ।'

'ইকবাল, ইশরাতের সী প্লেন এখানেই থাকুক,' বলল কবির। 'তবে তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

এক কি দুই সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর ইকবাল বলল, 'আমি আপনার

ভাল করতে চেয়েছি, স্যার। তা না হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুইট হোমে আসতাম না। আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে রিপোর্ট করা। যা জানি সবই বলেছি। তারপরও যদি আমাকে আপনার সন্দেহ হয়, যদি টরচার করেন···সেক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হব, আল্লাহর বিচার নেই।'

'তওবা বলো! তওবা বলো! ছি-ছি, আল্লাহর এত বড় দুর্নাম! তওবা করো!' মাথা নাড়ছে কবির। 'শোনো, ইকবাল, বিনা স্বার্থে বা বিনা কারণে কেউ কারও উপকার করে না। তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেই কারণ বা স্বার্থটা কি জানার জন্যে। প্যাঁদানি দেয়া হবে শুনে ভয় পেয়েছ, বেশ বুঝতে পারছি। পাওয়াই উচিত। তবে এখনও সময় আছে, আরও যদি কিছু বলার থাকে, বলে ফেলতে পারো। চিশতি যখন তোমার দায়িত্ব নেবে, তখন কিন্তু কারও কিছু করার থাকবে না।'

'জ্বী-না, আমার আর কিছু বলার নেই।'

আশপাশে দাঁড়ানো আট-দশজন বডিগার্ডের দিকে একে একে তাকাল কবির। 'তোমরা কি বলো? ইকবালকে ইন্টারোগেট করা দরকার কিনা?

নকভি বলল, 'দরকার। তবে টেকনাফ ঘাঁটিতে ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, জায়গাটা এই মুহূর্তে সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। আমরা বরং ওকে কুতুবদিয়া ঘাঁটিতে নিয়ে যাই। সেক্ষেত্রে চিশতির ওপর নয়, ওর দায়িত্ব অন্য কাউকে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে, তবে তাই হোক, কুতুবদিয়ার ঘাঁটিতেই নিয়ে যাই ওকে।'

মেইন কেবিন থেকে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল খায়রুল কবির।

ইয়ট থেকে ওরা নেমে যাবার পর, এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর ফিসফিস করে ইশরাতকে নির্দেশ দিল, 'পোর্টহোলে চোখ রেখে দেখুন সবাই ওরা চলে যাচ্ছে কিনা।'

নিঃশব্দ পায়ে কেবিনের আরেক দিকে চলে গেল ইশরাত।

দরজা খুলে মেইন কেবিনে ঢুকল রানা, হাতে পিস্তল। 'অভিনয় ভালই করেছ,' তালুকদারকে বলল। 'পুরস্কারও পাবে—ইচ্ছে ছিল এখানেই তোমাকে গুলি করে মেরে রেখে যাব, তার বদলে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া হবে।' তালুকদারের সামনে চলে এল, পিছু হটে পৌঁছুল ফাইলিং কেবিনেটের কাছে। ইশরাতের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'আমাকে পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ দেয়া যায় না?' কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল তালুকদার। 'কথা দিচ্ছি, জীবনে কখনও বাংলাদেশে ফিরব না।'

'সেটা পরে বিবেচনা করা হবে,' বলল রানা।

মেইন কেবিনে ফিরে এল ইশরাত। তালুকদারের পিছনে দাঁড়াল সে, হাতে পিস্তল। 'ওরা একটা মাইক্রোবাস আর একটা মার্সিডিজ নিয়ে এসেছিল। পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে মনে হলো একজন বাদে সবাই চলে গেছে।'

'আপনি ওকে কাভার দিন,' বলে কেবিনেটের দেরাজ খুলে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করল রানা, বোতাম টিপল বিসিআই ঢাকা হেডকোয়ার্টারের নম্বরে। ভাগ্যটা ভালই, ডিউটি অফিসার দশ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সোহেল আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল।

সোহেলকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত একটা ধারণা দিল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'বসকে বল, যেভাবে হোক ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলোর শুভেচ্ছা সফর বাতিল করতে হবে। প্রয়োজনে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'তুই লাইনে থাক,' বলল সোহেল। 'বসের সঙ্গে কথা বলছি আমি।'

রানা জানে লাইনে ফিরে আসতে সময় নেবে সোহেল, ইশরাতকে তালুকদারের ওপর চোখ রাখতে বলে মেইন কেবিন থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠছে, কাঁচ লাগানো ব্রিজে চোখ পড়তে দেখল একটা চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছে রোহিঙ্গা পাইলট। ব্রিজের সামনে, খোলা ডেকে, একটা ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে সরফরাজ, কানে হেডফোন, কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ওয়াকম্যান—গান শুনছে। নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল, পিস্তলের মাজল ঠেকাল নগ্ন ঘাড়ে। স্থির হয়ে গেল সরফরাজ। টান দিয়ে মাথা থেকে হেডফোন নামাল রানা, খালি হাতটা সরফরাজের শার্টের ভেতর ঢুকিয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে ম্যাগনাম অটোমেটিকটা বের করে পকেটে ভরল। 'ওঠো,' বলে নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে এল ও। 'রেইলিং ঘেঁষে আমাকে পাশ কাটিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নামো।'

সরফরাজ এত অবাক হয়েছে, কথা বলতে পারছে না। মেইন কেবিনে ঢোকার সময় তার ঘাড়ে পিস্তল চেপে রাখল রানা। 'থামো,' বলে পিছনে দাঁড়িয়ে দ্রুত সার্চ করল তাকে। পকেট থেকে একজোড়া গ্রেনেড বেরুল, পায়ে স্ট্র্যাপের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটা ছুরি। 'শোও, সরফরাজ,' নির্দেশ দিল ও।

বিনা বাধায় নির্দেশ পালন করল সরফরাজ। ইশরাতের দিকে তাকাল রানা, 'ইয়টেই পাওয়া যাবে, যদি না পাও সী প্লেনে পাবে— খানিকটা রশি বা নাইলন কর্ড দরকার।'

মেইন কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইশরাত। ফিরল সাত মিনিট পর। কয়েক প্রস্থ নাইলন কর্ড এনেছে সে, প্রতিটি দুই গজ লম্বা। ওগুলো দিয়ে প্রথমে সরফরাজ ও তালুকদারের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। ইশরাতের হাতব্যাগ আর রানার পকেট থেকে বেরুল রুমাল। বন্দীদের পা বাঁধার পর মুখে সেগুলো গুঁজে দেয়া হলো। ইতিমধ্যে তালুকদারকে প্রশ্ন করে ফলস বটমের হদিস জেনে নিয়েছে রানা।

কাজটা শেষ করে স্যাটেলাইট ফোন কানে তুলল। 'হ্যালো?'

লাইনে এখনও ফেরেনি সোহেল। ইঙ্গিতে কাছে ডেকে রিসিভারটা ইশরাতের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'লাইনে কেউ এলে আমাকে ডাকবে।'

মেইন কেবিন থেকে বেরিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ব্রিজে উঠে এল।

রোহিঙ্গা পাইলটের ঘাড়ে হাতের কিনারা দিয়ে একটা কোপ মারল, ঘুমের মধ্যেই জ্ঞান হারাল সে, হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল ডেকে। ব্রিজ থেকে নেমে এল এঞ্জিনরুমে। একটা বাল্কহেডের গোড়ায় আঙুলের চাপ দিতে ডেকের একটা অংশ সুতোর মত সরু ফাঁক সৃষ্টি হলো। ছুরি দিয়ে চাঁড় দিতে চওড়া হলো ফাঁকটা। ছোট্ট একটা লোহার মই নেমে গেছে নিচে। সাবধানে নামল রানা।

ফলস বটমে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ও জেলিগনাইটের বাক্স সাজানো রয়েছে। লিমপেট মাইনের বাক্সগুলোও চিনতে পারল রানা। বড় সাদা রঙের ব্রীফকেস দেখা গেল বারোটা। কমবিনেশন লক, তালা খোলা সম্ভব নয়, ছুরি দিয়ে একটা ব্রীফকেসের ঢাকনি কেটে ফেলল ও। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ভাঁজ করা কাঠামোসহ গ্লাইডার রয়েছে ভেতরে।

প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর লিমপেট মাইনের কয়েকটা বাক্স নিল ও, বয়ে নিয়ে এল সী প্লেনে। দ্বিতীয়বার নিয়ে এল পাঁচটা ব্রীফকেস। কাজগুলো সেরে মেইন কেবিনে ফিরে আসছে, ইশরাতের চিৎকার শুনতে পেল, 'মাসুদ ভাই, তাড়াতাড়ি আসুন!'

ভেতরে ঢুকে ইশরাতের হাত থেকে ফোনের রিসিভার নিল রানা। 'সোহেল?'

'তোমার দেয়া তথ্য অসম্পূর্ণ,' বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ভারী কণ্ঠস্বর, রানার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। 'আমাদের এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নৌ-বাহিনী ইনফরমেশনগুলো কনভিন্সিং বলে মানতে রাজি হচ্ছে না।'

'স্যার...'

'তাছাড়া, যোগাযোগ করতেও অনেক দেরি করে ফেলেছ তুমি,' রানাকে বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'একে তো অসম্পূর্ণ তথ্য দিচ্ছ, তার ওপর ওগুলোর উৎস বা ভিত্তি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ কিংবা দলিল-পত্র দাখিল করছ না। দুই রাষ্ট্রেরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করছে, উড়ো খবরে ভয় পেয়ে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজের শুভেচ্ছা সফর বাতিল করা হলে সেটা হাস্যকর একটা ব্যাপার হবে, দুই দেশের ভাবমূর্তিরও বিরাট ক্ষতি হবে।'

'স্যার, আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সে-সব রিপোর্ট করতে হলে যে সময় লাগবে, তার আগেই ঘটনাটা ঘটে যাবে।'

'আমি তোমাকে চিনি, কাজেই তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু যারা তোমার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না তারা কেন বিশ্বাস করবে?'

'স্যার...'

'যা করার তোমাকে একাই করতে হবে, রানা,' আবার মাঝপথে রানাকে থামিয়ে দিলেন বস্। 'ওরা রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তি নিয়ে থাকুন, আমরা আমাদের কাজ করে যাই। এখান থেকে আমরা তোমাকে কি ধরনের সাহায্য

করতে পারি বলো।'

'স্যার, খায়রুল কবির কি করতে যাচ্ছে তা আমি জানি,' বলল রানা, 'কিন্তু কিভাবে করতে যাচ্ছে তা জানি না।'

'তোমার প্ল্যানটা বলো।'

'আমি এখন টেকনাফে যাব, কুতুবদিয়ার ওপর দিয়ে,' বলল রানা। 'এই দুই জায়গাতেই কবিরের গোপন ঘাঁটি আছে। টেকনাফের ঘাঁটিটা, ওদের ভাষায়, স্পর্শকাতর। আমার ধারণা, ওখান থেকেই অপারেশনটা অপারেট করা হবে।'

'ব্যাপারটা কি মিলছে?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলো ঘড়ির কাঁটা ধরে চট্টগ্রাম পোর্টে পৌঁছুবে। ওখান থেকে টেকনাফ একশো বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে, তাই না? অত দূর থেকে···সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয়···'

'জ্বী, স্যার, আপনি যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি,' বলল রানা। 'সম্ভবত ওদের কাছে একটা সাবমেরিন আছে।'

অপরপ্রান্তে তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন রাহাত খান। তারপর যখন কথা বললেন, নিন্দা ও তিরস্কারের তীব্রতা রানাকে কুঁকড়ে এতটুকু করে দিল। 'তোমাকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম—কিল হিম! তা যদি পারতে, এই সমস্যা দেখাই দিত না। রানা?'

'ইয়েস, স্যার?'

'আমার ওই নির্দেশ এখনও বহাল আছে। আর যেহেতু দেরি করে ফেলায় জটিলতা অনেক বেড়ে গেছে, এখন যা ঘটবে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

রানা উত্তর দিতে দেরি করছে।

রাহাত খান আবার বললেন, 'তোমাকে সব ধরনের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেয়া হলো। সময়ে কুলালে যে-কোন সাহায্য চাওয়ামাত্র পাবে তুমি। ব্যর্থ হওয়া চলবে না, আমার দুটো নির্দেশই তোমাকে পালন করতে হবে, যে-কোন মূল্যে।'

'স্যার, দুটো নির্দেশ?'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, অপারেশন নকআউট ব্যর্থ করে দাও।'

'স্যার, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি···'

'ভেরি গুড। শোনো, আমরা নিশ্চিত হয়েই বলছি, শুভেচ্ছা সফর বাতিল করা হবে না। তবে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী সতর্ক থাকবে। ওরা কথা দিয়েছে, প্রয়োজনে গোটা পোর্ট এলাকা, এবং দুশো মাইল পর্যন্ত খোলা সাগর সীল করে দেবে ওরা। কিন্তু আমি ভুলতে পারছি না যে খায়রুল কবির টেকনো-টেরোরিস্ট হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। তার প্ল্যানটা কি না জানা পর্যন্ত আমি মোটেও স্বস্তিবোধ করছি না। এবার বলো, তোমার কি ধরনের সাহায্য লাগবে।'

রানার মনে হলো, বস ওর ওপর এক ধরনের অবিচার করছেন। 'যদি

পারি, আমি একাই পারব, স্যার,' অভিমান চেপে রেখে বলল ও। 'আপনি শুধু রানা এজেন্সির চট্টগ্রাম শাখার তিনজন এজেন্টকে কুতুবদিয়ার মৈনাক টিলায় থাকতে বলে দিন—শাহিন, শৈবাল আর মন্টিকে। ওদেরকে কিছুই করতে হবে না, শুধু আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি সম্ভবত ওদের সঙ্গে মিলিত হতে পারব অপারেশন নক-আউট ব্যর্থ করার পর। আর বিসিআই এজেন্টদের একটা গ্রুপকে পাঠান সুইট হোমে।'

'আর কোন সাহায্য তোমার দরকার নেই?'

'না,' এক কথায় জবাব দিল রানা।

'ঠিক আছে। রানা?'

'ইয়েস, স্যার?'

'ডু ইওর বেস্ট, মাই বয়। আমি চাই না তুমি ব্যর্থ হও।' রানার অভিমান টের পেয়েছেন তিনি।

অসম্মান করা উদ্দেশ্য নয়, স্রেফ জেদের বশে উত্তরে কিছু বলল না রানা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

সুইট হোমে ফুয়েলের কোন অভাব নেই, সী প্লেনের ট্যাঙ্ক ভরতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না। ইশরাতকে নিয়ে পতেঙ্গায় চলে এল রানা, সৈকতে নেমে রিকশায় চড়ে চলে এল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। পথে ভদ্রগোছের প্রথম যে হোটেলটা চোখে পড়ল সেটাতেই উঠল ওরা। ম্যানেজারকে নিজের আইডি দেখিয়ে অনুরোধ করল, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে হোটেলের খাতায় ওদের আসল নাম যেন লেখা না হয়। স্থানীয় পুলিসকেও ফোনে ডাকতে বলল, ইশরাতকে পাহারা দেবে তারা। তারপর কাপড়চোপড়ের একটা তালিকা ও পাঁচশো টাকার কয়েকটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এগুলো কাউকে দিয়ে আনিয়ে দিন, প্লীজ।'

নিজেদের কামরায় ঢুকে ইশরাতকে শান্ত হয়ে বসতে বলল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কুতুবদিয়া আর টেকনাফ, ওদের দুটো ঘাঁটিতেই গেছেন আপনি, তাই না? জায়গার নাম সহ ম্যাপ এঁকে দিতে পারবেন?'

'এখানে আমাকে আপনি একা রেখে চলে যাবেন?' ইশরাত হতভম্ব।

'বাড়িয়ে বলছি, তা ভাববেন না—আমি আসলে মরতে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'পরিস্থিতিই আমাকে আত্মহত্যা করতে পাঠাচ্ছে। সঙ্গে যদি আপনাকে নিই, আর আপনি যদি মারা যান, নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব?'

'গত কয়েক দিন আমাকে আপনি দেখছেন, একেবারে আনাড়ি মেয়ে বলতে পারবেন না,' বলল ইশরাত। 'আমি কি আপনার কোন সাহায্যেই আসব না?'

'ইশরাত, প্লীজ, বুঝতে চেষ্টা করুন—মরার সময় প্রিয়জনকে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না।'

'কি বললেন?' বিছানার কিনারায় বসে ছিল ইশরাত, ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে

পড়ল। 'কথাটা আরেকবার বলবেন, প্লীজ?'

'প্রিয়জন বলায় আপনি কি মাইন্ড করলেন?' রানা বিব্রত।

কি যে হলো ইশরাতের, এগিয়ে এসে রানার সামনে থামল সে। এত কাছে, গলায় তার নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা। অবাক বিস্ময়ে দেখল, মেয়েটার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠেছে। আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। যেন সচেতনভাবে নয়, আবেগতাড়িত হয়ে কি করছে নিজেও জানে না, আরও একটু এগিয়ে এসে রানার বুকে মাথা ঠেকাল ইশরাত, আলিঙ্গন করল দু'হাতে। 'এ আমার পরম সৌভাগ্য, মাসুদ ভাই। তোমার দেশপ্রেম···ঠিক বুঝতে পারছি না কার সঙ্গে তোমার তুলনা করব···তীতুমীর? সিরাজদ্দৌলা? নাকি বঙ্গবন্ধু? মাফ করো ভাই, আমার ভুল হচ্ছে—তোমার সঙ্গে কারও তুলনা চলে না, তুলনা করলে ওঁদেরকেও ছোট করা হয়, তোমাকেও। তোমার তুলনা কেবল তুমিই···'

রানার ধারণা ছিল ওকে একটা চুমো খাবে ইশরাত, মনে মনে হয়তো খানিকটা লোভও হচ্ছিল, কিন্তু একটু পরই বুঝতে পারল ইশরাতকে সে চিনতে ভুল করেছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। 'তুমি না ফেরা পর্যন্ত একটাই কাজ আমার, তোমার জন্যে প্রার্থনা করা। এসো, বসো আমার পাশে—তোমাকে আমি ম্যাপ এঁকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

সী প্লেন নিয়ে রওনা হলো রানা রাত দশটায়। সময়টা রাত হলেও কবিরের লোকজন আকাশে নজর রাখতে পারে, এ-কথা ভেবে সন্দীপের দিকে রওনা হলো, দেখে যাতে মনে হয় টেকনাফের দিকে যাচ্ছে না। হোটেল ছাড়ার আগে কক্সবাজারে টেলিফোন করে রানা এজেন্সির এজেন্ট সমীরণ চাকমাকে নির্দেশ দিয়েছে কয়েকটা। আশা করা যায় এরইমধ্যে কক্সবাজার থেকে টেকনাফের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সে, গাড়িতে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট নিতেও ভোলেনি।

গভীর সাগরের ওপর এসে দিক বদল করল রানা, ইশরাতের কথা ভেবে মনটা খুঁত-খুঁত করছে। পাঁচ-সাতজন সশস্ত্র পুলিস তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে এখন। অবশ্য অন্য কোন উপায়ও ছিল না। বিসিআই এজেন্ট চট্টগ্রামে যারা আছে তারা ঢাকা হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ পেয়ে তালুকদারের সুইট হোমে চলে যাবে, জানা কথা। আর রানা এজেন্সির এজেন্টরা এমনিতেই সংখ্যায় কম, মাত্র তিনজন—শৈবাল, শাহিন আর মন্টি—ওরা যাবে কুতুবদিয়ার মৈনাক টিলায়। প্রশ্ন হলো, খায়রুল কবিরের খুনীরা ইশরাত কোন হোটেলে আছে জানতে পারলে কি করবে। তারা কি পুলিসের ওপর হামলা চালাবার দুঃসাহস রাখে?

টেকনাফে আসার পথে আবহাওয়া প্রায় শান্তই পেল রানা। তবে সী প্লেনের উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে যাওয়ায় বাতাস ঢুকছে প্রবলবেগে। একটা কাগজের দুই পিঠে দুটো ম্যাপ এঁকে দিয়েছে ইশরাত, কাগজটাকে হাঁটুর ওপর রেখে এক হাতে চেপে ধরেছে ও। কুতুবদিয়ার ওপর দিয়ে আসার পথে সাগর থেকে

ডাঙার দিকে চলে এল রানা, খায়রুল কবিরের ঘাঁটিটা আকাশ থেকে একবার দেখে নেয়ার ইচ্ছে।

ডাঙা থেকে তিন মাইলের মধ্যে ছোট আকারের পাঁচটা পাহাড় আছে, পাহাড় না বলে মাটির টিলা বলাই ভাল, এই পাঁচ টিলার মাঝখানেরটা সবচেয়ে কম উঁচু, সেখানে আছে বিশাল এক পরিত্যক্ত বৌদ্ধ মন্দির। টিলাটা লীজ নিয়েছিল খায়রুল কবিরের বাবা কবির চৌধুরী। সেটা পাকিস্তান আমলের ঘটনা। শুধু লীজই নেয়া হয়েছিল, টিলা বা মন্দিরের কোন সংস্কার করা হয়নি, কিংবা মন্দিরটা ভেঙে ফেলে নতুন কিছু নির্মাণও করা হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার বেশ কয়েক বছর পর একটা বিদেশী কোম্পানীকে দায়িত্ব দেয়া হয় মন্দিরের মূল কাঠামো ঠিক রেখে ওই জায়গায় আধুনিক এক বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণের। নির্মাণ কোম্পানীর অভিজ্ঞতার অভাব হয়তো দায়ী, কিংবা দায়ী খায়রুল কবিরের উদ্ভট খেয়াল, বিনোদন কেন্দ্রটি তৈরি হবার পর দেখা গেল সেটা মন্দিরও নেই, আধুনিকও হয়নি, বরং দেখতে হয়েছে প্রাচীন একটা দুর্গের মত, অস্বাভাবিক উঁচু। তবে শোনা যায়, ওখানে নাকি আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত আয়োজন ও উপকরণ রাখা হয়েছে।

বাকি চারটে টিলা যথেষ্ট উঁচু, ওগুলোর যে-কোন একটার মাথায় উঠলে দুর্গটা পরিষ্কারই দেখা যায়। তবে পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ওই টিলায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে টিলাটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভেতরে হেলিপ্যাড আছে, আছে সুইমিং পুল। বৈদ্যুতিক লাইনও আছে, লোডশেডিঙের সময় জেনারেটর দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়া হয়।

প্লেনের আওয়াজ পেলে কবির চৌধুরী সতর্ক হয়ে যাবে, তাই দূর থেকে টিলাটাকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল রানা। চিনতে সমস্যা হলো না, ফ্লাডলাইটের আলোয় গোটা মন্দির বা দুর্গ আলোকিত হয়ে আছে। তবে কামান বা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটগান থাকার গুজব মিথ্যে বলেই মনে হলো, অন্তত চোখে বিনকিউলার তুলেও তেমন কিছু দেখতে পেল না রানা।

কবিরের কুতুবদিয়া ঘাঁটিটাকে দূর থেকে দু'বার চক্কর দিয়ে টেকনাফের উদ্দেশে আবার রওনা হয়ে গেল সী প্লেন। ইশরাতের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে টিলাটাকে ঘিরে আরও মিনিট পাঁচেক চক্কর দিল না রানা। তা দিলে কালো রঙের হেলিকপ্টারটাকে পরিষ্কার দেখতে পেত ও।

পতেঙ্গার হোটেলটায় তিন দিক থেকে আক্রমণ চালানো হয়েছে, রানা হোটেল ত্যাগ করার ঠিক সাত মিনিট পর। ছ'জন সশস্ত্র পুলিস তিন দলে ভাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছিল হোটেলটা। দু'জন ছিল হোটেলের গেটে, দু'জন পিছন দিকে, বাকি দু'জন ইশরাতের কামরার দরজায়। ঘড়ির কাঁটা ধরে একই সময়ে দুটো মাইক্রোবাস এসে থামল হোটেলটার সামনে ও পিছনে। প্রতিটি মাইক্রোবাসে আটজন আততায়ী, প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল, হোলস্টারে অটোমেটিক পিস্তল, পাউচে চারটে করে গ্রেনেড। গাড়ি থেকে প্রথমে তারা কেউ নামল না, জানালার কাচ নামিয়ে সরাসরি গুলি করে মেরে

ফেলল চারজন পুলিশকে। সামনে ও পিছন থেকে হোটেলের ভেতর ঢুকল বারোজন। কর্মচারীরা কেউ বাধা দিল না, যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে হোটেলের ছাদে এসে নেমেছে কালো একটা হেলিকপ্টার।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বাকি দু'জন পুলিস ইশরাতকে বাঁচানোর জন্যে সিঁড়ির দিকে মুখ করে করিডরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল, কাউকে দেখতে পেলেই গুলি করবে। কবিরের লোকেরা করিডরে বেরোয়নি, সিঁড়ির কোণ থেকে গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল কয়েকটা। দুই পুলিসের ছিন্নভিন্ন লাশ টপকে ইশরাতের কামরার সামনে চলে এল তারা। তারপর অপেক্ষায় থাকল।

চারতলা থেকে নেমে এল খায়রুল কবির। দরজায় নক করল সে, নরম সুরে ডাকল, 'ইশরাত? আমি তোমার স্বামী। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করা হবে, ডার্লিং। নির্ভয়ে বেরিয়ে এসো, প্লীজ!'

কবিরের কথা বিশ্বাস করল না ইশরাত। তবে নিয়তির লিখন মেনে নিতেও দ্বিধা করল না। দরজা খুলে দিল সে।

এক গাল হেসে কবির বলল, 'এই তো, লক্ষ্মী বউ আমার! চলো যাই, পুনর্মিলন সেলিব্রেট করব আমরা।'

ইশরাত দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকল, এক চুল নড়ল না। 'তোমার নাটুকেপনা আমার অসহ্য লাগে, কবির। তোমার সঙ্গে কোথাও আমি যাব না। আমি জানি আমাকে খুন করাই তোমার উদ্দেশ্য। তোমাকে বাধা দেব সে শক্তি আমার নেই। শুধু একটা অনুরোধ, আমাকে অপমান করো না। আমি দরজা খুলে দিয়েছি, ওখানে দাঁড়িয়েই তুমি আমাকে গুলি করো।'

'কি আশ্চর্য!' কবিরের বিস্ময় নির্ভেজাল। 'শুধু মেরে ফেলাই যদি উদ্দেশ হত, তোমরা যখন জেটি থেকে পতেঙ্গায় নামছ তখনই তো মারতে পারতাম। আমি তোমার স্বামী, অথচ এখনও আমাকে তুমি চিনতে পারোনি? জেটির আশপাশেই ছিল আমার লোকজন, নজর রাখছিল সী প্লেন আর সুইট হোমের ওপর। আমার ধারণা ছিল তোমাকে নিয়ে সী প্লেনে আবার ফিরে আসবে রানা। ভুলেও ভাবিনি, তোমরা সুইট হোমে আছ। যা-ই হোক, পিছু নিয়ে তোমরা কোন হোটেলে উঠলে দেখে নিল আমার লোকেরা। তারপর আমাকে খবর দিল।'

'তুমি তাহলে এখন কি চাও?'

'তথ্য, ডার্লিং। তোমাকে ইন্টারোগেট করা হবে।'

'কিন্তু আমি তো বললামই, তোমার সঙ্গে কোথাও আমি যাব না।'

'যেতে চাইবে না, জানি বলেই তো ফিরোজাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি,' হাসল কবির। 'হাজার হোক তুমিই আমার স্ত্রী, তোমার গায়ে পরপুরুষের হাত তো আর লাগতে দিতে পারি না—চোখের আড়ালে রানার সঙ্গে যা-ই তুমি করে থাকো।'

ফিরোজা একাই একশো, জানে ইশরাত। কাজেই বুঝতে পারল বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। ফিরোজা এগিয়ে এসে তার হাত ধরতে ঝাপটা দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নিল, বলল, 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি নিজেই যাচ্ছি, চলো

কোথায় নিয়ে যাবে।'

কুতুবদিয়ার ঘাঁটিতে আনা হলো ইশরাতকে। ছোট একটা ঘরে ঢুকিয়ে বসানো হলো মেঝেতে পায়া গাঁথা একটা টুলে। হাত ও পা বাঁধা হলো নাইলন কর্ড দিয়ে। টুলটায় হাতল আছে, কিন্তু হেলান দেয়ার জন্যে পিছনে কিছু নেই। ঘরে ফিরোজা ছাড়া আর কেউ থাকল না। তার হাতে লেদারের ওপর লোহার কাঁটা বসানো খাটো একটা চাবুক। কোন জেরা বা প্রশ্ন নয়, প্রথমে সেই চাবুক দিয়ে সপাং সপাং করে ইশরাতের উরুতে আঘাত করা হলো। প্রথমে ছিঁড়ে গেল পরনের ট্রাউজার। উরুর মাংস লাল হয়ে ফুলে উঠল, ফোলা অংশে তৈরি হলো গভীর গর্ত। মিনিট তিনেকের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল হাঁটুর ওপর থেকে কুঁচকি পর্যন্ত।

অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করছে ইশরাত। ফিরোজা বিশ্রাম নিচ্ছে। তিন মিনিট পার হয়ে গেল। আবার আঘাত করার জন্যে তৈরি হলো ফিরোজা। বলল, 'এবার তোমার পিঠে মারব।'

'কিন্তু কেন আমাকে মারা হচ্ছে?' কাতর কণ্ঠে জানতে চাইল ইশরাত। 'কি জানতে চাও তোমরা?'

'মাসুদ রানা কোথায়? এই একটাই প্রশ্ন আমাদের।'

'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ? কবির নিজেই তো বলল, চারদিক তার লোকজন ছড়িয়ে আছে। তারা দেখেনি কোথায় গেছে সে?'

'তুমি কোন প্রশ্ন করবে না। শুধু উত্তর দেবে। মাসুদ রানা কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'তাহলে শোনো। আমার ওপর কি নির্দেশ আছে, তুমি সঠিক উত্তর না দিলে যেভাবে খুশি টরচার করতে পারব আমি। পিঠের চামড়া আর মাংস তোলার পর আমি তোমার পায়ের পাতা পেট্রল দিয়ে ভেজাব। ট্রাউজারের পায়া গুটিয়ে তুলে দেব হাঁটুর কাছে, ওটায় যাতে আগুন না লাগে। কারণ তাহলে সারা শরীরে আগুন লেগে যেতে পারে, আর তাতে তুমি মারা যেতে পারো। মারা গিয়ে আমাদেরকে ফাঁকি দেবে, সেটি হবে না। বুঝতে পারছ কি বলছি?'

ইশরাত কেঁদে ফেলল। মনে মনে আল্লাহর কাছে শক্তি কামনা করছে সে, আল্লাহ, আমাকে তুমি সহ্যশক্তি দাও!

পরবর্তী তিন মিনিট আক্ষরিক অর্থেই ইশরাতের পিঠের চামড়া আর মাংস তুলে নিল ফিরোজা। শেষ দিকে কিছুই অনুভব করল না ইশরাত, কারণ ইতিমধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

জ্ঞান যখন ফিরল, সম্ভবত পাঁচ মিনিট পর, চোখ মেলেই দেখল তার পায়ের পাতার ওপর পেট্রল ঢালছে ফিরোজা। আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল সে। তারপর ধস্তাধস্তি শুরু করল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হচ্ছে না। লোহার টুলটা মেঝের সঙ্গে গাঁথা, এক চুল নড়ানো যাচ্ছে না। হাতল আর পায়ার সঙ্গে বাঁধা হাত বা পা-ও নড়ানো সম্ভব নয়।

ফিরোজা আরেকবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় সে?'

'সন্দ্বীপে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ইশরাত। 'ওখানে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ছোট একটা স্টেশন আছে, সেখানে তোমাদের অপারেশন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গেছে।'

মাথা নাড়ল ফিরোজা। 'তুমি সত্যি কথা বলছ না। কাজেই অন্তত একটা পা না পুড়িয়ে আমার উপায় নেই। তার আগে বলে রাখি, তুমি যেহেতু সুপারমডেল, সত্যি কথা না বললে তোমার সবচেয়ে বড় পুঁজি সুন্দর মুখটা আমি অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেব।'

'আমাকে মেরে ফেলো,' করুণ সুরে মিনতি জানাল ইশরাত।

জবাবে ফস করে দেশলাই জ্বালল ফিরোজা।

আতঙ্কে এমন বিকট চিৎকার দিল ইশরাত, অতি পাষাণেরও বুক ছ্যাঁৎ করে উঠবে। কিন্তু ফিরোজার মনে এতটুকু দয়া হলো না। জ্বলন্ত কাঠিটা ইশরাতের ডান পায়ের ওপর ছুঁড়ে দিল সে।

'এখুনি নিভিয়ে দেব আগুনটা,' বলল সে। 'যদি সত্যি কথা বলো। কোথায় গেছে সে?'

'আমি জানি না!' বিস্ফারিত চোখে জ্বলন্ত পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকল ইশরাত, তারপর দ্বিতীয়বারের মত জ্ঞান হারাল।

দশ

টেকনাফ থেকে মাইল দশেক দূরে সাগরে নামল সী প্লেন। এঞ্জিন বন্ধ করে নোঙর ফেলল, তারপর এক মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকল রানা, ঢেউয়ের তালে তালে দোল খাচ্ছে সী প্লেন। দরজা খুলে রাবারের তৈরি ভেলাটা পানিতে নামাল, হাতে একটা টর্চ নিয়ে নেমে পড়ল তাতে। ভেলার তলা হাতড়ে বৈঠাটা খুঁজে নিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার, তীর এখান থেকে খুব কাছে হলেও স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, সিকি মাইলটাক দূরে জোনাক পোকার মত একটা আলো জ্বলল—পর পর দু'বার জ্বলেই নিভে গেল সেটা। সমীরণ চাকমা ওর আগেই পৌঁছে গেছে। পরস্পরের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে পূর্ব-নির্ধারিত সঙ্কেত বিনিময় করল ওরা। রানা টর্চ জ্বালল একবার, সমীরণ জ্বালল আরও তিনবার।

দ্রুত বৈঠা চালিয়ে নির্জন সৈকতে পৌঁছুল রানা, হাতে এখন টর্চের বদলে পিস্তল। 'সমীরণ?' অন্ধকারে স্থির হয়ে রয়েছে গাঢ় একটা কাঠামো, সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

অগভীর পানিতে নেমে ভেলাটা ডাঙায় তুলতে রানাকে সাহায্য করল সমীরণ। 'খানিকটা হাঁটতে হবে, মাসুদ ভাই। রাস্তা এখান থেকে ছয় সাতশো গজ দূরে।'

'গাড়িটা?'

'রাস্তার পাশে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসেছি।'

'জিনিসগুলো আনতে পেরেছ?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।' হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে ওরা। 'সঙ্গে আমি থাকব, নাকি আপনি একা যাবেন?'

'তোমাকে সী প্লেন নিয়ে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে, সমীরণ,' স্যাটেলাইট ফোনটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'আমি যদি সকালের মধ্যে না ফিরি, রানা এজেন্সির ঢাকা হেডকোয়ার্টারের মাধ্যমে বিসিআই হেডকোয়ার্টারকে রিপোর্ট করবে, তারপর সী প্লেন নিয়ে কুতুবদিয়ায় চলে যাবে। ওখানে রানা এজেন্সির এজেন্টরা আছে। কি করতে হবে বলে দিচ্ছি।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে গাড়িটার কাছে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগল। নীল একটা টয়োটা স্টারলেট। সমীরণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে এল রানা। টেকনাফকে ঠিক শহর বলার উপায় নেই, রাস্তার দু'পাশে কয়েকটা দোকান, কিছু টং আর ঝুপড়ি, দু'চারটে পাকা বাড়ি-ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। এত রাতে সব বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় লোকজন না থাকারই কথা, তবু মেটো একটা পথ ধরে শহরটাকে পাশ কাটাল রানা। আবার যখন মেইন রোডে উঠল, নতুন তৈরি একটা হোটেলকে ডানে রেখে মাইল্ল চারেক এগোবার পর আবার বাঁক নিতে হলো। এটাও মেটো পথ, খানা-খন্দে ভরা, ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে টয়োটা। ইশরাত যেভাবে ম্যাপ এঁকে দিয়েছে, এখন পর্যন্ত সেটা অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

পথটা ঘন ঘন বাঁক নিতে শুরু করল। ঢাল বেয়ে ওপর দিকে উঠছে গাড়ি। পাঁচসাতটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘোরার পর সামনে পড়ল জঙ্গল। ইশরাত বলে দিয়েছে এই জঙ্গল পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে, তারপর হাঁটতে হবে।

জঙ্গলটা ট্যুরিস্টরা খুব পছন্দ করে, শীতকালে পিকনিকের জন্যে আদর্শ। তবে রাতে কেউ থাকে না, থাকার কোন ব্যবস্থাও নেই।

গাড়ি থেকে নামার আগে ওয়েট স্যুট পরল রানা, জায়গামত বেল্ট জড়িয়ে স্ট্র্যাপ আটকাল। তারপর পাউচ আর ক্লিপ-এর ইকুইপমেন্টগুলো চেক করল একে একে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু একটা পথ চলে গেছে। টর্চের মুখে হাতচাপা দিয়ে দু'একবার জ্বালল, দেখে নিল ঠিক কোথায় পা ফেলছে। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরই জঙ্গলের শেষ প্রান্তে চলে এল ও।

জায়গাটা বেশ উঁচু। ও আসলে একটা ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর নিচে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে চৌকো একটা ভবন, ভবনটার চারদিকে বাগান, একপাশে একটা সুইমিং পুল। বাড়িটা নীল রঙ করা, দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আউটার পেরিমিটারে টেনিস কোর্ট আর কার পার্কিং এরিয়া।

চোখে বিনকিউলার তুলল রানা। বাড়ির সরাসরি সামনের বাগানে বসার

আয়োজন। দেয়াল নেই, পিলারের ওপর খাড়া করা হয়েছে কংক্রিটের ছাতা। মেঝেতে চেয়ার-টেবিল ফেলা। দশ-বারোজন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা, তাদের মধ্যে খায়রুল কবির নেই। মাত্র একজনকে চিনতে পারা গেল, তার প্রকাণ্ড আকৃতির কারণে। পিয়ার আলি চিশতি।

সুইমিং পুলটা বাড়ির ডান দিকে, ওদিকটা আলোকিত। আরও ডান দিকে জঙ্গল, তবে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। সুইমিং পুল আলোকিত হয়ে আছে ফ্লাডলাইটের আলোয়, তার আভায় জঙ্গলের কিনারায় একটা সাইনবোর্ডের কিনারা দেখা যাচ্ছে, তবে লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে না। ইশরাত ওই সাইনবোর্ডটা দূর থেকে দেখেছে, সে-ও লেখাটা পড়তে পারেনি। তবে সে তার ধারণার কথা জানিয়েছে রানাকে। জঙ্গলের ভেতর কাঁটাতারের বেড়া আছে, সাইনবোর্ডে লেখা আছে বেড়ার ভেতর প্রবেশ করা বিপজ্জনক। কিংবা হয়তো লেখা আছে, এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ভেতরে প্রবেশ করা আইনত দণ্ডনীয়।

ঢালের কিনারায় বসে পড়ল রানা, চোখ থেকে বিনকিউলার নামাচ্ছে না। এখনও ওর মাথায় ঢুকছে না খায়রুল কবির এই ঘাঁটি থেকে কিভাবে অপারেশন পরিচালনা করবে। আশপাশে কোন এয়ারস্ট্রিপ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি কুতুবদিয়া ঘাঁটির মত এখানে হেলিপ্যাডও নেই। ধীরে ধীরে একটা দ্বিধা আর সন্দেহ জাগছে মনে। ও কি ভুল জায়গায় সময় নষ্ট করছে? কোন কারণে তালুকদারকে ভুল তথ্য দিয়েছে খায়রুল কবির? অপারেশনটা অন্য কোথাও থেকে অপারেটর করা হবে না তো?

রাত সাড়ে বারোটা। কংক্রিটের ছাতার নিচ থেকে লোকগুলো নড়ছে না। উর্দি পরা কয়েকজন বেয়ারাকে দেখা গেল ছাতার নিচে অতিথিদেরকে খাবারদাবার ও পানীয় পরিবেশন করছে। ব্যাপারটা কি? বাড়ির বাইরে বাগানে বসে আছে কেন লোকগুলো? কারও জন্যে অপেক্ষায় আছে?

অস্থির হয়ে উঠছে রানা। কি করা উচিত স্থির করতে পারছে না। নিজেকে বোকা বোকাও লাগছে। সঙ্গে প্রচুর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নিয়ে এসেছে, কিন্তু জানে না সেগুলো কোথায় ব্যবহার করবে!

তারপর হঠাৎ চেয়ার ছাড়ল দৈত্যটা। দেখাদেখি বাকি সবাইও। চিশতির পিছু নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটছে সবাই। প্রত্যেককে খুব উল্লসিত মনে হলো। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। বেশভূষা আর হাবভাব দেখে রানার সন্দেহ হলো, প্রথম সারির না হলেও লোকগুলো হয় ব্যবসায়ী নয়তো রাজনৈতিক নেতা। ওদের মধ্যে অন্তত তিনজন বিদেশী লোকও আছে।

বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই। বাড়ির সামনের বাগানে পাঁচশো বা হাজার পাওয়ারের দুটো বালব জ্বলছিল, নিভে গেল সেগুলো। এখন শুধু সুইমিং পুলের দিকে ফ্লাডলাইটটা জ্বলছে।

দু'মিনিটও পার হয়নি, বাড়ির ভেতর থেকে সুইমিং পুলের দিকে বেরিয়ে এল চিশতি একা। পুলটাকে ঘিরে অলস পায়ে হাঁটছে সে, শুনতে না পেলেও তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে থপ থপ ভারী আওয়াজটা কল্পনা করে নিচ্ছে রানা।

পুলটাকে পিছনে ফেলে জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে সে। একটু পরই গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কি আছে ওদিকে? কোথায় গেল চিশতি?

নিজেকে শান্ত করল রানা, এই মুহূর্তে অপেক্ষার কোন বিকল্প নেই। কি ঘটছে না জেনে বোকার মত কিছু করতে গেলে স্রেফ ধরা পড়ে যেতে হবে।

মিনিট বিশেক পর অপেক্ষার অবসান ঘটলেও উত্তেজনার মাত্রা এক লাফে বহুগুণ বেড়ে গেল। জঙ্গল থেকে পনেরো কি ষোলো জনের একটা মিছিল নিয়ে বেরিয়ে এল চিশতি। এই লোকগুলোকেও চেনে না রানা, আগে কখনও দেখেনি। সাধারণ শার্ট-ট্রাউজার পরে আছে, দু'একজনের গলায় মাফলার, কয়েকজন কোট পরে আছে। সবাই স্বাস্থ্যবান, শক্ত-সমর্থ, হাঁটাচলার মধ্যে ঋজু একটা ভঙ্গিও স্পষ্ট। নাবিক নাকি?

সুইমিং পুলটাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল সবাই। খানিক পর ফ্লাডলাইট নিভে গেল। আলো জ্বলছে শুধু বাড়ির ভেতরে, তবে দেখার কিছু নেই। দরজাগুলো বন্ধ, জানালায় পর্দা। তারপর এক এক করে বাড়ির ভেতরের আলোও নিভে গেল, তবে সবগুলো নয়।

যখন আলো ছিল, চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোথাও কোন গার্ড দেখতে পায়নি রানা। সুইমিংপুলটাকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলটার ভেতর ঢুকতে হলে প্রথমে পাঁচিল টপকে বাড়ির আঙ্গিনায় নামতে হবে। পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া নেই। শুধু জঙ্গলের ভেতর আছে। শুধুই কি কাঁটাতারের বেড়া, নাকি গার্ডও আছে?

জঙ্গলের ভেতর বা শেষ মাথায় কি আছে? লোকগুলোকে কোত্থেকে ডেকে নিয়ে এল চিশতি? প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া তোমার নেশা ও পেশা, কাজেই নেমে পড়ো কাজে, নিজেকে আদেশ করল রানা। প্রশ্ন হলো, পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতর ঢুকবে, নাকি তার আগে চেষ্টা করে দেখবে জঙ্গলটায় ঢোকার অন্য কোন পথ আছে কিনা। তারপর ভাবল, অন্য কোন পথ যদি থাকেও, কাঁটাতারের বেড়া ইলেকট্রিফায়েড হতে পারে। বেড়ায় অ্যালার্ম সিস্টেমও ফিট করা থাকতে পারে। না, ঝুঁকি বেশি হলেও বাড়ির ভেতর ঢোকাই ভাল, তাতে অন্তত সময় বাঁচবে।

আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর ঢাল বেয়ে নেমে এল রানা, পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটছে। দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল, ওপরে ওঠা একটা সমস্যা। সমাধান এনে দিল একটা বুনো ডুমুর গাছ। গাছে উঠে পাঁচিলের দিকে প্রসারিত একটা ডাল থেকে লাফ দিতে হলো। পাঁচিলের মাথায় পা দিয়ে পড়ল রানা, তবে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না, বাড়ির ভেতর ঝোপের গায়ে পড়ে গেল। মটমট করে ভেঙে গেল কয়েকটা ডাল। অকস্মাৎ আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল রানা, শব্দটা অনেক দূর থেকে শুনতে পাবার কথা। হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, কিছু নড়তে দেখলেই গুলি করবে—সে কুকুর হোক বা মানুষ।

কিন্তু কিছুই নড়ছে না। কোথাও কোন শব্দ নেই। পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়াল

রানা। অন্ধকার ওকে সাহায্য করছে। বাড়ির মাত্র দুটো জানালা আলোকিত, বাকি সব ঘরের আলো নিভে গেছে। সুইমিংপুলটাকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গল ঢাকা ঢালের গোড়ায় চলে এল ও। কোন গার্ড নেই, কেউ বাধা দিচ্ছে না। অবাক লাগছে ওর। সন্দেহও জাগছে মনে, বোকার মত ওদের ফাঁদে পড়ে যায়নি তো? ওরা হয়তো জানে ও আসবে, সে-কথা মনে রেখেই মঞ্চ সাজিয়ে রেখেছে, সময় মত পর্দা তুলবে?

ঢাল বেয়ে সাবধানে উঠছে রানা। সাইনবোর্ডের সামনে থামল একবার। মুখে হাতচাপা দিয়ে টর্চটা একবার জ্বালল, লেখাটা পড়ার লোভ সামলাতে পারছে না। মাথার খুলি আর তার নিচে দুটো হাড় দিয়ে ক্রশ চিহ্ন আঁকা হয়েছে, নিচে লেখা— 'বিপজ্জনক এলাকা। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য মালিকপক্ষ দায়ী নন।'

ঢাল বেয়ে চূড়ায় অর্থাৎ সমতল জমিনে উঠে এল রানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ঝিঁঝি পোকারা সমস্যা সৃষ্টি করছে। অন্য কোন শব্দ যদি হয়ও, ওগুলোর ডাকাডাকিতে চাপা পড়ে যাবে সব। তবে ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে, অস্পষ্ট। এক পা এক পা করে এগোল রানা। নিজেকে আরেকবার বোকা মনে হলো জঙ্গলের শেষ মাথায় বেরিয়ে আসার পর। সামনে একটা পাকা রাস্তা, কিংবা পাকা চত্বর, অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। যা থাকে কপালে, একটা গাছের আড়ালে বসে টর্চটা জ্বালল।

রাস্তাই। প্রাইভেট রোড। দু'দিকেই খানিক দূর যাবার পর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আশপাশে আর কিছুই দেখার নেই। এ কোথায় এল ও? এখানে তো কিছুই ঘটছে না! পানির আওয়াজ আগের চেয়ে স্পষ্ট। সাগর খুব কাছেই।

সাবধানের মার নেই, জঙ্গলের কিনারা থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা ক্রল করে। কিছুই ঘটছে না। কোন বিপদ ছাড়াই পার হয়ে এল রাস্তাটা। রাস্তার কিনারা থেকে একটা ঢাল নেমে গেছে। টর্চ না জ্বেলেই সিঁড়ির অস্তিত্ব টের পেল রানা। ধাপগুলো নিচের দিকে নেমে গেছে। সাগরের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে রানা, অন্য কোন শব্দ নেই। শেষ ধাপে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আকাশে তারা আছে, তবে চাঁদ থাকলে আরও সুবিধে হত। সিঁড়ির ধাপ শেষ হয়েছে কংক্রিটের একটা প্ল্যাটফর্মে। সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্ল্যাটফর্মের গায়ে, ছলকানো পানি ভিজিয়ে দিল রানাকে। তীরের দিকে পিঠ, প্ল্যাটফর্মের কিনারা ধরে এক পাশে সরে যাচ্ছে ও, ধীরে ধীরে একটা বাঁক নিয়েছে তীর, বাঁক থেকে শুরু হয়েছে পাথরের স্তূপ। রানা আন্দাজ করল, এখানে এক সময় সৈকত ছিল, পাথর ফেলে সেটা ঢেকে ফেলা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটা দীর্ঘ, চওড়া খুব বেশি নয়, তবে অনেক লম্বা। সাগর ঘেষা বাড়িটারই একটা অংশ এটা, ইয়ট ভেড়াবার জন্যে কেউ যদি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে থাকে তাহলে কারই বা কি বলার থাকতে পারে। আরও খানিক দূর যাবার পর বাধা পেল রানা। লোহার একটা ফ্রেম প্ল্যাটফর্মটাকে দ'ভাগ করে

রেখেছে, ফ্রেমে আটকানো তারের জাল। আসলে একটা গেট। হাতের চাপে খুলে গেল সেটা। সামান্য শব্দ হলো, সাগরের গর্জনে সেটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল না। গেট পেরিয়ে আসতেই একটা গুহার মুখ দেখতে পেল রানা।

এটা একটা কৃত্রিম গুহা। সৈকত আর টানেলের মুখে পাথর ফেলে তৈরি করা হয়েছে।

এত দূর চলে এসেছে, কোন বাধা পায়নি; কিন্তু এখন রানা প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে যে গুহার ভেতর কেউ না কেউ আছে। টর্চ জ্বালতে সাহস হলো না, আবার এত দূর এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও ইচ্ছে করছে না। যা থাকে কপালে, অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল রানা।

গুহাটা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। তিনবার থামতে হলো রানাকে, বাঁকের কোণে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নিল সামনে কি আছে। টর্চ জ্বালছে, তবে খুব সাবধানে। তৃতীয়বার ক্ষীণ আলো চোখে পড়ল। সাবধানে এগোল, ডান পাশে একটা শাখা গুহার মুখ। দম আটকে রেখে ভেতরে উঁকি দিল। পরক্ষণে ঝট করে টেনে নিল মাথাটা। এরকম একটা জায়গায় এই দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। সন্দেহ হলো ভুল দেখেছে। অথচ দৃশ্যটা এতই কদর্য, আরেকবার উঁকি দিতে রুচিতে বাধল। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হলে কথা ছিল, কিন্তু দু'জনেই ওরা যুবক।

গা ঘিন ঘিন করছে, দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল রানা। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল এই জন্যে যে দু'জনেই ওরা ওর দিকে পিছন ফিরে আছে। শাখা গুহাকে পাশ কাটিয়ে শেষ বাঁকটা ঘুরল ও। এদিকে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে মানুষ না থাকলেও যান্ত্রিক একটা কালো ডলফিন আছে। রাহাত খানকে স্মরণ করল রানা, বসের সন্দেহ অমূলক ছিল না। খায়রুল কবির যেখান থেকেই হোক একটা সাবমেরিন যোগাড় করেছে। কোন সন্দেহ নেই এই সাবমেরিন থেকেই রিমোট কন্ট্রোলড্ টর্পেডো ছুঁড়ে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেয়া হবে।

কাছ থেকে দেখে সাবমেরিনটার পরিচয় জানা গেল। এটা একটা ভিক্টর ক্লাস রাশিয়ান সাব। গ্যাঙওয়েটা ছোট, সেটা বেয়ে কনিংটাওয়ারে উঠে পড়ল রানা। হ্যাচ খোলা দেখে সন্দেহ হলো ভেতরে কেউ আছে। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করা চলে না। টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল বোটের ভেতর। মানুষের গলা পাচ্ছে না। সরু একটা টিউব দেখা যাচ্ছে শুধু, সোজা চলে গেছে কন্ট্রোল রুমে। নিচ থেকে তেল আর ঘামের গন্ধ উঠে আসছে। সাব-এর ক্রুরা খানিক আগে পর্যন্ত কাজ করেছে এখানে। সম্ভবত ভোরবেলা রওনা হবে সাব, তার আগেই ফিরে আসবে ক্রুরা। এই মুহূর্তে বাড়িতে বসে তারা হয়তো খাওয়া দাওয়া করছে, তারপর দু'এক ঘণ্টা ঘুমাবে।

প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ জায়গা মত বসানোর আগে সাবমেরিনের লেআউট ভাল করে দেখে নেয়া দরকার। কন্ট্রোল রুমে কিছুক্ষণ থাকল রানা। পেরিস্কোপে চোখ রাখল। স্টিয়ারিং, ডাইভ কন্ট্রোল আর ডায়ালগুলো চেক করল। একটা মনিটরে স্ক্রীন দেখল, নীলচে রঙের, স্ক্রীনের দুই প্রান্তে দূরত্বের

সূচক লেখা। মাথার কাছে চারটে লিভার। এটা কি কাজে লাগে কে জানে। সমস্ত কন্ট্রোল আর ইন্সট্রুমেন্টে লেবেল সাঁটা হয়েছে—প্রথমে রুশ ভাষায় লেখা ছিল, সেগুলোর জায়গায় বসানো হয়েছে ইংরেজি। শুধু নীল মনিটর স্ক্রীনে কিছু লেখা নেই।

সরু ক্যাটওয়াক আর করিডর ধরে সাবমেরিনের পিছন দিকে চলে এল রানা। ধীরে ধীরে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, টেকনো-টেরোরিস্ট খায়রুল কবিরের নির্দেশে রুশ সাবমেরিনটায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষ করে এস্কেপ ইকুইপমেন্টগুলো অত্যাধুনিক। এস্কেপ ট্রাঙ্ক-এর হ্যাচ এমন কৌশলে বসানো হয়েছে, নিচের কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে দেখা যায় না। বাক্স আকৃতির হ্যাচে নিজেকে তুলে আনল ও, একটা কন্টেইনারে সাজানো দেখল জার্মানীর তৈরি স্টেইনকি হুড-এর সর্বশেষ সংস্করণ, কন্টেইনারগুলো হ্যাচের তিন দিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাথার ওপর এস্কেপ ট্রাঙ্ক সিলিন্ডার, গায়ে হুইল, ওটা ঘুরিয়েই ট্রাঙ্ক খুলতে ও বন্ধ করতে হয়।

সাবধানে কম্প্যানিয়নওয়েতে নামল রানা। সাবমেরিনের পিছনটা দেখা শেষ করে আবার ফিরে এল কন্ট্রোল রুমে। কন্ট্রোল রুম থেকে চলে এল বোতে। এখানে একটা পর্দা আছে, ভেতরে ক্রু আর অফিসার্স মেস ডেক, আরও সামনে চারটে টর্পেডো টিউব। এদিকেও একটা এস্কেপ ট্রাঙ্ক আছে, আগেরটার মতই। টর্পেডো টিউবের গায়ে লেখা রয়েছে—'টিউব ফুল লোডেড'। পিছনে, পোর্ট ও স্টারবোর্ড সাইডে, সারি সারি কয়েকটা র‍্যাক, তবে ওগুলোয় কোন টর্পেডো নেই।

রানা সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে সাবমেরিনের পিছন দিকে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ফিট করবে। সেদিকে যাচ্ছে, এই সময় একসঙ্গে বহু লোকের গুঞ্জন শুনতে পেল। এক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল রানা, মাথাটা কাজ করছে না। কনিং টাওয়ার গলে সাবমেরিনে নেমে আসছে ক্রুরা। পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, উর্দুতে বলল, 'কাজে যখন হাত দিয়েছি, কামিয়াব আমরা হবই।' পিয়ার আলি চিশতি, সেই দৈত্যটার গলা।

রানা দিশেহারা। খায়রুল কবিরের সাবমেরিনে আটকা পড়ে গেছে ও। পালাবার কোন পথ নেই। ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। বাঁচার একমাত্র উপায় লুকিয়ে পড়া। কিন্তু কোথায়?

লোকজনের গলা আরও কাছে সরে আসছে। কোণঠাসা ইঁদুরের মত একবার এদিক, একবার ওদিকে ছুটছে রানা। তারপর হঠাৎ এস্কেপ ট্রাঙ্কটা দেখতে পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। দ্রুত পিছিয়ে এসে সরাসরি এস্কেপ ট্রাঙ্কের নিচে দাঁড়াল, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল হ্যাচে।

পি.এ. সিস্টেমের মাধ্যমে ক্যাপটেনের নির্দেশ ভেসে এল, 'সবাই প্রস্তুত হও! যে-যার স্টেশনে চলে যাও!'

হ্যাচের ভেতর ছোট্ট জায়গায় শরীরটাকে কোনভাবে গুটিয়ে রেখেছে রানা।

আবার ক্যাপটেনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'অল ওয়াটার টাইট ডোর ক্লোজড।'

রানার শরীর হ্যাচের ভেতর ভ্রূণের আকৃতি পেয়েছে। শরীরের তলা থেকে কোন রকমে ডান হাতটা বের করে চোখের সামনে নিয়ে এল। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে আড়াইটা বাজে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, বোকার মত অনেক দেরি করে ফেলেছে ও। এখন আর জায়গা মত প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভগুলো ফিট করা সম্ভব নয়। ফিট করতে হলে নিজের গায়ে বা গায়ের পাশে ফিট করতে হবে।

আরেকটা চিন্তা আতঙ্কিত করে তুলল। এই ছোট্ট জায়গার ভেতর সময়টা কাটাবে কিভাবে? রাত আটটায় অপারেশন শুরু হবে, তারমানে আরও অন্তত সতেরো ঘণ্টা বাকি। আশ্চর্য, এত আগে কেন রওনা হচ্ছে ওরা? উত্তরটা সহজ, চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছে অপেক্ষা করবে সাবমেরিন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আরেকটা প্রশ্ন ওঠে। রাডারে ধরা পড়ার ভয় নেই ওদের?

রানার মনে পড়ল, এর আগের একটা অপারেশনে অদ্ভুত আকৃতির একটা ক্যাটাম্যারান ব্যবহার করেছিল খায়রুল কবির, রাডারকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে সেটায় এক ধরনের কেমিকেলের প্রলেপ ব্যবহার করেছিল সে, রঙটা ছিল কালো।

রানার নিচে দিয়ে কেউ একজন হন হন করে হেঁটে গেল। বেল্টে গোঁজা পিস্তলে হাত দিল রানা। ক্রুদের কেউ ওর মাথার ওপরের এক্সেপ ট্রাঙ্ক-এর টিউব চেক করতে আসতে পারে। লকিং হুইল বন্ধ ও আঁটসাঁট আছে কিনা পরীক্ষা করা খুবই স্বাভাবিক। পায়ের শব্দ থামল না, সাবমেরিনের পিছন দিকে চলে গেল। রানার পেশীতে ঢিল পড়ল। ওর চারপাশে ও নিচে ধাতব পাত কাঁপছে। ডিজেল এঞ্জিনগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠল।

ক্যাপটেনের গলা পেল রানা, 'এঞ্জিন স্লো অ্যাহেড। কাস্ট অফ ফরওয়ার্ড। কাস্ট অফ অ্যাফট।'

তারপর চিশতির গলা ভেসে এল, থেমে থেমে কথা বলছে, আড়ষ্ট জিভ। 'হাঁ-হাঁ, বাত কিজিয়ে!' সম্ভবত রেডিওতে কথা বলছে সে। 'ইয়েস, লাউড অ্যান্ড ক্লীয়ার। কিয়া? মারহাবা! মারহাবা!' তারপর ক্যাপটেনকে বলল, 'ক্যাপ্তান সাহাব, বহুত বড়ি খবর হ্যায়। নষ্ট মেয়েলোকটা ধরা পড়েছে, কাপ্তান সাহাব!'

'কার কথা বলছেন?' ক্যাপটেনের গলা।

'ইশরাত জাহান, কাপ্তান সাহাব। বসকে আগেই সাবধান করেছিলাম, ওই আওরাত বেঈমানী করবে।'

'ধরা পড়েছে? কোথায় সে?'

'কুতুবদিয়ার ঘাঁটিতে, কাপ্তান সাহাব,' বলল চিশতি। খক খক করে কর্কশ হাসি হাসল দৈত্যটা। 'ফিরোজা তার খাতির-যত্ন করছে। ভয় পাচ্ছি, মেরে না ফেলে।'

কেন, মেরে ফেললে ভয় পাবার কি আছে?'

আবার কুৎসিত শব্দে হাসল চিশতি। 'বস্ তো আর ওই আওরাতকে নেবেন না। বেঁচে থাকলে আমাদের সবার এজমালি সম্পত্তি হয়ে যাবে। খুবসুরত আওরাত, হাত লাগাবার সুযোগ পেতাম।'

দাঁতে দাঁত ঘষল রানা। গোক্ষুরের মত ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে

ক্যাপটেনের গলা, 'অল হ্যান্ডস অ্যাট ডাইভ স্টেশন। ক্লোজ আপ মেইন হ্যাচ।'

দু'জন লোকের নড়াচড়ার আওয়াজ পেল রানা, ওপর দিকে ছিল, কন্ট্রোল রুমে নেমে এল। তারপর হুইল লকের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ ঢুকল কানে, অর্থাৎ মেটাল কফিনের ভেতর আটকা পড়ল সবাই

রানার পালাবার রাস্তা একটাই, মাথার ওপর ট্রাঙ্কটা। বসের নির্দেশে নিয়মিত রিফ্রেশার কোর্স নিতে হয়, তার মধ্যে সাবমারর্জড এস্কেপ ট্রেনিংও থাকে। পানির সারফেস থেকে সাবমেরিন চারশো ফুট নিচে থাকলে ট্রাঙ্ক হয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ওর জন্যে কোন সমস্যা নয়। তবে গভীরতা আরও বেশি হলে বিপদ আছে।

এস্কেপ ট্রাঙ্ক অপারেট করতে হলে প্রথমে স্টেইনকি হুড পরতে হবে ওকে। এই হুড শুধু মাথা কাভার করে না, শরীরের ওপরের অংশেও শক্তভাবে আটকে থাকে। দমকল কর্মীরা যে-ধরনের ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ব্যবহার করে, ওপরের অংশটা সেরকম দেখতে আর নিচের অংশ লাইফ জ্যাকেটের ভূমিকা পালন করে এই কম্বিনেশন আসলে একজন ক্রুর জন্যে সাবমেরিন ত্যাগ করে ট্রাঙ্কে ওঠার ছাড়পত্র। ট্রাঙ্কে ওঠার পর নিচের ওয়াটারটাইট হ্যাচ বন্ধ করতে হবে, তারপর ছোট একটা এয়ার স্পেস বাদে গোটা সিলিন্ডার ভরে ফেলতে হবে পানিতে এয়ার স্পেস-এর পাশে আছে এয়ারপোর্ট, সেটা থেকে ক্রু এবার ব্রিদিং অ্যাপারেটাস চার্জ করে নেবে। হুডের আপার পার্ট চার্জ করার পর ওপরের হ্যাচ খুলে যাবে, ক্রু নেমে যাবে সাগরে, তারপর দ্রুত সারফেসের দিকে উঠতে শুরু করবে। ট্রাঙ্কে পানি ভরে সাগরে বেরিয়ে যেতে মাত্র এক মিনিট সময় লাগে কোন কারণে দেরি করলে 'বেন্ড'-এর শিকার হতে হবে—রক্তে নাইট্রোজেন গ্যাসের খুদে বুদ্বুদ তৈরি হবে, ফলে তীব্র ব্যথায় অবশ হয়ে যাবে শরীর

এই মুহূর্তে রানা অবশ্য পালাবার কথা ভাবছে না প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভগুলো জায়গা [illegible] করা সম্ভব হয়নি, সেজন্যে নিজেকে এখন তিরস্কার করেও কো[illegible] নেই নিজেকে খুন করে হলেও সাবমেরিনটাকে ডুবিয়ে দেয়ার ইচ্ছে থাকলে কাজটা এখনও করা যায়। হ্যাচের ভেতর জায়গা যতই কম হোক, এক্সপ্লোসিভগুলোকে এখানেও ফাটাতে পারবে ও।

ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলোকে রক্ষা করতে হলে অন্য কোন পথ খোলাও নেই। রানা দেরি করছে একটা মাত্র কারণে, অপেক্ষা করে দেখতে চায়

পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায়। সাবমেরিনে কম করেও বিশজন ক্রু রয়েছে। একা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জেতা সম্ভব নয়। টর্পেডোগুলোর রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই, আগে এ-ধরনের কোন যন্ত্র দেখেনি ও। হাতে পেলে মেকানিজমটা বোঝার চেষ্টা করতে পারত। সেটা কোথায় বা কার কাছে আছে তা-ও ওর জানা নেই।

ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করছে রানা। একটা ব্যাপারে কোন আপস নেই, খায়রুল কবিরের অপারেশন নকআউট ব্যর্থ করে দিতে হবে ওকে। প্রয়োজনে নিজের প্রাণ হারিয়েও।

সেক্ষেত্রে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

পাউচ আর বেল্ট থেকে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করল রানা। নরম কাদা, কয়েক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় ফিট করার কথা ছিল। এখন যেহেতু সে সুযোগ নেই, সমস্ত কাদা এক করে একটা পিণ্ডে পরিণত করল। পকেট থেকে বেরুল ছোট একটা স্ক্রু ড্রাইভার, ফিউজটাকে 'আর্ম' করার কাজে লাগল। সবশেষে টাইমিং ডিভাইস-এর সঙ্গে সংযোগ দিল ফিউজ-এর। ঘড়ির কাঁটা সেট করল পরবর্তী রাত আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে।

আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, এই সময় বিস্ফোরিত হবে দেড় কেজি প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, শরীর থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। লাশ তো দূরের কথা, হাড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না, সব পাউডার হয়ে যাবে, তারপর মিশে যাবে সাগরের পানিতে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে রানা, কিন্তু সাবমেরিন তখন সাগরের কতটা গভীরে বা তীর থেকে কতটা দূরে থাকবে কে জানে। তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকলে সাঁতরে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। মনে পড়ল, এদিকের পানিতে হাঙরের উপদ্রব ইদানীং মারাত্মক মাত্রায় বেড়ে গেছে। আর যদি সারফেস থেকে পাঁচ বা ছয়শো ফুট গভীরে থাকে সারমেরিন, পানির চাপে মারা যেতে হবে।

সাবধানের মার নেই ভেবেই ক্যাপটেন তার সাবমেরিনকে তীর থেকে কয়েক নটিকাল মাইল দূরে সরিয়ে এনেছে, আন্দাজ করল রানা। তবু যদি ঝুঁকি নিয়ে সাগরে বেরোয় ও, তারপর সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, হাঙর ছাড়াও অন্য ধরনের বিপদ পিছু নেবে। এস্কেপ ট্রাঙ্ক ব্যবহার করা হলে সঙ্গে সঙ্গে টের পাবে ক্রুরা। চিশতির অন্তত বুঝতে বাকি থাকবে না সাবমেরিনে কে লুকিয়ে ছিল বা কে পালিয়ে গেল। হাতে সময় আছে, সাবমেরিন ধাওয়া করবে রানাকে। তা যদি নাও করে, অভিজ্ঞ কোন ডাইভারকে পানিতে নামিয়ে দেয়া হবে, ধাওয়া করে রানাকে খুন করার জন্যে।

না, বোকার মত কিছু না করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে ওকে। পালাতেই যদি হয়, বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হবার পাঁচ মিনিট আগে

পালাবে।

এত কথা ভাবছে রানা, তারপরও মুহূর্তের জন্যেও ইশরাতের কথা ভুলতে পারছে না। ইশরাত ওদের হাতে ধরা পড়েছে, তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কষ্ট পাচ্ছে রানা। তবে তারই সঙ্গে গর্বও অনুভব করছে। সাবমেরিনের ক্রুরা ওকে এখনও খুঁজছে না, এর অর্থ হলো ইন্টারোগেট করে ইশরাতের কাছ থেকে কবির বা ফিরোজা কোন তথ্যই বের করতে পারেনি। সুপারমডেল হবার পর থেকে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিলই না ইশরাতের, অথচ তার দেশপ্রেম রীতিমত ঈর্ষণীয়। রানা এখন কোথায়, জানে সে। বলে দিলেই অসহ্য অত্যাচার থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু বলেনি। অন্তত এখনও বলেনি।

ক্যাপটেনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর রানার চিন্তায় বাধা দিল। 'সারফেসে ম্যাক্সিমাম স্পীড তোলা হয়েছে, এবং এই স্ট্যাটাস ভোর পর্যন্ত বজায় রাখা হবে—যদি না অন্য কোন জাহাজ হাজির হয়। আকাশ রঙ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দেব আমরা। ডাইভিং ওয়াটারে পৌঁছুব আর দশ মিনিটের মধ্যে। ডুব দেয়ার পর, প্ল্যান অনুসারে, সাগরের যতটা সম্ভব গভীরে থাকব আমরা, যতক্ষণ না চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাই।'

অর্থাৎ, রানা উপলব্ধি করল, বন্দরে পৌঁছানোর পথে পালাবার কোন উপায় থাকছে না। গোপন আশ্রয়ের ধাতব দিকটায় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সেট করেছে ও, সেটার পাশে মাথা রেখে হাত-পা যতটা সম্ভব ছড়িয়ে পেশীগুলোকে শিথিল হবার সুযোগ দিল, তারপর চোখ বুজল। এঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজ আর দুলুনি সম্মোহিত করে ফেলল, ধীরে ধীরে ঘুমের জগতে তলিয়ে গেল রানা।

ঘুম ভাঙল যান্ত্রিক চিৎকারে। 'ডাইভ! ডাইভ! ডাইভ!' খুদে ধাতব কারাকক্ষ কাত হয়ে পড়ল, কানে চাপ অনুভব করছে রানা, সাগরের গভীরে দ্রুত নেমে যাচ্ছে সাবমেরিন। হাতঘড়ি দেখল, সাড়ে পাঁচটা বাজে। দুই পা ক্র্যাম্পে আক্রান্ত, দুই বাহু আর পিঠ ব্যথায় অবশ হয়ে আছে। শান্তভাবে নাক দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বাতাস ছাড়ল, এই নরক যন্ত্রণা আরও অন্তত পনেরো ঘণ্টা সহ্য করতে হবে। নির্ভেজাল ভয় ঢুকল মনে, ততক্ষণে না সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে শরীরটা।

ঘুম ছাড়া সময় কাটানোর বা কষ্ট এড়াবার আর কোন উপায় নেই। ঝিমুনি মত আসে, কিন্তু একটু পরই কন্ট্রোল রুম থেকে ভেসে আসা কোন আওয়াজে চমকে ওঠে। হ্যাচ লেভেল থেকে সামান্য একটু মাথা নামালেই কন্ট্রোল রুমের সব কথাবার্তা প্রায় পরিষ্কারই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

'সময়ের অনেক আগেই পৌঁছাচ্ছি আমরা,' বলল ক্যাপটেন। বেশিরভাগ সময় ইংরেজি বললেও, দু'একবার ভাঙা ভাঙা উর্দুও বলে সে—রানার সন্দেহ লোকটা বাঙালী।

'এই প্রথম ওয়াসিম নকভি, খায়রুল কবিরের স্টাফ ম্যানেজারের গলা

পেল রানা। 'শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করার চেয়ে আগে পৌঁছানোই তো ভাল।'

'আপনারা অনুমতি দিলে সাবকে আমি গভীর সাগরে নিয়ে যেতে পারি, বন্দরে পৌঁছানোর আগেই ডুবিয়ে দিতে পারি জাহাজগুলো।'

'প্রশ্নই ওঠে না, ক্যাপটেন,' ধমকের সুরে বলল নকভি। 'বসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব আমরা। হিন্দুস্থানী জাহাজগুলো বন্দরের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে হবে। বস্ এক ঢিলে অসংখ্য পাখি মারার সুযোগ নিতে চান। হারবারে অনেক জাহাজ থাকার কথা, বসকে খুশি করতে হলে ওগুলোরও ক্ষতি করতে হবে।'

'আরে ভাই, আমি ঠাট্টা করছিলাম!'

'অপারেশন নকআউট ঠাট্টা করার বিষয় নয়, ক্যাপটেন। আমরা সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে আছি।'

'কোন চিন্তা করবেন না, মি. নকভি,' আশ্বস্ত করল ক্যাপটেন। 'এই লেটেস্ট রেডারের নীল স্ক্রীনে টর্পেডোগুলো দেখতে পাবেন আপনারা। জাহাজগুলোকেও দেখতে পাবেন। টর্পেডো আর জাহাজ, দুটোর মাঝখানে একটা সরল রেখা ফুটে উঠবে—ডট-ডট-ডট-ডট। এদিকে তাকান, এই লিভারগুলো হলো রিমোট কন্ট্রোল। এটা এক চুল ঘোরান, টর্পেডোর নাকও ঘুরে যাবে—আমি বলতে চাইছি, ফ্রিগেট বা ডেস্ট্রয়ারের যে-কোন অংশে আঘাত করতে পারবেন আপনি।'

'বিস্ফোরণের শক ওয়েভ আমাদেরকে আঘাত করবে না?'

'টর্পেডোগুলো বেরিয়ে যাবার পর সরল রেখা ঠিক আছে কিনা দেখব আমরা, তারপরই সারমেরিন ঘুরিয়ে নিয়ে দে ছুট।'

'শুনে স্বস্তিবোধ করছি,' বলল নকভি। 'তবে টর্পেডো ছোঁড়ার আগে পোর্ট সাইডে সুইট হোম আছে কিনা দেখে নিতে ভুলবেন না। টর্পেডো ছুঁড়বেনও ঠিক আটটায়। বস্ আমাকে পুরোপুরি শিওর হয়েই বলেছেন, ঠিক আটটায় পৌঁছুবে জাহাজগুলো, ঘড়ির কাঁটা ধরে।'

'বললামই তো, মি. নকভি, কোন চিন্তা করবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আমি উপভোগ করছি। আমার আব্বাজান ছিলেন রাজাকার, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ঘোর সমর্থক, তাকে মুক্তিবাহিনীর শয়তানগুলো বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুন করেছে। প্রতিশোধ নেয়ার এই সুযোগ পেয়ে আমি মি. কবিরের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

হ্যাচের তলা থেকে মাথাটা তুলে হাত দিয়ে ঘাড় ডলছে রানা। হাত ও পা আবার যতটা সম্ভব লম্বা করে দিল। আবার ঝিমুনি আসছে।

সচেতনতা ফিরে এল আটটায়। এখনও বারো ঘণ্টা বাকি। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি ব্যথায় টন-টন করছে। নিরানব্বুই, আটানব্বুই, সাতানব্বুই—গুনতে শুরু করল। পঞ্চাশ পর্যন্ত গোণার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

চমকে উঠল রানা। ভাবল, আমি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম? শরীরের অবস্থা এতই কাহিল, নাড়াতেই পারছে না। অনেক কষ্টে চোখের সামনে আনতে পারল হাতঘড়িটা। অবিশ্বাস্য মনে হলো—স্টেনলেস স্টীল রোলেক্স-এর কাঁটাগুলো তিনটে বেজে দশ মিনিটে পৌঁছে গেছে।

সাবমেরিন আগের মতই ছুটে চলেছে। রানা জানে না কতটা গভীরে রয়েছে ওরা, তবে স্পীড খুব বেশি নয়। কন্ট্রোল রুমে এখনও ওরা কথা বলছে, তবে গলার আওয়াজ কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

মিনিটগুলো ঘণ্টা, ঘণ্টাগুলো দিন হয়ে যাচ্ছে। রানা এখন আর ঘুমাতেও পারছে না। প্রতিটি নার্ভ ও পেশী টান-টান, উদ্বেগ আর উত্তেজনায় গুটানো স্প্রিঙ।

সন্ধ্যা ছ'টার দিকে ওর সবচেয়ে ভীতিকর সন্দেহটা সত্যি প্রমাণিত হলো। এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, স্রোতের টানে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা। খানিক পর স্থির হয়ে গেল সাবমেরিন। সাগর এখানে অনেক বেশি গভীর। ক্যাপটেনকে রানা বলতে শুনল, পজিশনে পৌঁছুতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা লাগবে।

নকভিকে নিয়ে সাবমেরিনের পিছন দিকে চলে এসেছে ক্যাপটেন, হাঁটাহাঁটির আওয়াজ শুনে মনে হলো ব্যায়াম করছে। ডেকে কয়েক বার চক্কর দিয়ে এমন জায়গায় এসে থামল ওরা, প্রায় সরাসরি হ্যাচের নিচে, রানা যেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। দম বন্ধ করে ফেলল ও, এক চুল নড়ছে না।

'এটা এক ধরনের ছেলেমানুষি কিনা?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন। 'এ কি সত্যি কোন দিন বাস্তবে রূপ নেবে? বাংলাদেশকে আমরা পূর্ব-পাকিস্তান বানাতে পারব?'

'বস্ তো হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত,' জবাব দিল নকভি। 'তবে তিনি বলেছেন যে সময় লাগবে।'

'কিন্তু···হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত উনি কিভাবে হন? যুক্তি কোথায়?'

'পরিষ্কার জানি না, তবে আমার কানে এসেছে যে পাকিস্তান সরকারকে অ্যাটম বোমা বানাতে বস্ সাহায্য করেছেন এই শর্তেই—পূর্ব-পাকিস্তানকে ফিরে পাবার জন্যে প্রয়োজনে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।'

ক্যাপটেন বলল, 'কিন্তু আমার জানামতে পাকিস্তানের বোমা ভারতের তুলনায় কম শক্তিশালী। তাছাড়া, ভারত দাবি করছে তাদের কাছে যে মাল-মশলা আছে তাতে ষাট থেকে সত্তরটা বোমা বানানো যাবে। অথচ পাকিস্তান বানাতে পারবে মাত্র পাঁচটা। শক্তির ভারসাম্য এতটাই যদি কমবেশি হয়, পারমাণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে পাকিস্তান কি সুবিধে করতে পারবে?'

'হিন্দুস্থানীরা ভুল তথ্য দিচ্ছে,' জবাব দিল নকভি। 'পাকিস্তানের হাতে এখনই পনেরোটা বোমা আছে। আরও বিশটা বোমা বানাবার উপকরণ

যোগাড় করা হয়েছে। এ-ও জেনে রাখুন, বসই এ-সব উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাছাড়া, পারমাণবিক বোমার সংখ্যা খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না। এ কি গ্রেনেড নাকি যে ডজন ডজন ব্যবহার করার দরকার পড়ে? বস্ পাকিস্তান সরকারকে একটা প্ল্যান দিতে যাচ্ছেন বলে শুনেছি।'

'কি প্ল্যান?'

'দিল্লী, মুম্বাই আর পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতায়, মোট তিনটে বোমা ফেললেই কাজ হবে,' বলল নকভি। 'পশ্চিম বঙ্গে বোমা পড়লে হিন্দুস্থান বাংলাদেশে সৈন্য পাঠাতে পারবে না। আপনাকে আরেকটা গোপন খবরও তাহলে জানাতে হয়।'

'নিশ্চিত থাকুন, আমি কাউকে বলব না।'

'বসের প্ল্যানে ঢাকাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হবে,' বলল নকভি। 'বস্ একটা মিসাইলের ডিজাইন তৈরি করেছেন, লাহোর থেকে ছুঁড়লে সরাসরি ঢাকায় এসে পড়বে।'

'তাতে লাভ?'

'চট্টগ্রাম হবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী, কারণ এখানে বসের সমর্থকের সংখ্যা অনেক বেশি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার ধারণা ভুল, ব্যাপারটা মোটেও অবাস্তব নয়।' ক্যাপটেনকে উল্লসিত মনে হলো। 'আচ্ছা, বলুন তো, সত্যিই কি উনি নিজের স্ত্রীকে ফিরোজাকে দিয়ে খুন করাবেন?'

'আমার জানামতে সেই নির্দেশই ফিরোজাকে দেয়া হয়েছে,' বলল নকভি। 'শুধু ইশরাতকে নয়, তার সী প্লেনের পাইলট ইকবালকেও ফিরোজা খুন করবে।'

'মানতেই হবে, উনি খুব প্র্যাকটিকাল মানুষ, তা না হলে এত দূর আসতে পারতেন না।'

রানার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ইশরাত কি এরইমধ্যে খুন হয়ে গেছে? আর ইকবাল? ওদেরকে বাঁচানোর একটা সুযোগ অন্তত পাবে না ও?

কন্ট্রোল রুমে ফিরে গেল ওরা। প্রতি মিনিটে একবার করে হাতঘড়ি দেখছে রানা। তারপর, অবশেষে, সন্ধ্যা সাতটার দিকে আবার রওনা হলো সাবমেরিন।

আধ ঘণ্টা পর ক্যাপটেনের গলা পেল রানা, 'আপ পেরিস্কাপ।' যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে এল। 'ফাইভ ডিগ্রী টু পোর্ট।' ঠিক সাড়ে সাতটায় চূড়ান্ত নির্দেশ দিল সে, 'স্টপ এঞ্জিনস। পজিশনে পৌঁছে গেছি আমরা। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর এসকর্ট শিপগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। চারটে গানবোট। সোজা বন্দরের দিকে ছুটে আসছে। দুটো গান বোট পোর্ট সাইডে, ওগুলোর পিছনে রাম ও লক্ষ্মণ—একজোড়া হিন্দুস্থানী ফ্রিগেট। স্টারবোর্ড সাইডে দুটো গানবোট, ওগুলোর পিছনে অর্জুন আর হনুমান—একজোড়া হিন্দুস্থানী ডেস্ট্রয়ার। ঘড়ির কাঁটা ধরে আসছে ওগুলো। বন্দরে ঢোকার মুখে,

খোলা সাগরে, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর আরও জাহাজ রয়েছে। ফ্রিগেট জোড়া আমাদের সাইটে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সামনে গানবোট থাকা সত্ত্বেও। ওগুলো বিস্ফোরিত হবে আমরা দু'মাইল দূরে থাকতে। অন দা বাটন।'

হাতঘড়ির ওপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা। সাতটা পঁয়তাল্লিশ। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বিস্ফোরিত হবে পনেরো মিনিট পর। নিয়ন্ত্রণ করা গেল না, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মত থরথর করে কাঁপতে শুরু করল রানা, দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। সমস্ত মনোবল এক করে নিজেকে শান্ত করল ও। আত্মরক্ষার ইচ্ছেটা এখন প্রবল নয়, কয়েকশো মানুষকে বাঁচানোর বিনিময়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়াটাই প্রধান কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে। আমি মানুষ, নিজেকে শক্তি যোগাচ্ছে রানা, আত্মত্যাগ আমার পরম ধর্ম। তবে প্রতি মুহূর্তে সচেতন; নিজেকে ভুলতে দিচ্ছে না, বোকার মত কিছু করা চলবে না। এখন তৈরি হবার সময়। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও, শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রতিবাদে ফেটে পড়ল যেন।

কন্ট্রোল রুম থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'পোর্ট সাইডে রয়েছে সুইট হোম, রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত। ফিফটি ইয়ার্ড পোর্ট অ্যান্ড হোল্ডিং স্টেডি। স্ট্যান্ড বাই।'

কন্টেইনার থেকে একটা হুড বের করল রানা, তারপর ওপরে হাত লম্বা করে নিজেকে ট্রাঙ্কে তোলার চেষ্টা করল। শরীরটা আড়ষ্ট, আঙুলে শক্তি নেই, হুডটা খসে পড়ল হাত থেকে। ডেকে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে সেটা।

স্থির হয়ে গেল রানা। তারপর দ্রুত আরেকটা হুড হাতে পাবার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল। ওর ডান পায়ের গোড়ালি যেন ইস্পাতের আঙটা দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরা হলো। তারপরই হ্যাচকা একটা টান। ভারী বস্তার মত নিচের ধাতব ডেকে পড়ল রানা। ওর ওপর ঝুঁকে আছে রূপকথায় পড়া সেই মানুষখেকো রাক্ষস—পিয়ার আলি চিশতি। 'সালে বাঙ্গাল!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। রানা অচল হয়ে পড়ে আছে, নড়ার শক্তি নেই। ওর কাঁধ খামচে ধরে আবার এক টান দিল চিশতি, এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে আছাড় মারল দ্বিতীয়বার ধাতব ডেকে। প্রচণ্ড ব্যথাই যেন শক্তি ফিরিয়ে আনল, শরীরটাকে ভ্রূণের আকৃতিতে গুটিয়ে নিয়ে পা দুটো সবেগে ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। জোড়া পায়ের তলা চিশতির হাঁটুর ঠিক নিচে লাগল।

ভোঁতা আওয়াজ বেরুল চিশতির গলা থেকে, তাতে ব্যথার চেয়ে ক্রোধের প্রকাশই বেশি মনে হলো। পিছু হটল সে, একটা লোহার পোস্টে ধাক্কা খেলো। শরীরটা প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু গতি মন্থর। লোহার পোস্টে লেগে শিরদাঁড়া আর মাথার পিছনে খুলি বোধহয় ফেটেই গেছে। নিজেকে সিধে করল সে, টলছে, এই ফাঁকে রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরিটা।

ডেকের ওপর গুড়ি মেরে আছে রানা, লাফ দিল সামনে। প্রায় একই সময়ে চিশতিও লাফ দিয়েছে। মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটল। হাতল বাদে ছুরির

সবটুকু ফলা সেঁধিয়ে গেল বুকের ঠিক নিচে। দু'জন দু'জনকে যেন আলিঙ্গন করে আছে। পিছিয়ে এল রানা, ছুরির হাতলটা নিচের দিকে টেনে নামিয়ে আনল নাভি পর্যন্ত। বিকট একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল দৈত্যটার গলা চিরে।

চারদিক থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। কম্প্যানিয়নওয়েতে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। এখন আর হ্যাচে উঠে ট্রাঙ্ক হয়ে পালানো সম্ভব নয়। ইশরাতকে রানা বলে এসেছে, মরতে যাচ্ছি। সেটাই সত্যি হতে যাচ্ছে। ছুরিটা খাপে রেখে দিল ও, হাতে বেরিয়ে এল অটোমেটিক পিস্তল। এখন আর কোন কিছু চিন্তা করার সময় নেই। ছুটল রানা, ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল কন্ট্রোল রুমে। ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই ওকে দেখতে পেল নকভি। গুলিটা লাগত তার মাথার পিছনে, লাগল কপালের মাঝখানে। রানা বিরতি নেয়নি, দ্বিতীয় গুলিটা ক্যাপটেনের খুলি আক্ষরিক অর্থেই ছাতু করে দিল।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে নয়, পাশে দাঁড়াল রানা, দু'দিকের দরজার ওপরই পালা করে নজর রাখছে। তারই ফাঁকে নীল মনিটরে চোখ বুলাল। ও আল্লাহ! টর্পেডোগুলো এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে। ডট দিয়ে তৈরি চারটে সরলরেখা চারটে টার্গেটের দিকে সরাসরি ছুটে চলেছে। দরজার দিকে চোখ রেখে একটা লিভার ধরল রানা। স্ক্রীনে তাকাল আবার, ইতিমধ্যে লিভারটা একটু ঘুরিয়েছে।

একটা সরলরেখা ঘুরে গেছে, সেটা এখন টার্গেটের দিকে তাক করা নয়, লম্বা হয়ে রয়েছে গভীর সাগরের দিকে। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল দু'জন ক্রু, রানাকে দেখে দু'জনেই হাঁ হয়ে গেল। ওদের মুখের ভেতর গুলি করল রানা। টার্গেট মিস করল, একজনের চোখে ঢুকল বুলেট, আরেকজনের গলায়। বাকি তিনটে লিভার কোনদিকে ঘোরাতে হবে জানে রানা, দরজার দিকে চোখ রেখেই ঘোরাল। তারপর চট করে আরেকবার তাকাল নীল স্ক্রীনের দিকে। চারটে রেখাই ঘুরে গেছে, স্ক্রীন থেকে বেরিয়ে গেছে সবগুলো, স্টারবোর্ড সাইডে।

হাতে উদ্যত পিস্তল, কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা এক ছুটে। হ্যাচ ওঠার সময় কাউকে দেখতে পেল না, তবে কম্প্যানিয়নওয়ের নিচে অনেক লোক চিৎকার করছে। ব্যাটারা গুলির আওয়াজে ভয় পেয়েছে, ওপরে উঠতে সাহস পাচ্ছে না, ভাবল রানা। হ্যাচে উঠে আরেকটা হুড নিল ও, তারপর উঠে পড়ল ট্রাঙ্কে। সার্কুলার বটম হ্যাচ জায়গা মত বসিয়ে দিল। তারপর হুইল ঘুরিয়ে ট্রাঙ্কটাকে শুধু ওয়াটারটাইট করল, তা নয়, দুর্ভেদ্যও করে তুলল।

বেল্ট অ্যাডজাস্ট করল রানা, ছুরি আর পিস্তল যাতে স্ট্র্যাপের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে থাকে। হাতের তালু আকৃতির একজোড়া হুইল ট্যাপ ঘোরাল ও, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিরাপদ সময় খুব কমই অবশিষ্ট আছে।

কমপার্টমেন্টের ভেতর পানি ঢুকতে শুরু করেছে, ওর ধারণার চেয়ে দ্রুত বেগে। হুডটা পরে নিল তাড়াতাড়ি, এয়ার পোর্টের সঙ্গে সংযোগ দিল ভালভ-এর, নিশ্চিত হয়ে নিল ওর মাথা যেন হ্যাচের ওপরের অংশে জমে থাকা বাতাস ভর্তি বুদ্বুদের ভেতর থাকে।

পানি দ্রুত উঁচু হচ্ছে। কাঁধ ছুঁলো। বিন্দু আকৃতির আলো দেখে বুঝতে পারল ওর এয়ার রিজারভয়ার পুরোপুরি ভরে গেছে। দ্রুত একটা মোচড় খেলো, এয়ার পোর্ট থেকে মুক্ত হয়ে গেল শরীর। আরেকবার ঘড়ি দেখল। সাতটা সাতচল্লিশ।

পানি হুড়মুড় করে মাথা ছাড়াল, ওপরের হ্যাচ ধাতব শব্দ তুলে খুলে গেল, সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রকেটের বেগে সারফেসে উঠলেও, অল্প এইটুকু সময়কে অন্তহীন মনে হলো। সারফেস ভেঙে পানির ওপর রাতে মাথা তোলার পর দিকভ্রান্ত লাগল নিজেকে। প্রথমে শুধু অন্ধকার দেখল চোখে। তারপর বন্দর নগরীর আলো। এক ঝটকায় হেডপীস খুলে ফেলল মাথা থেকে, মুখ খুলে বাতাস খাচ্ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে সামনে এগোবার জন্যে। এক পাক, পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরল রানা। সুইট হোম ওর কাছ থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে, শুধু রাইডিং লাইট জ্বেলে রেখেছে।

দ্রুত সাঁতার কেটে সুইট হোমের পিছন দিকে চলে এল রানা, আসার পথে অন্যান্য আরও অনেক এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল। বন্দর থেকে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর বেশ কয়েকটা অতিরিক্ত গানবোট বহির্নোঙ্গর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভারতীয় ফ্রিগেট আর ডেস্ট্রয়ারগুলো, সামনে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর চারটে গানবোট, এখনও মাইল খানেক দূরে।

সুইট হোমের পিছনে পৌঁছেছে রানা, তিন সেকেন্ড পর শক ওয়েভের ধাক্কা অনুভব করল। ওর চারপাশে সাগর উথলে উঠল, পানিতে ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে, প্রায় পাঁচজোড়া হাত নেমে এল পানিতে—টেনে তুলে নিল ওকে ইয়টে। 'মাসুদ ভাই নিরাপদ!' কে যেন উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

'ওয়েলডান!'

'ইউ হ্যাভ ডান ইট!'

'আ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট!'

ওরা সবাই বিসিআই-এর তরুণ এজেন্ট, এক অর্থে রানার শিষ্য। আবেগে উল্লাসে ফেটে পড়ার অবস্থা।

ইয়টের স্টারবোর্ডের দিক থেকে কেউ একজন চিৎকার করছে, 'পানির তলায় বিস্ফোরিত হয়েছে একটা সাবমেরিন! কনিং টাওয়ার বিচ্ছিন্ন হয়ে সারফেসে উঠে এল, তারপর ডুবে গেল!'

ডেকে পা দিয়েই ছুটল রানা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ব্রিজে। কেউ একজন ওর হাতে একটা বিনকিউলার ধরিয়ে দিল। আরেক ছুটে ব্রিজ ডেকে বেরিয়ে এল ও।

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

চোখে বিনকিউলার, ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলোর দিকে তাকাল রানা। ওগুলোর সামনে রয়েছে বাংলাদেশের পতাকাবাহী গানবোট। সামনের গানবোটে স্থির হলো রানার দৃষ্টি। মর্টারের পাশে উনি কে দাঁড়িয়ে? চোখে বিনকিউলার?

এক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। বিসিআই চীফ, ওর বস্, পরিষ্কার জানতেন রানার একার পক্ষে অপারেশন নকআউট ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। সমস্ত তথ্য শেষ মুহূর্তে হাতে আসে, অর্থাৎ সেই মুহূর্তে রানার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব না চাপিয়ে উপায়ও ছিল না। জেনে শুনেই ওকে তিনি অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। অথচ তারপরও অন্তরের অন্তস্তলে বিশ্বাস রাখেন, রানা তাঁকে হতাশ করবে না। গানবোটে তাঁর উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে।

রাহাত খানের এক হাতে বিনকিউলার; এখনও সেটা চোখে ধরা, অপর হাতটা মাথার পাশে উঁচু করলেন তিনি; ঠিক একজন ট্র্যাফিক পুলিসের মত। রানা বুঝতে পারল না, বসের এই সঙ্কেত কিভাবে অনুবাদ করবে। এটা কি ওর কৃতিত্বের স্বীকৃতি? নাকি আস্থা প্রকাশ? অথবা নিখাদ প্রশংসা? নাকি বলতে চান, তুমি বেঁচে আছ দেখে আমি খুশি?

তারপর—রানার জন্যে আরও চমক অপেক্ষা করছিল—কেতাদুরস্ত সামরিক ভঙ্গিতে স্যালুট করলেন রাহাত খান।

তরুণ শিষ্যরা দেখে ফেলবে, তাই ভেজা চোখ লুকাবার জন্যে দ্রুত ঘুরল রানা, ছুটে ব্রিজে চলে আসছে, চিৎকার করে বলল, 'ইয়টটা আমার দরকার! তোমরা সবাই লাইফবোটে নামো, তারপর একটা গানবোট নিয়ে খায়রুল কবিরের টেকনাফ ঘাঁটিতে চলে যাও—ওখানে ওদের প্রচুর অস্ত্র আর লোকজন থাকার কথা। কুইক!'

৭

এগারো

মৈনাক টিলায় পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগল রানার। সমীরণ সী প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছিল সৈকতে, পথ দেখিয়ে পাঁচ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুটায় তুলে আনল ওকে। প্লাচটা ব্রীফকেস খুলে গ্লাইডারগুলো আগেই বের করা হয়েছে, কাঠামো জোড়া লাগিয়ে আকাশে ওড়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে শৈবাল, মন্টি আর শাহিন।

সমীরণ আর রানা পরস্পরকে সাহায্য করল, স্ট্র্যাপ দিয়ে নিজেদেরকে গ্লাইডারের সঙ্গে আটকাল ওরা। পাঁচটা পাহাড় বা টিলার মধ্যে সবচেয়ে কম

উঁচু খায়রুল কবিরের ঘাঁটিটা, তবে সাগরের সবচেয়ে কাছে সেটা, দুর্গ-প্রাকারের চূড়ায় দাঁড়ালে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম পরিষ্কারই দেখতে পাবার কথা।

রানার নির্দেশে যে-যার হেডসেট চেক করে নিল, কমিউনিকেশন সিস্টেম সহ। রেডিওর মাউথপীসে কথা বলল পালা করে, সিস্টেমটা ঠিক মতই কাজ করছে। তারপর চেক করল যে-যার অস্ত্র। রানা নিশ্চিত হয়ে নিল, সবার কাছে ফ্লেয়ার আর গ্রেনেড আছে। কারও সঙ্গেই অটোমেটিক রাইফেল নেই, তবে অটোমেটিক পিস্তল আছে সবার কাছে।

কি করতে হবে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। এই অপারেশনের দুটো উদ্দেশ্য। প্রথম উদ্দেশ্য, এটাই মুখ্য, ইশরাত আর ইকবালকে উদ্ধার করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, খায়রুল কবিরকে খুন করা।

টিলার ওপর দিয়ে ছুটে এল ওরা, কিনারা থেকে ঝাঁপ দিল শূন্যে। একে একে আকাশে ভাসল গ্লাইডারগুলো। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা। দূরত্ব একেবারেই অল্প, খায়রুল কবিরের ঘাঁটির মাথায় পৌঁছুতে এক মিনিটও লাগল না।

উঁচু মন্দিরটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল ওরা পাঁচজন, নেতৃত্ব দিচ্ছে রানা, ঝাঁকের সামনে রয়েছে।

ফ্লাডলাইটের আলোয় মন্দির বা দুর্গ দিনের মত আলোকিত। টেকনাফে যাবার পথে দুর্গের প্রাচীরে কোন অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান বা মর্টার দেখেনি রানা। এখন দেখতে পাচ্ছে। দুর্গের চার কোণে চারটে মর্টার, পাশেই রয়েছে একটা করে লাইট মেশিন গান।

তবে গ্লাইডারের অস্তিত্ব প্রতিপক্ষ এখনও টের পায়নি। রেডিওতে রানা নির্দেশ দিল, 'প্রথমে মর্টার আর মেশিনগানগুলো অকেজো করে দাও।'

দুর্গের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় পিন খুলে গ্রেনেড ফেলল ওরা। দুর্গের ছাদে আট-দশজন লোক ছিল, আড়াল পাবার জন্যে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। দশ মিনিটের মধ্যে মর্টার আর মেশিন গান ধাতব জঞ্জালে পরিণত হলো।

ফ্লাডলাইটের আলোয় বিচিত্র, অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য দেখা গেল মন্দিরের খোলা চত্বরে। ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল দু'জন মানুষ, হাত মাথার ওপর তোলা, সাদা রুমাল নাড়ছে। দু'জনকেই চিনতে পারল রানা—নঈম খান আর ফিরোজা।

দুর্গের ওপর থেকে খোলা চত্বরের ওপর চলে এল রানা, লক্ষ করল ওর ডান দিকে রয়েছে শাহিন। ঠিক এই সময় একটা খিলানের আড়াল থেকে গুলি হলো। একটা ঝাঁকি খেলো ফিরোজা, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল পিঠ, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পাকা চত্বরে। ব্যাপারটা কি? প্রতিপক্ষ নিজেরাই নিজেদেরকে গুলি করছে কেন?

খিলানের আড়াল থেকে আবার অটোমেটিক রাইফেল গর্জে উঠল। খোলা চত্বর আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। চারদিকে উঁচু পাঁচিল, আত্মরক্ষার জন্যে পাগলের মত ছুটাছুটি করছে নঈম খান, কিন্তু পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। রাইফেলের গুলিটা লাগল না, তবু আছাড় খেয়ে পড়ে গেল সে। লাফ দিয়ে আবার সিধে হলো, ছুটল পাঁচিল লক্ষ্য করে।

আঁচড়াআঁচড়ি করে পাঁচিলের ওপর উঠতে চেষ্টা করছে নঈম খান। খিলানের আড়ালে এখন যে-ই থাকুক, নঈম তার জন্যে এখন ডালে চোখ বুজে বসে থাকা পাখির মত সহজ টার্গেট। অথচ আর কোন গুলি হচ্ছে না।

রানার ঠোঁটে ক্রূর হাসি। ছোট একটা ফ্লেয়ার চলে এল হাতে। গ্লাইডার নিয়ে অনেকটা নিচে নেমে এল ও, তারপর সরাসরি নঈমের পিঠে তাক করল সেটা।

সাদা চোখ ধাঁধানো আলো বিস্ফোরিত হলো, ঢেকে ফেলল নঈমকে। পাঁচিল থেকে খসে পড়ল সে, পাকা চত্বরে জ্বলন্ত মশালে পরিণত হয়েছে।

গ্লাইডার নিয়ে আকাশের আরও ওপরে উঠে আসছে রানা, শাহিনের গলা পেল রেডিওতে, 'মাসুদ ভাই, দুর্গের মাথায় একটা লোক। আপনার নাম ধরে কি যেন বলছে।'

দুর্গের কাছ থেকে দূরে সরে এল রানা, সঙ্গীদেরও নির্দেশ দিল নিরাপদ দূরে থাকার। ধীরে ধীরে গ্লাইডার নিয়ে আকাশের আরও ওপরে উঠল ও। শাহিন ওর পাশেই রয়েছে।

দুর্গের খোলা ছাদে, একদিকের কিনারায়, একা দাঁড়িয়ে রয়েছে খায়রুল কবির, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। রাইফেলটা সরাসরি রানার দিকে তাক করা।

দূর থেকেও তার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে রানা।

'মাসুদ রানা! এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে! আজ আমি হার মানলাম, কিন্তু কথা দিচ্ছি আবার আমি ফিরে আসব।' লক্ষ্যস্থির করাই ছিল, দ্রুত ট্রিগার টানল সে। তবে লাগাতে পারল না।

'ওর মতলব ভাল নয়,' রেডিওর মাধ্যমে সবাইকে সাবধান করে দিল রানা। 'দুর্গের ডান প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্য হলো, সুযোগ বুঝে নিচে লাফ দেবে।'

'মাসুদ ভাই, আপনি ঠিক ধরেছেন,' মন্টির গলা পেল রানা। 'দুর্গের ডান দিকে একটা খাল আছে, নিচের ঘাটে ছোট একটা স্পীডবোট দেখতে পাচ্ছি।'

'তোমরা ওর মতলব ধরতে পারোনি,' বলল রানা। 'খালটা সাগরে গিয়ে পড়েছে, আমি জানি। কিন্তু স্পীডবোটটা আড়াল করা হয়নি কেন? কবির কি জানে না ওটায় চড়ে পালাতে চেষ্টা করলে আমরা তাকে ধাওয়া

করব?'

'তাই তো?'

'স্পীডবোট নয়, অন্য কোনভাবে পালাবার কথা ভাবছে,' বলল রানা। 'সম্ভবত খালের নিচে কোথাও সুরকেল আছে। পানির তলা দিয়ে সাগরে বেরিয়ে যাবে। গোপন টানেল থাকাও বিচিত্র নয়। তবে পালাবার সুযোগ ওকে আমরা দিচ্ছি না।'

এখনও রানার দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে খায়রুল কবির। তাকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল রানা; বৃত্তটা ছোট করে আনছে। আরেকটা গুলি হলো। গ্লাইডারের একটা ডানা ফুটো করে বেরিয়ে গেল বুলেট। বৃত্ত আর ছোট করা উচিত হবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা।

ফ্লেয়ারটা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটল। কবির যেন জানত, তার আগেই লাফ দিয়ে দুর্গের নিচু পাঁচিলে উঠে পড়ল সে। তবে তার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে লক্ষ্যস্থির করেনি রানা, লক্ষ্যস্থির করেছিল পাঁচিলের তিন ফুট ওপরে, লাফ দিয়ে কবির যেখানে দাঁড়াবে বলে আন্দাজ করেছিল।

সাদা আলো বিস্ফোরিত হলো। খায়রুল কবির দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তবে দৃশ্যটা মাত্র এক সেকেন্ড দেখতে পেল ওরা। পাঁচিল থেকে নিচে পড়ে গেল সে।

রেডিওতে ভেসে এল মন্টির গলা, 'মাসুদ ভাই, সরাসরি খালের পানিতে পড়েছে ভিলেন।' কিছুক্ষণ পর আবার রিপোর্ট করল, 'কিন্তু লাশটা তো ভেসে উঠছে না!' তারপর সে ভাবল, পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে তৈরি হয়েছে এই খাল, তীব্র স্রোতের সেটাই কারণ—লাশটা সাগরে গিয়ে পড়লে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

ইতিমধ্যে শাহিন আর রানা দুর্গের ছাদে নেমে এসেছে। সিঁড়ির দিকে ছুটল ওরা। মন্টি আকাশেই থাকল। শৈবাল আর সমীরণ নেমেছে মন্দিরের পাকা চত্বরে।

ঘাঁটিতে দশ-বারোজন লোককে পাওয়া গেল, যে-যার অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে বন্দী হবার অপেক্ষায় আছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশী মৌলবাদী নেতা ও পাতি-নেতা যেমন আছে, তেমনি বিদেশী অর্থাৎ পাকিস্তানী ভাই-ভাই পার্টির কয়েকজন সংগঠকও আছে। তাদের কাছ থেকেই জানা গেল কোথায় রাখা হয়েছে ইশরাত আর ইকবালকে। সার্চ করার পর হাত-পা বাঁধা হলো সবার; জেরা করে খায়রুল কবিরের উদ্ভট আচরণের কারণটাও জেনে নেয়া হলো। দুর্গের মাথা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নজর রাখছিল কবির, চোখে ছিল বিনকিউলার। সাবমেরিন পানির নিচে বিস্ফোরিত হলেও, বিচ্ছিন্ন কনিং টাওয়ারটাকে পানির ওপর রকেটের বেগে উঠে আসতে দেখেছে সে। অপারেশন নকআউট ব্যর্থ হবার জন্যে মাসুদ রানা দায়ী, এটা ধরে নিয়ে ফিরোজা আর নঈম খানের ওপর খেপে যায় ভাই-ভাই পার্টির চেয়ারম্যান,

কারণ ওরা দু'জন ইশরাত আর ইকবালের মুখ খুলতে ব্যর্থ হয়—রানা কোথায় আছে এই তথ্যটা আদায় করতে পারেনি। রাগে অন্ধ হয়ে যায় কবির, অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ধাওয়া করে ফিরোজা আর নঈমকে।

ইকবালকে পাওয়া গেল দোতলার করিডরের শেষ মাথার একটা ঘরে, মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। লাথি মেরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল রানা, দেখল ইকবালের সারা শরীর তাজা রক্তে ভেজা। তবু রানাকে দেখে হাসল সে, তারপর হাত তুলে ঘরের একটা কোণ দেখাল। 'মাত্র দশ মিনিট আগে এখানে ওরা ফেলে রেখে গেছে ম্যাডামকে···বোধহয়· '

ছুটে এসে ইশরাতের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। গায়ে একটা চাদর জড়ানো, চাদরটা রক্তে ভেজা, একটা চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে, আরেক চোখের ওপরে কপাল আলুর মত ফোলা, নাকটা ভাঙা—প্রতিটি ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। 'ইশরাত, আমি,' ফিসফিস করল ও। 'মাসুদ রানা। আর কোন ভয় নেই।'

সমস্ত ব্যথা অগ্রাহ্য করে হাসতে চেষ্টা করল ইশরাত। 'স্বপ্নেও ভাবিনি তুমি বেঁচে আছ,' কথাগুলো শোনার জন্যে তার ঠোঁটের কাছে কান পাততে হলো রানাকে। 'বেঁচে যখন আছ, কথা দাও তোমার স্নেহ-ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হব না?'

সামান্য হলেও, হকচকিয়ে গেল রানা। নির্মম অত্যাচারে যে মেয়ে মরতে বসেছিল, পেশার স্বার্থে চেহারা বিকৃত হবার চেয়ে মৃত্যুই যার কাম্য হওয়া স্বাভাবিক, সেই মেয়ে মুক্তি পাবার আনন্দে কাঁদছে না, মুখ খোলেনি বলে কৃতিত্ব দাবি করছে না, এমনকি নিজের চেহারা নিয়েও উদ্বিগ্ন নয়; বলছে তার শুধু রানার স্নেহ-ভালবাসা দরকার।

'জিজ্ঞেস করবে না, কেন আমি এখনও বেঁচে আছি?' আবার ফিসফিস করল ইশরাত।

এবার রানাও ফিসফিস করল, 'কেন, ইশরাত?'

'কথাটা কেমন শোনাবে জানি না, তবে এরচেয়ে সত্য আর কিছু নেই—তোমার প্রতি আমার সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তুমি কোথায় গেছ বলে দিলে ওরা আমাকে রেহাই দিত। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিই, মেরে ফেলে ফেলুক, তুমি কোথায় কি করতে গেছ ওদেরকে বলব না।'

'তুমি মুখ না খোলায় ওরা আমাকে সাবমেরিনে খোঁজেনি,' বলল রানা। 'বলতে পারো সেজন্যেই আমি বেঁচে গেছি।'

'আমি জানতাম, তুমি মারা গেলে দেশ এমন একজনকে হারাবে, যার রিপ্লেসমেন্ট সম্ভব নয়,' মাথাটা তুলে রানার হাঁটুর ওপর রাখল ইশরাত। রানা তাকে দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নিয়ে সিধে হলো।

দশ মিনিট পর, একটা মার্সিডিজে ইশরাতকে তুলে নিয়ে ঘাঁটি ত্যাগ করল রানা। রানা এজেন্সির এজেন্টরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, মন্দিরের পাকা

চত্বরে দাঁড়িয়ে। কেউ একজন বলল, 'কসম খেয়ে বলতে পারি, মাসুদ ভাইয়ের চোখে পানি দেখেছি আমি। যদিও জানি তা আসলে সম্ভব নয়। উনি যে ধাতুতে গড়া, এ একেবারেই অসম্ভব। অথচ আল্লাহর কিরে খেয়ে বলতে পারি, চোখ বেয়ে পানি গড়াতে দেখেছি। বোধহয় ভুলই দেখেছি, কি বলো, অ্যাঁ?'

***